পঞ্চতপা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

ষষ্ঠ মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৩৬৮

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ—ফাইন আর্ট প্রিণ্টার্স

মিত্র ও ঘো[illegible] পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাত
হইতে [illegible]স. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ শশী প্রেস, ১৬ হেমে
সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৮ হইতে অশোককুমার ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পরমপূজনীয়েষু

॥ এই লেখকের ॥

কাল, তুমি আলেয়া
শতরূপে দেখা
শিলাপটে লেখা
আমি, সে ও সখা
আশুতোষ অমনিবাস
সাত পাকে বাঁধা
জানালার ধারে
অলকাতিলকা
স্বয়ংবৃতা
বিদেশিনী
সাঁঝের মল্লিকা
বকুল বাসর
রাত্রির ডাক
স্মৃতিহারিণী
উত্তর বসন্তে
শ্রেষ্ঠ গল্প
সিকেপিকেটিকে
অগ্নিমিতা
রোশনাই
নিষিদ্ধ বই
সোনার হরিণ নেই

নগর পারে রূপনগর
নগর দর্পণে
সাবি, তুমি কার
আর এক সাজে
খনির নতুন মণি
সোনার কাঠি রূপোর কাঠি
সমুদ্র সফেন
মহুয়া কথা
বাজীকর
চলাচল
মালবী মালঞ্চ
নবনায়িকা
কারণে অকারণে
কাঞ্চনরাগিণী
হৃদয়ের পথে খোঁজ
প্রণয়পাশা
দুটি প্রতীক্ষার কারণে
পরিণয়-মঙ্গল
পিক পয়েন্ট
দ্বীপায়ন
তিন পুরুষ

আকাশ ফাটল!

না, এক জড় পাষাণস্তূপের পাঁজর ফাটল। একটা ভরাট স্তব্ধতার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে গেল। যুগ যুগ ধরে জড়ের সাধনা চলেছিল ওখানে। স্থিতি আর স্থাবরতার উপাসনা চলেছিল। নিঃশব্দ সমাহিত। শুকনো, মানীরস। পাথরের পর পাথর গেঁথে চলেছিল কে। ঊর্ধ্বপথে। সূর্যোদয়ের পথে।

প্রলয়ের ক্ষেতে বিধাতার সৃষ্টি। প্রলয়ের ক্ষেতে মানুষেরও সৃষ্টি। মৃত্যু থেকে জীবনকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে উদ্ধার করছে সেও। এমনি একটা উদ্ধার-সমারোহ সব প্রথম কল্পান্তক আঘাত হেনেছে ওই জড়দানবের বুকে। আকাশ ফাটে নি। ওটা তার অভ্রভেদী আর্তনাদ। খান খান হয়ে গেছে তার শিলামন্ত্রের গাম্ভীর্য কড়কড় মড়মড় শব্দে খসে গেছে তার জড়-বাঁধন। শূন্যপথে ছিটকে উঠে মাটির বুকে মুখ থুবড়ে পড়েছে তার রাশি রাশি বিপুলায়তন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আকাশ ফাটে নি। ওটা দিগন্তের কাঁপুনি।

কিন্তু কেন গো, কেন? কে বটে গো তোমরা? পাহাড়গুলোর অমনধারা অঙ্গ চোটাচ্ছ কেন? জঙ্গল কেটে, মাটি খুঁড়ে, সব নাড়ি-ভুঁড়ি বার করে দিচ্ছ কেন? এমন লণ্ডভণ্ড কাণ্ড করছ কেন সব?

বিজ্ঞান চেনে না এই মানুষেরা। বিজ্ঞানের দূত দেখে নি কখনো। ওদের কালো মুখ অবিশ্বাসে কালো হয়ে ওঠে আরো। ভয়ে আর সংশয়ে ধারালো হয়ে ওঠে ওদের চোখের দৃষ্টি।

নিগড় দিবি? ওই মড়াইয়ের পায়ে? কিন্তু মড়াই তো মরেই আছে। ধারা কই? কাকে আটকাবি? কাকে বাঁধবি? জল পাবি কোথা? তোরা কি পাগল? তোরা দস্যু?

মড়াইয়ের এপার ওপার দুপারে পাহাড়। পাহাড়ের একেবারে নিচে জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে মড়াইয়ের বিশীর্ণ একটা রেখা মাত্র। তার হাড়পাঁজর বার করা জঠরের ক্ষীণ স্রোত শুকনো উপল-পথে ঠোক্কর খেতে খেতে ধারা হারিয়েছে সেই কোন্ যুগে। তার গতিপথের একটা টানধরা আভাস আছে শুধু। মরেছে বলেই তো মড়াই! যুগ যুগ ধরে মরে আছে বলেই তো মড়াই! মরে সকলকে মারছে বলেই তো মড়াই! আগে কি একটা নাম ছিল যেন নদীটার। সেই নামও মরেছে।

মশ বর্ষার জল আসে বটে খানিকটা। আর দু'পাঁচ বছর অন্তর অন্তর দু'কূল দেখিয়ে বন্যাও হয় এক এক বার।

কিন্তু বর্ষার জল? কলসীর জলে মরুভূমির 'তেষ্ণা' মেটে? বর্ষা না ফুরোতেই মাটির আগুন টেনে নেয় সব বর্ষা। তারপর আবার যেই কে সেই।

আর বন্যা? গড় করি গো তোর বন্যার পায়ে। আকাশের 'বজ্জ' আলো দেয় না আবার বাঁড়ায়? 'জেবন' দেয় না আগুন জ্বালায়? গড় করি গো 'বজ্জের' পায়ে। গড় করি তোর বন্যার পায়ে। মড়াই শুকিয়ে মরুক। মড়াই শুকিয়ে মারুক। মড়াইয়ের ডুবে মরে কাজ নেই। মড়াইয়ের ডুবিয়ে মেরে কাজ নেই।

সেই 'দুর্ঘটনার' পিত্যেশে বসে আছিস নাকি তোরা? নয়? তবে বাঁধবি কারে? কার পায়ে নিগড় দিবি? কার পায়ে 'ছেকল' পরাবি?

পাথরের দেয়াল দিবি এপার ওপার দু'পাহাড়তক? মড়াইয়ের বুক খুঁড়ে শতেক হাত তলা থেকে দেয়াল তুলবি এই দুই পাহাড়ের কাঁধতক্?

কিন্তু কেন? কেন রে তোরা মরা মড়াইকে মারতে লেগেছিস? কেন রে তোরা 'পিথিবী'র অঙ্গ চোটাচ্ছিস? তোরা কি পাগল? তোরা দস্যু? কে বটে তোরা? এমন 'পেলয়' কচ্ছিস কেন? কি হবে? কি করবি? কি গড়বি?

মুখে বলে না কিছু। দুর্বোধ্য বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। বোবা জিজ্ঞাসায় চোখের পাতা পড়ে না।

ব্যাঙ্ক দেখেছ? ব্যাঙ্ক? যেখানে টাকা জমা রাখে গো, টাকা জমা রাখা হয়! দেখ নি, কিন্তু বুঝেছ তো? আচ্ছা, সেই জমানো টাকা কখন তুলি আমরা? যখন অভাব হয়, যখন খরচ চলে না, যখন হাতের পুঁজি ফুরিয়ে যায়। এখানেও তেমনি জলের ব্যাঙ্ক হবে একটা। জল জমা করে রাখা হবে। বর্ষার জল, বানের জল, পাহাড়ী স্রোতের জল, সব বাড়তি জল। তারপর যখন জলের অভাব হবে, আকাল হবে, এখানকার এই জমানো জল খরচ করা হবে তখন। বিশ ত্রিশ পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যে আর জলের অভাব হবে না কখনো। চুপ করে দেখ দু'টি বছর। মরা মড়াই তোমাদের কূলে কূলে ভরে উঠবে, ফেঁপে উঠবে—যত দূর চোখ যায় জলে জলাকার হয়ে যাবে সব।

সঠিক বোঝে না। তবু কালো মুখে আশার আলো লাগে একটু। জলের অভাবটা বোঝে। জলের অভাব কাকে বলে বোঝে। জলের অভাবে তাদের নাড়ি শুকিয়েছে। এ ওর মুখের দিকে তাকায়। ভাবে। মনের মত করে অর্থ করে নেয়। শুনে যাবে। যেখানেই আগুন মাটি খেয়েছে সেখানেই জল যাবে। কথা দু'টোয় যেন যাদু আছে। আশাটুকুতে যেন যাদু আছে। জল যা কাছে। দূরে। দূরান্তে।

কর্মকর্তাদের কল্পিত নক্সা আর ছক্ ধরে জল কবে যাবে, সেটা দূর ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু সেই নক্সা আর ছক ধরে জল যাওয়ার খবরটা চলাচল হতে থাকে এই সদ্য বর্তমানেই। কাছের থেকে দূরে, দূর থেকে আরও দূরে।

মাসির বাড়িতে একদিন সান্ত্বনার কানেও এলো খবরটা।

ওভারসিয়ার অবনীবাবুর মেয়ে সান্ত্বনা। বছর চারেক আগেই এ-রকম একটা জল্পনা-কল্পনা শুনেছিল সে। সাগ্রহে বুঝতেও চেষ্টা করেছিল কি হবে। কিন্তু সবারই আঠারো মাসে বছর হতে দেখে কৌতূহলে মরচে পড়ে গিয়েছিল। ভুলেও গিয়েছিল প্রায়।

এত দিন বাদে হঠাৎ আবার খবরটা শুনে ভিতরে ভিতরে কেমন একটা উত্তেজনা হতে লাগল। এবারে আর তোড়জোড় নয়, হাতে কলমে কাজ শুরু হয়ে গেছে নাকি।

কি কাজ? কেমন ধারা কাজ?

সে জানা আর কে দেবে তাকে। যেটুকু শুনেছে তার বার্তাবহ ছোট মাসতুতো ভাই। শহরের হাইস্কুলে পড়ে। ভাসা ভাসা শুনে এসেছে সেও। এ-সব খবরে কান দেবার মত তার আগ্রহ বা কৌতূহল কিছুই নেই! খবরটা শুনলে দিদি খুশি হবে জেনেই বলা। কেন খুশি হবে তাও জানে না।

সামান্য একটা খবরের বদলে দশটা প্রশ্ন শুনে ফাঁপরে পড়ে যায় মাসতুত ভাই। স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ে, মানসম্ভ্রম আছে একটা। তাচ্ছিল্য করে জবাব দেয়, অত খবর কে রাখতে গেছে, জানার ইচ্ছে থাকলে কাগজ পড়লেই পারো, কাগজেই তো বেরোয় সব—বারো মাসে খবরের কাগজ ওল্টাবে না, জানবে কি!

খবরের কাগজ যে একটা পড়ার বস্তু, কোনদিন সান্ত্বনা তা উপলব্ধি করে নি সেটা যথার্থ। দুপুরের নিরিবিলি অবকাশে ঘরের দরজা বন্ধ করে একরাশ খবরের কাগজ নামিয়ে বসল সে। সকাল থেকে চুপি চুপি সংগ্রহ করেছে। দেখলে হাসাহাসি করবে শুধু মাসতুত ভাই-বোনেরা নয়, মাসি আর মেসোও হাসবেন মুখ টিপে।

মেঝেতে কাগজ ছড়িয়ে মহা নিষ্ঠা সহকারে প্রায় দু'তিন ঘণ্টা হাতড়ে বেড়াল জ্ঞাতব্য তথ্য। বিরক্তি ধরে গেল। খবর একটু আধটু যাও-আছে সে শুধু খবরই। কোথা দিয়ে কি হচ্ছে তার কোন হদিস পেল না। চুপিচুপি হাইস্কুলে পড়া মাসতুত ভাইয়ের শরণাপন্ন হল আবার।—দেখ্ খোকা, তোদের মাস্টার-মশাইদের কাছ থেকে খবরটা নে না কি হচ্ছে না হচ্ছে—যদি পারিস সিনেমা দেখার জন্য আস্ত একটা টাকা দেব তোকে।

প্রলোভনের ব্যাপার বটে এটা। আস্ত একটা টাকা যদি কেউ দেয় তো বাড়ির মধ্যে এই সানু দিদিই দিতে পারে। মাসে মাসে বাবার কাছ থেকে দশটা করে টাকা আসে সানুদির নামে, সেটা কারোরই অজ্ঞাত নয়। ভাই-বোনদের ওপর সানুদির অনেক প্রতিপত্তিও খাটে এই জোরেই।

কিন্তু মাস্টারমশাইদের কাছ থেকে খবর আনবে কি, তাদের জানার পরিধিটাও এমন কিছু বড় নয়। তবে চেষ্টাচরিত্র করে যেটুকু খবর সংগ্রহ করল তাই বেশ রঙ চড়িয়ে সান্ত্বনার কাছে পেশ করে দিল।—মডাই নদী বাঁধা হচ্ছে, ডিনামাইট্ দিয়ে চারদিকের পাহাড় ভেঙে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, ইত্যাদি।

সান্ত্বনা অবাক, নদী বাঁধছে তো পাহাড় ওড়াচ্ছে কেন?

বাঃ রে! সংবাদদাতা বিব্রত মুখে জবাব দেয়, নদী বাঁধতে হলে পাথর দরকার। এন্তার পাথর দরকার, ওই জন্যেই পাহাড় ভাঙছে।

সান্ত্বনা দাঁতে করে নখ খুঁটতে খুঁটতে বুঝতে চেষ্টা করল ব্যাপারটা। দু চোখ সংবাদদাতার মুখের ওপর এক চক্কর ঘুরে এলো। আর কি শুনলি? এই মানে—আমাদের ওখান দিয়ে জল যাবে শুনলি?

টাকার আশা বড় আশা!—তা যেতে পারে, জল তো গড়ানে জিনিস, একবার গড়াতে শুরু করলে আর আটকাবে কে?

সান্ত্বনার গোপন অস্বস্তিটা আর চাপা থাকল না বেশি দিন। উড়ো খবর আসে একটা দুটো। আর সদা হাসিখুশি চঞ্চল মেয়েটা হঠাৎ যেন সচকিত হয়ে ওঠে। শোনে কান খাড়া করে। বুঝতে চেষ্টা করে। কৌতূহল দমন করতে না পেরে মাসি আর মেসোকেই এসে জিজ্ঞাসা করে এটা সেটা। মনে মনে তাঁদের হাসির খোরাক হচ্ছে বুঝেও না জিজ্ঞাসা করে পারে না।

মাসির কথা কানে এলো সেদিন, মেসোকে বলছেন, আহা, এ নিয়ে কিছু বোলো না ওকে, জানই তো ওদের বংশের ধারা।

বংশের ধারা!

সান্ত্বনারই হাসি পায়। ঠাকুমার কথা মায়ের কথা মনে হতে শিউরে ওঠে। সে বিভীষিকা ভুলবে না কোন দিন। ভোলবার নয়। বিশেষ করে মায়ের কথা। কিন্তু তারা কোন্ বংশের থেকে এসেছিল? অবশ্য ঠাকুরদার কথা শুনেছে, ঠাকুরদার বাবার কথাও—তাদেরও মাটির রোগ ছিল—তাদের না হয় বংশের ধারা বলা যেতে পারে, কিন্তু বাইরের মেয়ে ওর মা-ঠাকুমা—তাদের অমন হল কেন? মনে মনে বলল, মাসিমার যেমন বুদ্ধি! বংশের ধারা! কই তার বাবার

তো কোন তাপ-উত্তাপ নেই? আর ঠিক তেমন বাপেরই মেয়ে সান্ত্বনা, তার নিজেরও নেই কোন তাপ-উত্তাপ। কেনই বা থাকবে?

যা গেছে সে তো বরাবরকার মতই গেছে। গেছে বলে কোন দুঃখও নেই তার। গেছে ভালই হয়েছে। আর কি সেখানে থাকতে যাচ্ছে তারা? জল গেলে ওদের নিজেদের কি আর লাভ? তবু জানতে ইচ্ছে হয় শুধু। যে আগুন বছরের পর বছর ধরে বুকে করে টেনে নিয়ে শুষে নিয়ে শেষ হয়ে গেছে ঘরে ঘরে কত মানুষ—সেখান দিয়ে জল যাবে শুনলে কার না জানতে ইচ্ছে হয়? জল যাবে, আগুন নিববে এটুকুই আনন্দ তার। বংশের ধারা আবার কি!

হঠাৎ ছোটবেলার একটা দৃশ্য মনে পড়ে গেল সান্ত্বনার। খুব ছোটবেলার। কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে। বুড়ী ঠাকুমা সকাল থেকে কি একটা যজ্ঞ শুরু করিয়েছে খোলা বাইরে। আকাশের নিচে কাঠফাটা রোদ্দুরে। কাঠ, শুকনো পাতা, ঘি, পুরনো কাপড়, সব এনে এনে ফেলা হচ্ছে সেই যজ্ঞের আগুনে। দমবন্ধ ধোঁয়ায় একাকার হয়ে যাচ্ছে চারদিক। আর সেখানে সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে কাটিয়েছে বুড়ী। শাস্ত্রকারের ভাষ্য, ধোঁয়ার জ্বলুনিতে আর সেই সব-জ্বালানো সূর্যের তাতে চোখ দিয়ে যে জল ঝরবে তা মাটিতে ফেললে মাটি শীতল হবে। চোখের জল বাষ্প হয়ে আকাশে উঠবে, তারপর বৃষ্টি হয়ে মাটিতে ঝরবে। সূর্যের দিকে মুহুর্মুহু চেয়ে চেয়ে চোখে জল আনার তাগিদে প্রায় অন্ধ হতে বসেছিল বুড়ী। তার সেই ভাঙা গলার ছড়া পাঁচালিও ভোলে নি সান্ত্বনা।

চোখের জল আকাশে যা,
যাগের ধোঁয়া আকাশে যা,
সেথায় গিয়ে মেঘ হ',
সূয্যি ঢেকে মেঘ হ'।
আয় রে পবন ধেয়ে,
মেঘ করেছে ছেয়ে,
পবন-মেঘে মিতালি,
মাটি হল শীতালি।

শুধু এই? আরো কত কি করতে দেখেছে কত ঘরে। মায়ের কথা মনে পড়ছে আবারও। তাড়াতাড়ি অন্য কিছু ভাবতে চেষ্টা করল সান্ত্বনা। কাজ নেই মায়ের কথা মনে পড়ে। ভালই হয়েছে তারাও জায়গা ছেড়ে এসেছে বরাবর-কার মত। ভালই হয়েছে বাবা তার বাইরে বাইরে কাজ করে। ভালই হয়েছে মাসির বাড়িতে চলে এসেছে সে-ও। সবই ভাল হয়েছে। তবু কেবল একটুখানি

জানতে ইচ্ছে করে, কি হচ্ছে, কি হবে, কেমন করে হবে। আহা, এখনও তো লোক বাস করছে সেখানে, কত লোকই তো আছে, তাদের দুঃখ কষ্ট ঘুচবে কিনা জানতে ইচ্ছে করে না! কিন্তু ঘুচবে কী? জল তো আটকানো হচ্ছে সেই কোথায় কত দূরের কোন্ পাহাড়ের গায়ে!

কিন্তু গোড়ার দিকের এই আলোড়নে লম্বা একটা ছেদ পড়ে যায় আবার। আর কোন খবর-বাতা পায় না সান্ত্বনা।

প্রথম প্রথম রাগ হত। লোকগুলো কি এখানকার! কোন কিছুতে যদি আগ্রহ থাকত। সেই থেকে রোজ দুপুরে খবরের কাগজ নিয়ে বসছে। কিন্তু খবর আর পায় না। উল্টে চোখে ব্যথা ধরে যায়। ঘুম পেয়ে যায়। কি সুখে যে লোকে পড়ে এই রাজ্যের ছাইভস্ম ভেবে পায় না। এমন ওর নিজের আগ্রহও একটু একটু করে চাপা পড়ে গেল আবার। বছর ঘুরে এলো।

ঘুম ভেঙে সেদিন কার মুখ দেখেছিল সান্ত্বনা! আনন্দে আর উত্তেজনায় ভেতরটা যেন একেবারে উপছে উঠতে লাগল তার। বাবার চিঠি এসেছে।

সেটা আনন্দের কারণ হলেও এমন কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়। বাবার চিঠি প্রায়ই আসে। ব্যতিক্রম হলে এখান থেকে এমন কিছু লেখে সান্ত্বনা, যাতে করে বেশ ভালো মতই টনক নড়ে তাঁর।

বাবা লিখেছেন, এখানে দু'তিন দিনের মধ্যেই আসছেন।

সেটা আরো আনন্দের কারণ বটে। কিন্তু বছরে এমন এক বার দু' বার এসেও থাকেন তিনি। সেই জন্যেই সান্ত্বনা এমন বিহ্বল হয়ে ওঠে নি আজ।

চিঠিতে আর একটা ছোট সংবাদ আছে। যা বাড়ির সকলকে ডেকে বলার মত। যা বিশ্বসংসারে সকলকেই ঢাক পিটিয়ে বলার মত।

বাবা লিখেছেন, মড়াইয়ের কাজে বদলি হয়েছেন তিনি। সেখানে যাওয়ার পথে এ জায়গা হয়ে যাবেন।

এমনিতেই সান্ত্বনার লাগাম-ছাড়া হাসিখুশির দাপটে বাড়িটা ভরাট থাকে সারাক্ষণ। মাসি সত্যি সত্যি রেগে ওঠেন এক এক সময়, দস্যি মেয়ে, বাইশ বছর বয়েস হল তোর খেয়াল আছে? বারো বছরের খুকিটির মত করে বেড়াস —বাপ তো ওদিকে খুব চাকরি কচ্ছে—যেন বিয়ে-থাওয়া আর দিতে হবে না মেয়ের—যেন এই করেই কাটবে চিরকাল, আসুক এবার!

আর আজ?

আজ আর কোন কথা বলারই ফুরসত পেলেন না তিনি। রান্নার কাজে

ব্যস্ত ছিলেন। সান্ত্বনা দৌড়ে এসে দু হাতে জাপটে ধরে সরাসরি একেবারে শূন্যে তুলে ফেলল তাঁকে।

ছাড় ছাড়! কি হল? এঁটো-কাঁটায় সব একাকার করে দিলি!

আর ছাড়! চিঠিখানা তাঁর সামনে রেখেই সান্ত্বনা ছুটল আর এক দিকে।

স্নান করে যত্নসহকারে চুল বাঁধাটা প্রায় সেরে এনেছে মাসতুত বোন। প্রসাধনের ব্যাপারে বেশ একটু রুচি আছে তার। বয়সে প্রায় বছর চারেক ছোট সান্ত্বনার থেকে। কিন্তু সে শুধু ঠিকুজির বিচারে। ছোট যেন সান্ত্বনাই। ঝড়ের মত এসে একটানে তার চুল খুলে সব এলোমেলো করে দিয়ে রাগিয়ে হাসিয়ে অস্থির করে তুলল তাকেও। প্রসাধন-গাম্ভীর্য রসাতলে গেল। লুটোপুটি শুরু করে দিল দুই বোনে।

তারপর এক সময় ঠাণ্ডা হয়ে ভাবতে বসল সান্ত্বনা।

কিন্তু এ-রকম একটা যোগাযোগ ভাবতেও পারছে না। বাবা যেন কি! কোথায় বেশ করে গুছিয়ে লিখবে দু লাইন, না এক কথাতেই শেষ। যেন জল গড়িয়ে খাচ্ছে এক গেলাস।

আজকের আনন্দের আঁচ খানিকটা মেসোও পেলেন।—সান্ত্বর আজ কি হল, এত খুশি কেন?

সমীহ যা একটু মেসোমশাইকেই করে সান্ত্বনা। মুখ আড়াল করে চার আঙুল জিব কাটল।

মাসি রাগ করে জবাব দিলেন, ওর বাবা মড়াইয়ের কাজে বদলি হয়েছে, খুশি এই জন্যে। একেবারে দিগ্বিজয় করে ফেলবে। যাওয়ার পথে এখানে হয়ে যাবে। আসুক, খুশি বার কচ্ছি!

মাসি এবং মেসো দু'জনেই সম্প্রতি সান্ত্বনার বাবার ওপর ক্ষুণ্ণ আছেন একটু। যথার্থ কারণও আছে। আর সেই কারণে সান্ত্বনাকেই সুচক্ষে দেখার কথা নয় তাঁদের। শুধু তাঁদের কেন, মাসতুত বোনেরও হয়তো কিছুটা মনোবেদনার কারণ সে-ই! কিন্তু এক ঝলক আলোর পরে একঘর অন্ধকারের ক্ষোভই বা আর কতটুকু টেকে!

প্রত্যাশিত দিনেই সান্ত্বনার বাবা ওভারসিয়ার অবনী রায় এলেন।

সান্ত্বনার ইচ্ছে, তাঁকে নিজের ঘরে টেনে এনে ঘরের দরজা বন্ধ করে জেরা করতে বসে। কিন্তু নিরিবিলিতে পায় তাঁকে সাধ্য কি।

প্রাথমিক যা কিছু সম্পন্ন হল। খাওয়াদাওয়া সারা হল ধীরেসুস্থে। ধৈর্য

ধরে থাকা দায় সান্ত্বনার। কিন্তু এদের গপ্‌পই শেষ হয় না। মাসিটি বড় সহজ নন, এ-কথায় সে-কথায় ঠিক আসল কথায় চলে এলেন।

লোহা পিটবে তখন, দগদগে লাল যখন। বললেন, চাকরি তো খুব কচ্ছ নিশ্চিন্ত মনে, তোমার মেয়ের বিয়ে দেবে কে ?

ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত হয়ে উঠল সান্ত্বনা। মাসি-মেসোর মনে যে ক্ষোভটুকু আছে বাবার ওপর, তার কারণটা এবারে প্রকাশ হয়ে পড়ে বুঝি। অথচ বাবা বেচারী তার কিচ্ছু জানেন না, সম্পূর্ণ নিরপরাধ। সকলের অগোচরে কল-কাটিটা সে-ই ঘুরিয়েছে—একবার নয়, দু'বার। কিন্তু আবার রাগও হয়ে গেল মাসির ওপর। কোন কিছুরই সময় অসময় নেই, ভিতরে ভিতরে একেবারে শান দিচ্ছিলেন যেন। অবনীবাবু কিছু জবাব দেবার আগেই সে বলে উঠল, আমার জন্যে ভাবতে হবে না, নিজের মেয়ে আছে, ধরে বিয়ে দাও গে যাও না !

অবনীবাবু বিব্রত হলেন। অন্য সময় হলে মা-মরা আদরের বোনঝির কথা শুনে হয়তো হাসতেন মাসি, নয়ত ছদ্মরাগে ধমক দিয়ে বলতেন কিছু। সান্ত্বনাও সে রকম কিছুই প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল কেমন। মাসি স্বল্পক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, তোকেও আমি নিজের মেয়ে বলেই ভাবতুম···তা তোরা বাপ মেয়ে দু'জনেই যখন অন্য রকম ভাবিস তখন আমার মাঝখানে পড়ে বার বার ঘ্যানর ঘ্যানর করা কেন। খুব ঘাট হয়েছে, আর বলব না।

হঠাৎ এ-রকম আবহাওয়ার পরিবর্তনে অবনীবাবু হকচকিয়ে গেলেন। মেয়েকে বললেন, তুই সবেতে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে আসিস কেন ? মাসিকে বললেন, আপনিও যেমন, ওর কথা আবার শোনেন !—বড় হয়েছে, বিয়ে তো দিতেই হবে, তা আপনারা ছাড়া ওর আর আছে কে, দেখেশুনে ঠিক করুন কিছু।

এরই প্রত্যাশায় ছিলেন যেন মাসি।—আমরা দেখেশুনে ঠিক করব কি রকম ? আমাদের ওপর তোমার বিশ্বাস কতটুকু যে আমরা দেখেশুনে ঠিক করব ? অমন দু'দুটো ভালো সম্বন্ধ পেয়ে চিঠি লিখলাম তোমায়, দু'বার করে লিখলাম—একটা চিঠিরও জবাব দেওয়া পর্যন্ত দরকার মনে করো নি তুমি, আবার আমরা দেখতে যাব কেন শুনি ?

একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন অবনীবাবু। চিঠি। আমাকে ? কবে—? কই আমি তো একটাও পাই নি।

মাসিও থতমত খেয়ে গেলেন কেমন। চিঠি পাও নি? সব চিঠি পাও আর এ দুটোই পেলে না, সে আবার কেমন কথা?

তাঁদের অগোচরে সান্ত্বনা পালিয়ে বাঁচল। আর সেখানে অবস্থান নিরাপদ নয়, সেটা তার থেকে ভালো আর কে জানে?

একটুখানি বিবৃতি প্রয়োজন।

মাসি ওর বিয়ের প্রসঙ্গ চার পাঁচ বছর আগেই উত্থাপন করেছিলেন। একাধিকবার করেছিলেন। কিন্তু অবনীবাবু সত্যিই তখন গা করেন নি। এ সম্বন্ধে ভাবার মত তখন তাঁর মনের অবস্থাও ছিল না খুব। যাই হোক, মাসিও শেষে এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করেন নি কিছু। যার দায় তারই যখন ভাবনা নেই তিনিই বা কাঁহাতক পিছনে লেগে থাকবেন? মাঝখানে এই ক'বছরের ব্যবধানে মাসির নিজের মেয়ে বড় হয়েছে। সেই দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। তাঁর মেয়েব সম্বন্ধ দেখা হতে লাগল। যে দু'টো সম্বন্ধের কথা একটু আগে উল্লেখ কবলেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছিল মাসির নিজের মেয়েকে উপলক্ষ্য করেই।

মাসতুত বোনকে দেখতে আসছে শুনে হেসে নেচে আটখানা হয়ে সান্ত্বনা সেই বেচারীকে প্রথমে নাস্তানাবুদ করে পরে পরিপাটি করে তাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে দিল। জনা দুই ভদ্রলোক আর জনা তিনেক মহিলা এলেন মেয়ে দেখতে। ভদ্রলোক দু'জন বাইরের ঘরে বসলেন, মেয়েরা ভিতরে। মাসতুত বোনকে বাইরের ঘরে চালান দেওয়া হল প্রথম। উচ্ছল কৌতূহলে আড়ি পেতে রইল সান্ত্বনা। সবেতেই তার অপার কৌতূহল, এ ব্যাপারে তো কথাই নেই। তাঁদের দেখা হতে মেয়েকে ভিতরে পৌঁছে দেওয়াব সঙ্গে সঙ্গে সান্ত্বনা ছুটে এসে এক বকম জাপটে ধরে নিয়ে গেল মেয়েদের ঘরে। তাকে তাদের সামনে বসিয়ে দিয়ে নিজেও পাশে বসল গ্যাট হয়ে। যেন সে-ই মুরুব্বী।

মেয়েরা মেয়ে দেখলেন। যাকে দেখার কথা তাকেও, যাকে দেখার কথা নয় তাকেও। এটা সেটা জিজ্ঞেস করলেন মেয়েকে। কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি জিজ্ঞাসা করলেন তার পাশে যে বসে আছে তাকেই। মাসিকে গল্প-গুজবের ছলে জিজ্ঞাসা করলেন এটা ওটা তাঁরা, কিন্তু মেয়ের সম্বন্ধে যত না, বোনঝির সম্বন্ধে অনেক বেশি।

হঠাৎ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সান্ত্বনা। অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন মাসিও।

দু'চার দিনের মধ্যেই পাত্রপক্ষ খবর পাঠালেন। ছেলের বয়স আন্দাজে

মেয়ের বয়স একটু কম হয়ে যায়। সেদিক থেকে বোনঝিটিকে বিশেষ পছন্দ তাদের। অতএব, ইত্যাদি।

বোনঝিকে পছন্দ হয়েছে বয়সের জন্য কি কি জন্য, সে চোখ মাসির আছে। মায়ের মনে একটু লাগার কথা। কিন্তু যে মেয়ে পছন্দ তাঁদের, সেই মেয়ে সান্ত্বনা বলেই তেমন লাগল না। মেসোর মনে যাই থাক, তিনি মন্তব্য করলেন না কিছু।

কিন্তু লজ্জায় অস্বস্তিতে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল সান্ত্বনা।

ওদিকে মাসি এবং মেসোর টুকরো কথাবার্তা কানে এলো তার। মেসো বললেন, অবনীকে চিঠি লিখে দাও আজই, যদি হয়ে যায় তো হয়ে যাক।

মাসিও সায় দিলেন। দুপুরে নাকের ডগায় নিকেলের চশমা এঁটে চিঠি লিখতে বসেছেন তিনি, তাও দেখল সান্ত্বনা।

সেই দিনই চিঠি একটা সে-ও লিখল তার বাবাকে। এমনি সাদামাটা চিঠি। লিখে খামে এঁটে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

তারপর ছোকরা চাকর আধ মাইল দূরের ডাকবাক্সে বর্ত্রীর চিঠি ফেলতে গেল যখন, তখন তার হাতের ওই চিঠি সান্ত্বনার চিঠির সঙ্গে বদল হয়ে গেল কি করে, সে শুধু একমাত্র সান্ত্বনাই জানে। আর কেউ না।

পরের ঘটনাও প্রায় অনুরূপ।

এবারে যাঁরা মাসির মেয়েকে দেখতে এলেন, সান্ত্বনা আর ধারেকাছেও ঘেঁষল না তাঁদের। মাসিকে বলল, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সব এবারে আমি দেখছি, তুমি ওদিক আগলাও গে যাও।

মাসি খুশিও হলেন না, দুঃখিতও হলেন না। খুশি হলেন না, কারণ এই বোনঝিটিও মেয়ের থেকে খুব কম নয় তাঁর কাছে। দুঃখিত হলেন না, কারণ মেয়েও কম নয়।

যথাপূর্ব মেয়ে দেখা হল। মোটামুটি মেয়ে পছন্দও হল বোধ হয়। কারণ মহিলারা বিদায়ের আগে মেয়ের বাপের ঘর-বাড়িও দেখলেন। আর এই দেখতে গিয়ে রান্নাঘরে আটপৌরে গাছ-কোমর শাড়িপরা সান্ত্বনাকে দেখলেন তাঁরা। গরমের তাতে আর ঘামে তখন টুসটুসে লাল হয়ে উঠেছে সান্ত্বনার মুখ। থতমত খেয়ে হাতের কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে সে ঢিপ-ঢিপ প্রণাম সারল গোটা দুই তিন। আগন্তুকারা আবার প্রশ্ন শুরু করলেন মাসিকে। বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তারপর জিজ্ঞাসাবাদে বিব্রত করে তুললেন সান্ত্বনাকেও।

যথাসম্ভব সংক্ষেপে জবাব দিয়ে সান্ত্বনা একগাল হেসে ফস করে বলে বসল, আমার বোনকে কেমন দেখলেন বলুন ?

একজন জবাব দিলেন, ভালোই তো—।

মহা খুশি হয়ে মাথা দুলিয়ে সান্ত্বনা বলে উঠল, পছন্দ হয়েছে তাহলে? হবে না তো কি, যে বাড়ি যাবে সেই বাড়ি আলো করবে, অমন কাজের মেয়ে ক'টা হয়? আপনারা নিশ্চিন্দি মনে নিয়ে যান।

সকল কথা সকলের মুখে ভালো শোনায় না। সেটা জেনেই বোধ হয় বলা। কিন্তু অনেকের মুখে আবার যা বলা হয় তাই শোনায়ও ভালো। সকলেই হেসে উঠলেন। মাসি বললেন, তুই থাম তো, বোনের হয়ে তোকে আর উমেদারি করতে হবে না।

সান্ত্বনা মুখরার মত ফড়ফড় করে বলল, বোনের জন্য আমি উমেদারি করব না তো কে করবে?

আগন্তুকাদের একজন বললেন, তুমিও তো কম কাজের নও দেখছি?

ঠোঁট উল্টে সান্ত্বনা জবাব দিল, হ্যাঃ, ওর সঙ্গে আমার তুলনা! মাসিমা ওঁদের এখানে দাঁড় করিয়ে রাখলে কেন, এখানটায় বেজায় গরম—

মাসিমা হেসেই জবাব দিলেন, তুই গরমে সেদ্ধ হয়ে কাজ করছিস আর ওঁদের একটু দাঁড়াতেও দিবি নে?

ভিতরে ভিতরে আবারও অস্বস্তি লাগছে সান্ত্বনার। আগন্তুকাদের মধ্যে বর্ষীয়সী যিনি, তিনি মুখ ফুটে বলেই ফেললেন, আপন বলতে যখন শুধু আপনিই —এরও তো বিয়ে দেওয়া দরকার আপনার?

মাসিমা হাসিমুখেই বললেন, আপন হলেও ওর বিয়ে দেওয়ার সত্যিকারের মালিক তো আমি নই—ওর বাবাকে বলে বলে হয়রান হয়েছি।

সান্ত্বনার ইচ্ছে হল বেশ করে মুখের উপর দু-কথা শুনিয়ে দেয়। পারেও। কিন্তু মাসির জন্যেই সাহস হচ্ছে না। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অন্য দিকে চেয়ে।

দিনকতক বাদে চিঠি এলো এবারও। রান্নাঘরের সেই মেয়েটিকেই বিশেষ পছন্দ তাঁদের, তার বাবার কাছে যদি কথাবার্তা তোলা হয় তারা খুশি হবেন।

একবার যেটা উড়িয়ে দেওয়া যায়, বার বার সেটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মেসো বিরক্ত হয়ে বললেন, মেয়ের বাবার যদি এখনো ঘুম না ভাঙে তো আমরা কি করব? একবার একখানা চিঠি লিখলে, তার জবাব পর্যন্ত দিলে না।

দুটো দিন একেবারে গুম হয়ে রইল সান্ত্বনা। অকারণ রাগে জ্বলতে লাগল মনে মনে। সেটা লক্ষ্য করেই বোধ হয় হালকা হেসে মাসি এক সময় বললেন, তুই অমন করে আছিস কেন, লোকের তো চোখ আছে না কি—তুই থাকতে তোর বোনের বিয়ে হবে না।

সান্ত্বনা ঝাঁঝিয়ে উঠল, তাহলে আমাকেই দূর করে দাও!

দেবই তো। এবারে তোকেই দূর করব আগে। বেশ ভালো হাতে মজা দেখাচ্ছি তোর বাবাকে।

মজাটা যে কি সান্ত্বনা জানে। আগের ব্যাপারটারই পুনরাবর্তন ঘটল। চুপি চুপি মাসির চিঠি বদল করতে হল আবারও।

পাঁচ-সাত দিন অপেক্ষা করে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন মাসি। বললেন, দেখেছ কাণ্ড! একটা জবাব দেওয়া পর্যন্ত দরকার মনে করে না সে!

তাড়াতাড়ি সান্ত্বনা বাবাকে চিঠি লিখল আবার।—শীগগির মাসির কাছে চিঠি লেখো একখানা, আমি এখানে আছি, মাঝে-সাঝে তাঁদের খোঁজখবর করা তো উচিত তোমার, না কি—?

চিঠি পেয়েই অবনীবাবু বিনীত চিঠি লিখলেন গৃহকর্ত্রীর নামে। মাসি রেগে আগুন আরো। আসল কাজের কথার একটা উল্লেখ পর্যন্ত নেই! অর্থাৎ আমার মেয়ে নিয়ে তোমরা মাথা ঘামাও কেন, কেমন—? আচ্ছা, এই আমি চুপ করলাম, আর যদি বলি তো ··

আড়াল থেকে সান্ত্বনা এদিকের হাওয়াটা এক-একবার বুঝে যেতে লাগল। মাসির রাগ পড়েছে। পোস্ট অফিসের বিরুদ্ধে একযোগে দু'জনে খানিকটা অভিযোগ বর্ষণ করার পর অবনীবাবু সখেদে বললেন, এ রকম দু'দুটা ভালো সম্বন্ধ হাতছাড়া হয়ে গেল, একবার জানতেও পারলুম না, যেমন বরাত—।

মাসি বললেন, তা'ছাড়া আর কি, নিয়তি-নির্বন্ধ না থাকলে কি করে আর কি হবে। কিন্তু তোমাকেও বলি, এ না হয় সেধে এসেছিল, কিন্তু তোমারও একটু চিন্তা-ভাবনা থাকা উচিত—অতবড় মেয়ে থাকলে চোখেপাতায় এক করতে পারতুম না আমি, তোমার কোন চিন্তাই নেই।

নীরব থেকে অবনীবাবু অভিযোগ স্বীকার করে নিলেন বোধ হয়। মাসি আবার বললেন, অবশ্য মেয়ে তোমার পছন্দের মেয়ে, যে দেখবে সে-ই নিতে চাইবে—তবু চেষ্টাচরিত্র না করলে সবাই কি আর সেধে আসবে! তোমার বরাত ভালো অমন বাড়ন্ত গড়নেও বয়সের ছাপ পড়ে নি মেয়ের, আমার মণির থেকেও কচি দেখায়—তা'বলে সব কিছুরই একটা সময় আছে তো!

আড়াল থেকে মাসির উদ্দেশে বেশ করে মুখ ভেঙচালো বাড়ন্ত গড়নের পছন্দের মেয়েটি। চিঠি সংক্রান্ত অপকীর্তিটা পাছে প্রকাশ পেয়ে যায়, সেই ভয়ে

ধারে কাছে ঘেঁষছে না। নইলে বাবার সামনে মাসিকে আর এক দফা শুনিয়ে আসতে পারত অনায়াসে। অত লজ্জাশরমের ধার ধারে না, তা সে নিজের বিয়ের প্রসঙ্গেই হোক বা যারই হোক।

বাবাকে সান্ত্বনা হাতের মুঠোয় পেল সেই সন্ধ্যার পরে। কিন্তু মেয়ের কাছেও অবনীবাবু প্রথমেই চিঠি না পাওয়ার খেদ প্রকাশ করেই ফাঁপরে পড়ে গেলেন। একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল সান্ত্বনা।···ব্যস্ ব্যস্ ব্যস্—বেশ হয়েছে চিঠি পাও নি, খুব ভাল হয়েছে, পোস্ট অফিসকে আমি একহাঁড়ি রসগোল্লা পাঠিয়ে দেব। এসে পর্যন্ত আর কোন কথা নেই, বিয়ে বিয়ে বিয়ে বিয়ে—!

বাবা-মেয়ের সম্পর্ক নয় তাদের। মা-মেয়ে সম্পর্ক বলা যেতে পারে। সান্ত্বনার মা মারা যাওয়ার অনেক আগের থেকেই তাই। ভালো হোক, মন্দ হোক, কোনো একটা ধারা থেকে অবনীবাবু মেয়েকে আড়ালে রাখতে চেয়েছেন সেই ছোটবেলা থেকেই। চেয়েছেন দুই বাহু বিস্তার করে আগলে রাখতে। বাবা-মেয়ের ব্যবধান ঘুচে গেছে এক যুগ আগে। সেই আদরেই সম্ভবত মেয়ের আজও বয়স বাড়ে নি।

অবনীবাবু বললেন, আমি কি করব, তোর মাসি বলছে একুশ-বাইশ বছর নাকি বয়েস হয়ে গেল তোর—

তবে আর কি, কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই যাকে পাও গলায় গামছা বেঁধে নিয়ে এসো, বিয়ে করে ফেলি—!

হেসে ফেলল। রাগ মিলিয়ে গেল। অবনীবাবুও হাসলেন। সান্ত্বনা তাঁকে নিরীক্ষণ করে দেখল কিছুক্ষণ। বলল, তুমি একটু রোগা হয়ে গেছ বাবা।

অবনীবাবু হালকা হেসে জবাব দিলেন, তোর বিয়ের ভাবনাতেই তো।

হুঁ! তোমার একটা মেয়ে আছে তাই মনে থাকে কি না সন্দেহ, ভাবনা না ছাই।

আচ্ছা, থাকে না। তুই কেমন আছিস বল্।

খুব ভালো। দিব্যি খাচ্চি-দাচ্চি আর মাসির ওপর তম্বি করে বেড়াচ্ছি, কেমন মোটা হয়েছি দেখ না!

অবনীবাবু মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। কিন্তু সান্ত্বনার ভিতরটা তখন অন্য কিছু জানার জন্য আঁকুপাঁকু করছে। ভাবল একটু। নীরবে দুই চোখ বাবার মুখের ওপর ঘুরে এলো এক প্রস্থ।

আচ্ছা বাবা, মড়াইয়ের কাজে তুমি নিজে বদলি হলে, না তোমাকে বদলি করা হল?

হঠাৎ এরকম একটা প্রশ্নের জন্যে তৈরী ছিলেন না অবনীবাবু। চকিতে তাকালেন একবার মেয়ের দিকে।—কেন রে ?

এমনি, বলোই না।

পাঁচ জায়গায় ঘুরে ঘুরেই তো চাকরি, এত বড় কাজ হচ্ছে সেখানে, কত পোস্ট খালি পড়ে আছে, চলে এলাম।

খুব সত্যি কথা বললেন না। বললেন না বলেই বিব্রত হলেন মনে মনে।

এত বড় কাজ হচ্ছে শুনে সান্ত্বনা সোৎসাহে বলে উঠল, খুব মস্ত কিছু হচ্ছে বাবা, তাই না ? আচ্ছা, যেখানে কাজ হচ্ছে সেই জায়গাটা আমাদের ওখান থেকে কত দূর ?

নিজের অজ্ঞাতেই আবার একটা চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন অবনীবাবু। পরে হেসে বললেন, তুইও যেমন, কোথায় মডাইয়ের ড্যাম আর কোথায় আমাদের সে জায়গা !

নিমেষে ম্লান হয়ে গেল সান্ত্বনার মুখ। সব উৎসাহ স্তিমিত হয়ে গেল যেন। বলল, তাহলে আর কি হল বাবা—সেখানে তো আর তাহলে জল যাবে না ?

অবনীবাবু হেসে উঠলেন।—তুই বুঝি এই সব ভাবিস এখনো ? জল যাবে না কেন, ড্যাম হলে ওর ডবল দূরেও জল যাবে—কিন্তু জল যাক না যাক আমাদের কি, আমরা কি আর সেখানে ফিরে যাচ্ছি, সব তো বেচে দিয়েছি।

সান্ত্বনার সমস্ত মুখ খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠল আবার। বলল, যেতে বয়ে গেছে আর সেখানে, মা গো ! সেখানে আবার কেউ থাকে ! কিন্তু তুমি তো ভারী স্বার্থপর বাবা, নিজেরা থাকব না বলে এত কালের জলের কষ্টটা দূর হবে সেটা কিছু নয় ? তুমি এখান থেকে যাচ্ছ কবে ?

দাঁড়া, দুটো দিন জিরোই, আমি গেলেই কি তাড়াতাড়ি জল এসে যাবে ?

লজ্জা পেয়ে হেসে ফেলল সান্ত্বনা।—না তা কেন, আমাকে তো সব গোছগাছ করে নিতে হবে, এর পর হুট করে তুমি বলে বসবে, চল—

দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল অবনীবাবুর। তোকে বলব ! তুই কোথা যাবি ?

ততোধিক বিস্ময়ে হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল সান্ত্বনা।—আমি যাব না ? এক বছর ধরে এত বড় একটা ব্যাপার হচ্ছে সেখানে, এখন তুমি একলা যাবে আর আমি এখানে বসে থাকব ? তুমি বল কি বাবা !

যেন এই এক বছরই যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে, এখনও সে গিয়ে পৌঁছতে না পারলে এত বড় একটা ব্যাপারের সব কিছুই পণ্ড। মনে মনে বেশ ঘাবড়ে গেলেন অবনীবাবু। কণ্ঠস্বরে একেবারে উড়িয়ে দিতে চাইলেন সান্ত্বনার ইচ্ছেটা—

এগিয়ে এলো তাড়াতাড়ি এখন তোকে সুদ্ধু নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হই আমি—বিশ্বাস চাইবার কি ব্যবস্থা কিছুই ঠিক নেই! পরে না হয় এক সময় ঘুরে দেখে আসিস, এখনো দু'তিন বছর লাগবেই সেখানকার কাজ শেষ হতে।

না না না না না। আমি কিছুতেই থাকব না এখানে, আমি যাবই তোমার সঙ্গে—আজ তিন বছর ধরে আমাকে নিয়ে যাবে নিয়ে যাবে করে ভোলাচ্ছ—তোমার শরীর খারাপ হয়েছে, তোমারও দেখাশুনা দরকার, যাবই আমি।

আলটিমেটাম দিয়ে এক ঝটকায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিপদগ্রস্তের মত বসে রইলেন অবনীবাবু। কিন্তু তবু সহজে রাজী হলেন না তাকে নিয়ে যেতে। মাসিও তার দিকেই সায় দিলেন। মেয়ে নিয়ে যাওয়া কোন কাজের কথা নয়। দু'জনে মিলে অনেক বোঝালেন তাকে, পরে নিয়ে যাওয়া হবে বলে আশ্বাসও দিলেন। বাধ্য হয়েই হাল ছাড়লেন শেষে।

চলুক তাহলে। অবনীবাবু বললেন, মোটে তিন-চার ঘণ্টার পথ মোটরে—একটা কথা বলবারও লোক পাবে না যখন, নিজেই পালিয়ে আসতে চাইবে।

মাসির বাড়িতে শোকের ছায়া নামল যেন। মাসি তো মাসি, মনে মনে একটু বিরূপ হয়ে উঠেছিল যে মাসতুত বোন···সে পর্যন্ত কেঁদে কেঁদে চোখ ফোলাল। কিন্তু একটুও কাঁদতে পারছে না, এতটুকু লোকদেখানো মনখারাপও করতে পারছে না শুধু সান্ত্বনাই। সেই জন্যেই বরং খারাপ লাগছে তার, অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে। কেমন করেই বা পারবে সে মনখারাপ করতে! মাসির বাড়ি ভালো। খুব ভালো। এত ভালো হয় না।

কিন্তু সে যাচ্ছে কোথায়?

ওই দূর আকাশের গায়ে মেঘের মত মিশে আছে যে পাহাড়গুলো—যাচ্ছে তাদেরই একেবারে বুকের ডগায় বাস করতে। যাচ্ছে ওই দুর্বোধ্য বিরাট বিস্ময়ের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতে। সেখানে বিজ্ঞানের যে কারিগরি চলেছে যুগযুগান্তরের মাটির তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে, যাচ্ছে তাই দাঁড়িয়ে দেখতে। একেবারে পাশে দাঁড়িয়ে, সঙ্গে দাঁড়িয়ে, মধ্যে দাঁড়িয়ে। যাচ্ছে মানুষের হাতেগড়া বিধাতার দণ্ডের এই সার্থক প্রতিবাদ দেখতে। যাচ্ছে মড়াই নদীর ড্যাম দেখতে। মনখারাপ সে কেমন করে করবে? শরতের খুশির আকাশে হালকা মেঘের নিরানন্দ কতটুকু?

শাবু। চকিতে

দুই

রোমাঞ্চকর বটে। কিন্তু মড়াইয়ের এই বিগত একটা বছরের সকল বৃত্তান্ত অনুকূল নয় খুব।

গড়ার কাজে জড় বাধা দূর করার স্ফুলিঙ্গ আছে বিজ্ঞানের মশালে। সে বাধা উড়িয়ে পুড়িয়ে ছারখার করতে সময় লাগে না। কিন্তু আর একটা বাধাও আছে যা জড় নয়, কিন্তু অনেক বেশি নিটোল, অনেক দুর্ভেদ্য। শতাব্দী কালের সংস্কার আর অজ্ঞতায় তার ভিত নড়ে না। যুগ-যুগান্তের অবিশ্বাস আর অন্ধতায় ওতে আলো পড়ে না। অনাগত কালের আশ্বাসে তার বাঁধন টলে না।

এই জীবন্ত মানুষদের অসূর্যম্পশ্য আধার তপস্যা উদ্‌যাপনের মন্ত্র জানা নেই কারোরই। ওদের সম্মিলিত তমিস্র-প্রাচীর বিদীর্ণ করার মত ছোট একখানি বিশ্বাসের প্রদীপ জ্বালাতে পারে এত আলো নেই বিজ্ঞানের আগুনে। সে প্রদীপ অন্তরের স্পর্শ-পিপাসু। বিজ্ঞানের নয়। কিন্তু এই হৃদয়ের স্পর্শ থেকে আজীবন বঞ্চিত ওরা।

মড়াইয়ের ধারে ধারে, পাহাড়ের গায়ে গায়ে, ঘন জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে দূরদূরান্ত পর্যন্ত যে জনবসতি গড়ে উঠেছিল তার সংখ্যা কম নয়। প্রায় দেড়শ গ্রাম। প্রায় হাজার পনের নারী-পুরুষ। গ্রামগুলো ছিল ছাড়া-ছাড়া, মানুষ-গুলোর অস্তিত্বের আড়ম্বর ছিল না খুব। সাঁওতাল বটে, কিন্তু শহর বা আধা শহরের বাঙ্গালী-ঘেঁষা সাঁওতালদের সঙ্গে তাদের তফাত অনেক। তাদের হাব-ভাব চালচলন রীতিনীতিতে সমতলভূমির কমনীয় ছোঁয়া লাগে নি তেমন।

কিছু একটা হবে এখানে, অনেক দিন ধরেই তারা তার আভাস পাচ্ছে। তোড়জোড় দেখছে। সাজসরঞ্জাম দেখছে। মাতব্বর জাত-ভাইদের মুখে রূপকথা শোনার মত শুনছেও কিছু কিছু। কিন্তু সঠিক বুঝছে না। যারা বলছে রূপকথা তারাও না, যারা শুনছে তারাও না। তাই হঠাৎ একটা প্রলয় দেখল যেন তারা। আর সেটুকুই বুঝল। এর থেকে সৃষ্টির হদিস ওরা পাবে কেমন করে? যা দেখল তারই আঁচ লাগল মনে। কানাকানি শুরু হল নিজেদের মধ্যে। ছোট থেকে বড় হতে লাগল কানাকানির গণ্ডি। বিস্ময় আর জিজ্ঞাসা ছাড়াও রূঢ় প্রতিবাদের ছাপ পড়তে লাগল মুখে।

বিজ্ঞানের আসল দূতদের ওরা সামনাসামনি পায় না। চেনেও না। কিন্তু তাদের চেলাচামুণ্ডাদের সাক্ষাৎ পেতে লাগল। চিনতে লাগল। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে

এগিয়ে এলো তারাই। কারণ, কাজ চালু করতে হলে ওদের চাই। ওদের বিশ্বাস চাই আর গতর চাই। মড়াইয়ের কাছ থেকে ওদের সরানো চাই।

কিন্তু এই সৃষ্টিমাহাত্ম্য ওদের বোঝানো পাকা কারিগরের পক্ষেও দুঃসাধ্য প্রায়।

মরা মড়াই তোমাদের কূলে কূলে ফুলে উঠবে, ফেঁপে উঠবে। যতদূর চোখ যায় মড়াইয়ের জলে সব ডুবে যাবে। আশপাশ থেকে, ধারকাছ থেকে তাড়াতাড়ি সব সরতে লাগো তোমরা।

তোমাদের জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ি?

কিচ্ছু ভাবনা নেই। সরকার দেবে। ক্ষতিপূরণ দেবে। নতুন করে ঘরবাড়ি তোলার খরচ দেবে। দেবে কেন, দিচ্ছেই। তোমরা নাও গে যাও। দূরে গিয়ে গ্রাম বসাও, ঘরবাড়ি তোলো। আর এখানে এসে মড়াই বাঁধার কাজে লাগো। মজুরি খাটো। ফি হপ্তায় টাকা পাবে। মেয়ে-পুরুষ সবাই এসো। যার গতর আছে সে-ই এসো।

জলের কথায় যাদের মন ভিজেছিল তারাও ভিগড়ে গেল আবার।

ঘরবাড়ি ছেড়ে দিতে হবে!

ঘরবাড়ি ছেড়ে উঠে যেতে হবে!

এ প্রস্তাবের সঙ্গে ওদের আপস নেই কোন। সৃষ্টির ইতিহাস থেকে অদৃষ্ট ওদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে এই মর্ত্যভূমির দিকে দিকে। অবশ্য মর্তভূমি বলতে যেটুকু ওরা বোঝে তার গণ্ডি খুব বড় নয়। কিন্তু তাদের সেই পৌরাণিক অভ্যুদয়ের প্রথম অধ্যায় থেকে তারা শুনে আসছে এই ঘর-ছাড়ানি দেশ-খোয়ানি বিধিলিপির কথা। সৃষ্টি থেকে বনজঙ্গলের হিংস্রতার সঙ্গে লড়াই করে মাটিকে বাসের উপযোগী করেছে নাকি তারাই। কিন্তু যাযাবর জীবনের অভিশাপ লেখা ওদের কপালে সেই আদি কাল থেকে। সেটা সত্যি কি মিথ্যে জানে না, কিন্তু বিশ্বাস করে। তাই বসতি ত্যাগের আভাস মাত্রে অসহিষ্ণু ক্ষোভে প্রায় হিংস্র হয়ে ওঠে ওদের মূর্তি।

এই বিক্ষোভের আর একটা কারণ আছে। আর সেটাই বোধ করি সব থেকে বড় কারণ।

অবিশ্বাস।

সভ্য মানুষের প্রতি অবিশ্বাস! সভ্যতার প্রতি অবিশ্বাস। বনের হিংস্র বাঘ ভালুককে তারা ভয় করে না। কিন্তু এই সভ্যতাকে করে।

তাদের এই নিকষকালো দেহের ভিতরে কোথাও এতটুকু কালোর আভাস

মাত্র ছিল না। ওদের ওই কালো বুকের মধ্যেই ছিল খোলা আকাশের মুক্ত সরলতা। কিন্তু সেই সাদা বিশ্বাসের ওপর মাশুল চড়িয়ে চড়িয়ে সেটা ঝাঁঝরা করে দিয়েছে সভ্য বুদ্ধিজীবী মানুষ। হিংস্র নখদন্ত মেলে একদা যারা সর্বস্ব গ্রাস করতে চেয়েছিল। যারা সর্বস্ব গ্রাস করেও ছিল।

পূর্বপুরুষদের সেই রক্ত-ঝরা দিনের কথা ওরা আজও ভোলে নি। ওরা কোনদিন ভুলবে না বোধ হয়।

নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য দিয়েই একদিন ভরা প্রাচুর্যের মুখ দেখেছিল তারা। কারো প্রত্যাশায় বসে থাকে নি কোনদিন। কিন্তু সে প্রাচুর্যের প্রথম রাশ টেনে ধরেছিল একশ বছর আগের পরদেশী শাসন ব্যবস্থা। তাদের চাষের জমির ওপর আশী হাজার টাকা মাশুল ধার্য করেছিল সেদিনের রাজপ্রতিনিধি।

সেখানেই শেষ নয়।

কোথা থেকে এলো তারপর এই সভ্য মানুষের দল। তাদের লোলুপ দৃষ্টির অর্থ তখন দুর্বোধ্য ওদের কাছে। ওরা সরল, ওরা কুটিলতা বোঝে না, তার মাশুলও দিতে হবে বৈকি! মহাজনের থলে নিয়ে বন্ধুর নামাবলী পরে আগমন ঘটতে লাগল তাদের। প্রলোভনের সামগ্রীতে তাদের আড়ত ভরা। সে যুপকাঠে ওরা গলা বাড়িয়ে দেবে না তো দেবে কারা?

নুন চাই? নাও না গো, তোমাদের জন্যেই তো। তবে বড় দামী জিনিস··· আচ্ছা এক গাড়ি ধানের বদলেই নিয়ে যাও ওই নুনের চাঙটা—কিন্তু বাপু পরের বারে অত সস্তায় পাচ্ছ নি, এক কলসী ঘি দিতে হবে এরপর।

—কি চাই, এই একজোড়া পায়রা? বদলে দেবে কি—এই একজোড়া বলদ মাত্র? আচ্ছা, নিয়ে যাও ভাই, নিয়ে যাও।

নিষ্ঠুরতার মাত্রা বাড়তে লাগল।

ঘি মাপার পাত্রটা তলায় ফুটো কি না, সেরের বাটখারা পাঁচসেরী হয়ে গেল কি না, সে ওদের কে বলে দেবে?

কিন্তু এ-ও তাদের যথাসর্বস্ব নয়, যথাসর্বস্ব চাই যে!

—কি চাই ভাই, টাকা? ধার নেবে? খুব ভালো, খুব ভালো, দরকার হলে নেবে বৈকি টাকা ধার—ওই জন্যেই তো টাকা।

এই শেষেরটুকুর জন্যেই বসেছিল যেন।

বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। কিন্তু এই মহাজনেরা ছুঁলে কত ঘা? বংশ-বংশ ধরে সে ঘা আর শুকোয় না।

—দশ টাকা ধার নেবে? তাহলে পনেরো টাকা লিখতে হবে। টাকা শুধতে

এসেছ ? কত টাকা দেবে ? পনেরো ? দাও, আর সেই সঙ্গে সুদটাও দিও। সুদ কেন ? এই যে পনের টাকায় টিপসই দিয়েছ ভাই। আসল দেবে, সুদ দেবে না ?

না দিলে আদালত আছে। আর সেদিনের সেই আদালতের শরণাপন্ন হয়ে এই জীবগুলোর কাছ থেকে টাকা কি করে আদায় করতে হয়, সে ওরা ভালই জানে।

পঁচিশ টাকা একবার যে ধার নিলে, এই জীবনে সে আর তার ঋণ পরিশোধ করে যেতে পারল না। তার ছেলেও না, তার ছেলেও না। এই করে ওদের জমি গেল, বাড়ি-ঘর গরু-বাছুর ছাগল-ভেড়া থালা-বাটি সব গেল। নিজেরাও বাঁধা পড়তে লাগল তার পর। বাধা পড়তে লাগল চির দাসত্বের শিকলে। দুশ্চিন্তা যার হতাশা হল জীবনের সঙ্গী। অন্যত্র কাজ করে ঋণ পরিশোধ করবে তারও উপায় নেই—মহাজন সঙ্গে সঙ্গে নাকে দড়ি পরিয়ে আদালতে টেনে নিয়ে যাবে। আর সেখানে তাদের পরাজয়ের পরোয়ানা লেখাই আছে।

পালাবে ?

পালাবে কোথায় ?

কত দূরে ?

বাড়তেই লাগল এই দাসের সংখ্যা। আবর্তিত হতে থাকল তাদের মর্মছেঁড়া দীর্ঘনিশ্বাস।

এমন দিনে খবর এল, অদূরে 'লোহার ঘোড়া' চলার রাস্তা বসাচ্ছে সাদা চামড়ার সাহেবরা। অর্থাৎ রেলপথের মাটির কাজ শুরু হয়েছে। ভাগ্যক্রমে মহাজনের বেড়ি পায়ে পড়ে নি এমন যারা ছিল, মজুরি খেটে কোঁচড় ভরে টাকা নিয়ে আসতে লাগল তারা। শিশু নারী পুরুষ সকলেই। সাড়া পড়ে গেল একটা। শ্রম-কাতর নয় তারা।—চল্ চল্ চল্ তোরা সব—ঋণ শুধবি তো সবাই চল্ এবার।

কিন্তু ঋণ পরিশোধ হলে মহাজনদের চলবে কেন ? ঋণ-দায়ে আত্মবিক্রীত ক্রীতদাসেরা চলে গেলে এদিকের ক্ষেতমজুরি করে কে ? মহাজনদের শিকল হিংস্র হয়ে উঠল আরো।

ওদের এত কালের পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ আর স্ফুলিঙ্গ দাবানলের মত জ্বলে উঠেছিল তার পর।

ওরা প্রতিবাদ করেছিল। প্রতিবাদ করেছিল মহাজনদের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদ করেছিল সেই শ্বেত-শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। সে প্রতিবাদ রক্তের অক্ষরে লেখা আছে ইতিহাসের পাতায়।

. ওরা মরেছিল। আর মেরেছিল। ওরা রক্ত দিয়েছিল। আর রক্ত পান করেছিল।

রাক্ষসী বটের নিচে কপট দারোগার দেহ উপদেবতা-প্রধান সূর্যদেব 'জমছিম বোঙ্গা'র উদ্দেশে বলিদান দিয়ে রক্ততর্পণ শুরু করেছিল তারা। 'রাখসী থানের বট'—এই একশ বছরেও নররক্তে ভেজা শিকড় কি তার শুকিয়েছে?

এক লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে লক্ষ লক্ষ প্রাণ দিয়েছে তার পর। পরাজিতও হয়েছে। কিন্তু তাতে কী? বিদ্রোহী ভৃগুর পায়ের চিহ্ন ভগবানের বুক থেকে মুছবে কোন দিন? সভ্যতার বুক থেকে এই বিদ্রোহী কালো মানুষদের পায়ের দাগও মিলাবে না কোন দিন।

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছে ওরা। ইতিহাসের সেটা স্থূল অধ্যায়। পরাজিত হয়েছে ওদের অবিনশ্বর নেতা সিদু আর কানু। জাতির উপাস্য দেবতা 'মারাং বুরু'র আবির্ভাব ঘটেছিল নাকি তাদের মধ্যে। তারা নিজেরাই সেদিন প্রচার করেছিল এ কথা। অন্ধ-বিশ্বাসীর বুকে বিপ্লবের আগুন জ্বালতে হলে এই বজনির্ঘোষ ছাড়া আর গতি ছিল না কিছু। প্রাণ দিয়েছে সেই 'মারাং বুরু' প্রতীক সিদু কানুও। কিন্তু এই নিরক্ষর মানুষদের বুকে দেবতার আবির্ভাব সত্যিই কি ঘটে নি সেদিন? দুরাচারীর বিনাশ-সাধনে যুগে যুগে দেবতার আবির্ভাব মানুষের বেশে—সে তবে কী? সে তবে আর কেমন করে হয়?

সেই শতাব্দী কালের অবিশ্বাসের ধারা আজও তাদের ধমনীতে বইছে।

হঠাৎ একটা সাড়া পড়ে গেল। হঠাৎ একটা জাগরণ এলো। হঠাৎ একটা আলোড়ন এলো। ছাড়া-ছাড়া গ্রামগুলো একটা মিলিত স্বার্থের সংযোগে এক সঙ্গে নড়েচড়ে উঠল যেন। স্বার্থে নয় ঠিক, আশঙ্কায়। আশঙ্কায় আর উদ্বেগে।

সমবেত উচ্ছেদের কথাটা শুনে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেল যেন সকলে। তার পর একটু একটু করে সচেতন হতে লাগল তারা। কোনো প্রস্তাব নয়, কোনো দুঃস্বপ্ন নয়—সরকারের নোটিশ জারি হয়েছে একেবারে। রূঢ় কঠিন বাস্তব। মুগুরের ঘায়ে ঘুম ভাঙানোর মত।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল প্রতি গায়ের 'মাঝি' আর 'পারাণিক'রা। উৎসবে ব্যসনে রোগে শোকে মাঝি গাঁয়ের মাথা। পারাণিক তার প্রধান সহকারী। একদা তারাই ছিল গায়ের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। কিন্তু কালের পরিবর্তনে সে প্রতিপত্তি অনেকটাই স্তিমিত। তাই সুযোগ সুবিধে পেলেই নিজেদের অস্তিত্ব কড়ায় গণ্ডায় জাহির করে থাকে। কিন্তু এমন একটা গুরুতর ব্যাপারের তাড়া খেয়ে একেবারে যেন হকচকিয়ে গেল। পদমর্যাদার মুখোশ খসিয়ে নিজেদের

মধ্যে, অর্থাৎ, বিভিন্ন গাঁয়ের মুরুব্বীদের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপনের জন্য ছোটাছুটি শুরু করে দিল তারা।

ঝড় যখন আসে শুধু তখনই মিতালি হয় বোধ হয় বনস্পতির সঙ্গে তুচ্ছ তৃণ-লতারও। এই ঢালা উচ্ছেদ সম্ভাবনার আঁচ লাগল আরো এক দলের গায়ে —যারা এদের দলগত নয় ঠিক। যারা শিক্ষিত এবং আধা-শিক্ষিত। যারা ভদ্রলোক এবং আধা-ভদ্রলোক। সমস্ত পরিবেশ জুড়ে এ রকম গৃহস্থ-বসতিও একেবারে কম নয়। ভিতর থেকে মুরুব্বীদের শলাপরামর্শ দিতে লাগল তারাই। একত্র বসবাসের ফলে এদের ওরা সন্দেহ করে না, অবিশ্বাস করে না। তারা বলল, একসঙ্গে রুখে দাঁড়াও তোমরা, কিছুতে বাস্তুভিটে ছেড়ে যেতে রাজী হয়ো না।

রোজ সাড়ম্বরে মিটিং হতে লাগল এর পর। আজ এই হাটে, কাল ওই হাটে। বাঁধতে দেব না আমাদের মড়াই, মড়াইকে আমরা ভালবাসি, ভক্তি করি—মড়াই বাঁধলে অধর্ম হবে আমাদের! কি উপকার হবে মড়াই বেঁধে? তোমরা কেউ কাজ করো না, কেউ তোমরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিও না।

কিন্তু দিন গেছে।

যে রাজশাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব-পুরুষেরা অস্ত্র ধরেছিল এক দিন, তার থেকে দিন অনেক বদলেছে। রক্ত ওদের অনেক বদলেছে। রক্ত ওদের অনেক ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বিজ্ঞান দুর্গমকে অনেকটাই সুগম করে আনার ফলে ওদের সেই অটুট বিচ্ছিন্নতার সুযোগ সুবিধে অনেকটাই ঘুচে গেছে। ওরা রাজনীতি বোঝে না, কিন্তু রাজনীতির অমোঘ গতি উপলব্ধি করে খানিকটা।

তাই গাঁয়ের মাঝি মাতব্বরেরা চিন্তিত। চিন্তিত সকলেই। কি হবে? ভাল হবে কি মন্দ হবে? গাঁ ছেড়ে যাব না বলছি, কিন্তু না গিয়ে পারব কেমন করে? বাধা দেব, কিন্তু কেমন করে দেব?

আর চিন্তিত পাগল সর্দার।

পাগল বলতে পারে না, বলে পাগড় সর্দার। সর্দার পদবী নয় কিছু। ওটা অমনি চলে আসছে। মাঝি নয়, মুরুব্বী নয়, পারাণিকও নয়—তবু সর্দার।

'মারাং বুরু' প্রতীক সেই সিদু কানুর ডান হাত ছিল নাকি তার কোন্ পূর্ব-পুরুষ। সেই পুরুষের বংশধর। ওপরঅলার রীতি বিচিত্র। সেই তমসাচ্ছন্ন অন্ধ বিশ্বাসের যুগেও দুটি মানুষের বুকে জেগেছিল চেতনারূপী সূর্যসেনা! আজকের এই কর্তব্য-বিমূঢ় আলোড়নের মধ্যেও একটা শুভ চেতনা বার বার উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল যে মানুষটির অন্তস্তলে—সে এই পাগল সর্দার।

ভাবছে পাগল সর্দার।···ভাবছেই।

ওরা বলছে জল হবে। ওরা বলছে জলের অভাব ঘুচবে। হবে কি না কে জানে? ঘুচবে কি না কে জানে?···কিন্তু চেষ্টা হবে। এই চেষ্টাটাই যদি না হয়, তাহলে? মাটি খাঁ-খাঁ করছে, তাই করবে। মাটির নিচে আগুন জ্বলছে, তাই জ্বলতে থাকবে। মাটির দানায় দুর্ভিক্ষ লেগে আছে, তাই লেগে থাকবে। মাটির ফাটলে উপোস বাসা বেঁধেছে, তাই বাঁধা থাকবে। তাহলে? তাহলে?

তাহলে কিছু করা দরকার। কিছু না করলে কিছু হবে কি করে? সেই কিছুই তো করতে চাইছে বাবুরা। সেই কিছুর চেষ্টাই করতে চাইছে। তবে আর বাধা দেব কেন? কি লাভ হবে বাধা দিয়ে? কি পাবে তারা? আজ পাবে না, কাল পাবে না, কোন দিনই কিছু পাবে না। ভরসা তো শুধু ঝরনার জল। কিন্তু সে ভরসা কতটুকু তা তো বছরের পর বছর হাড়ে হাড়ে বুঝছে। তবে আর তারা কেন দেবে বাধা?

অনুগতদের ডেকে এই কথাই বললে পাগল সর্দার।

এই সহজ কথাটাই বোঝালে। দলছাড়া স্বতন্ত্র মানুষ পাগল সর্দার। কিন্তু ভক্তের সংখ্যা কম নয়। বেশির ভাগই তারা ছেলে-ছোকরার দল। একদা ডাকসাইটে শিকারী ছিল মানুষটা। শিকারে বেরুনো অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছে। প্রৌঢ়ত্ব ছড়িয়ে বার্ধক্যের দিকে পা বাড়িয়েছে। কিন্তু শিকার করা ছেড়েছে তার অনেক আগেই। অসময়ে ছেড়ে দিয়েছে এই একমাত্র বিলাস। তবু তার শিকারের গল্প তরুণ উদ্যমীদের মুখে মুখে ফেরে আজও। তারা দেখে নি, কিন্তু শুনেছে। শুনে আসছে।

হঠাৎ একটা চাপা উত্তেজনা দেখা দিল প্রায় সর্বত্র।

পাগল সর্দার ভিটেমাটি ছেড়ে দূর যেতে রাজী হয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে যেতে রাজী হয়েছে আরো অনেকে। মাথার ওপর যাদের বয়স্ক অভিভাবক নেই বিশেষ করে তারা। শুধু তাই নয়, পাগল সর্দার এদের নিয়ে মড়াই বাঁধার কাজে লাগতেও নাকি রাজী হয়েছে।

ভিটেমাটি ছাড়তে রাজী না হলেও জোর করে ছাড়ানো হবে হয়তো, এই ক'দিনে প্রায় সকলেই উপলব্ধি করেছে সেটা। কিন্তু তা বলে ওদের সঙ্গে গিয়ে কাজে লাগা! কারো কাছে কিছু জিজ্ঞাসা না করে, মাঝির অনুমতি না নিয়ে!

পাগল সর্দার কেমন? পাগল সর্দার বিশ্বাসঘাতক! পাগল সর্দার অধার্মিক!

রক্তচক্ষু মাতব্বরেরা এলো কৈফিয়ৎ নিতে। পাগল সর্দার কৈফিয়ৎ দিল। তারা বলল, নদী বাঁধলে অনেক ক্ষতি হবে, অনেক লোক মারা পড়বে।

ও বলল, অনেক লাভ হবে, অনেক লোক বাঁচবে।

রুদ্ধ আক্রোশে ফিরে গেল তারা। মাঝির পঞ্চাতি বৈঠক বসল অবিলম্বে। একঘরে করা হল পাগল সর্দারকে। কাপড় চাল তেল সব বন্ধ। সমাজ বন্ধ।

কিন্তু এই করে পাগল সর্দারকে এঁটে ওঠা যাবে না। এও বোঝে মাতব্বরেরা। সরকারের কাছ থেকে সবই পাবে সে। অনেক বেশি পাবে। আর শায়েস্তাই বা করবে কি করে, সে একা নয়, এক দল জোয়ান মরদ আছে তার দিকে।

মাঝির বিষম রাগ পাগল সর্দারের ওপর। এই ব্যাপারে নয়। অনেক আগে থেকেই।

কারণও আছে বিশেষ।

ও লোকটার জন্য ঘরের শান্তি মানসম্ভ্রম সবই নষ্ট হচ্ছে তার।

অশান্তির কারণ তার নিজের ছেলে হোপুন আর পাগল সর্দারের মেয়ে চাঁদমণি।

মরদের মত মরদ ছেলে মাঝির। অমন ছেলের গর্বে বাপের ছাতি ফুলে ওঠার কথা। কিন্তু তাকেও তুক করেছে লোকটা। আর তার মেয়েটা। ফুলমণির মেয়ে চাঁদমণি। 'ছাড়ই কুড়ী' ফুলমণি। স্বামী ছেড়ে পালানো মেয়ে ফুলমণি। পরপুরুষের সঙ্গে 'আপাঙ্গির' হয়ে গেছে ফুলমণি। 'আপাঙ্গির কুড়ী' —ঘর ছাড়া মেয়ে। ওরা বলে, ঘর ছাড়া মেয়ে সবুজ বুলবুল, হাজার রকম ডাকে। ঘর ছাড়া মেয়ে ময়না পাখি, মাথায় কেবল বাহার। সেই ঘর ছাড়া ফুলমণির মেয়ে চাঁদমণি। যত গোলযোগ, যত আপত্তি, যত বাধা এইখানে। এসব ঘর ওদের সমাজে হেয়। আর মাঝির ছেলে হয়ে কিনা হোপুন ওই মেয়ের পিত্যেশে বসে আছে!

এককালে পাগল সর্দার শ্রদ্ধার পাত্রই ছিল সকলের। গাঁয়ের মাঝি না হোক অল্প বয়সেই 'জগমাঝি' যে হোত কোনো সন্দেহ নেই। কাকে বলে জগমাঝি? এক কথায় যুবক-যুবতীদের সর্দার। গ্রামে যাতে লজ্জার কোনো কারণ না ঘটে, সুনামের হানি না হয় সেটা দেখার গুরুদায়িত্ব জগমাঝির। ছেলেমেয়েরা তাই জগমাঝির কথায় ওঠে বসে, সর্বদা তাকে সন্তুষ্ট রাখে।

কিন্তু যার ঘরে অমন কলঙ্ক সে আর জগমাঝি হবে কেমন করে? উল্টে সমাজচ্যুত হয়েছিল। নেহাৎ পাগল সর্দার বলেই অল্পের ওপর দিয়ে রেহাই পেয়ে গেল। 'জমজাতি' হল আবার, সমাজে উঠল। কিন্তু ওদের সমাজে 'ছাড়োয়া' পুরুষের ওপরও লোকে সন্তুষ্ট নয় তেমন। ছাড়োয়া মানে স্ত্রী-পরিত্যক্ত। বাপ-মা মেয়ের বিয়ে দেয় না এদের সঙ্গে। কুমারী মেয়েরাও চায়

না এদের ঘরণী হতে। বলে, ছাড়োয়া পুরুষ চাখা হাতা, কে জানে কয় দিন!

কিন্তু সব নিয়মেরই আবার ব্যতিক্রম আছে। পাগল সর্দার সেই মূর্তিমান ব্যতিক্রম।

ব্যতিক্রম বলেই সমাজের রক্ষণশীল মুরুব্বীরা সহ্য করতে পারে না ওকে, বরদাস্ত করতে পারে না। ইচ্ছে করলেই আবার বিয়ে করতে পারত পাগল সর্দার। ছাড়োয়া হওয়া সত্ত্বেও। কুমারী মেয়েই পেত। তালাক দেওয়া মেয়ের সন্ধান করতে হত না। শুধু তাই নয়, যে লোকের ঘরে এত বড় কলঙ্ক, সমাজে উঠলেও আজীবন তার মাথা নিচু করেই থাকার কথা। কিন্তু পাগল সর্দারের বেলায় সকলে যেন সেটা ভুলেই গেছে। জগমাঝি না হলেও সোমত্ত ছেলে-মেয়েগুলো তার কথায় ওঠে বসে। লোকটা যাদু জানে না তো কী? ও ডান না তো কী? আগের দিনে ডানএর নাগাল পেলে মারপিট করে একেবারে শেষ করে দিত তারা। কিন্তু এখন সেটা করতে গেলে হাকিমের বিচারে উল্টে তাদেরই জেল হয়ে যাবে। হাকিমেরা সব বোঝে, কিন্তু ডান বোঝে না।

তবু সবই সহ্য হত মাঝির। সবই ক্ষমা করত, যদি না নিজের অমন ছেলেটার এমন সর্বনাশ করত ওই লোকটা আর তার নচ্ছার মেয়েটা। বাপ ছেলের এই নিয়ে বিবাদ লেগেই আছে। ছেলেকে মনে মনে ভয়ই করে সে। জোয়ান ছেলে, কালো পাথরেকোঁদা বুকচিতানো ছেলে—কথা বেশি বলে না, মরা চোখে মুখের দিকে চেয়ে থাকে শুধু। কিন্তু তাইতেই অস্বস্তি লাগে কেমন। যত নিষ্প্রাণ হয় ওর চোখ, তত বেশি অস্বস্তি।

বিয়ে এত দিনে হয়ে যেত। চাঁদমণিকে এত দিনে কবে ঘরে এনে তুলত হোপুন। কিন্তু কেন যে সেটা হয় নি সেটাই মাঝির বিস্ময়। কেন মত দেয়নি পাগল সর্দার! মাঝির মত নেই বলে? কিন্তু কার মতামতের ধার ধারে হোপুন! বিয়ে তো একরকম ঠিকঠাক হয়েই আছে। পাগল সর্দার নাকি বলেছে, তোমার বাপ এসে আমাকে বলুক, যথাবিধি মর্যাদা দিক—তার পর বিয়ে হবে। ওদের সমাজে মেয়ের বাপেরই মর্যাদা বেশি। কিন্তু কি প্রচণ্ড সাহস আর দেমাক লোকটার! আরো বলেছে। বলেছে, মত না দিলেও হবে বিয়ে, কিন্তু সবুর করো, অত তাড়া কিসের—নিজের তাহলে আলাদা ঘরবাড়ি তোলো, জোত-জমা করো—রোজগারপাতি করো।

সবুর করেই আছে হোপুন। এর বেলায় ছেলের অসীম ধৈর্য। ছেলের বাপ নিজে গিয়ে না বলুক, পরোক্ষে মত দিতেই হয়েছে। গাঁয়ের মাঝি সে,

প্রধান কর্তাব্যক্তি, নিজের ঘর নিয়ে গণ্ডগোল হোক একটা, কথা বলুক পাঁচজনে, সেটা চায় না। কিন্তু তবু বিধিমত আজও মেয়ে দিচ্ছে না পাগল সর্দার। মাঝির ধারণা, কিছু একটা উদ্দেশ্য আছে এর পিছনেও। নইলে এভাবে ওই সোমত্ত মেয়ে আগলে বসে আছে কেন? হোপুনের হাতে যা হোক করে মেয়ে গছাতে পারলে গাঁয়ের যে কোন লোক বর্তে যেত।

কিন্তু আজ হোক, কাল হোক, এই লোকটাকেই এক দিন বেয়াই বলে ডাকতে হবে মাঝিকে। কুটুম্বিতা করতে হবে।

মড়াই বাঁধা নিয়ে এত বড় দুর্যোগ সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে একটু আশান্বিত হয়ে উঠল মাঝি। হয়তো এই সুযোগে সব বরবাদ হয়ে যেতে পারে। এ সুযোগ হাতে পেয়ে ছেড়ে দেবে না মাঝি, ছেড়ে কথা কইবে না।

ঘা দেবার সুবর্ণ মুহূর্তও ঘটে।

অবিশ্বাস আর অনিশ্চয়তায় ছেলে বুড়ো নারী পুরুষ সবাই তখন বিচলিত। সকলের মনেই সংশয়। সকলের মনেই ভয়। এরই মধ্যে একজন সরকারের দলে গিয়ে হাত মেলালো, সেটা সহ্য করা কারো পক্ষেই সহজ নয়। সহকর্মীদের কেউ ধর্মঘট ভাঙলে যেমন, তেমনি নির্মম হয়ে উঠল সকলের মনের অবস্থা। ওরা বাধা দিচ্ছে সরকারকে। কিন্তু সে বাধাটা যেন প্রথম ফুটো করে দিলে পাগল সর্দার।

প্রতিশোধ চাই! নির্মম প্রতিশোধ!

ধমনীর রক্ত ওদের টগবগ করে ওঠে। কিন্তু প্রতিশোধ নিতেও পারছে না। একদঙ্গল ছেলে ঘিরে আছে ওকে। অনেকেই গিয়ে ভিড়েছে ওর দলে। শুধু দলে ভেড়া নয়। বাঁধের কাজেও লেগে গেছে দস্তুরমত। সপ্তাহে মোটা পয়সা রোজগার করছে। তবু চাই প্রতিশোধ! ওরা মন শানায় আর অস্ত্র শানায় আর সুযোগ খোঁজে।

ক্রমশ ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলির।

ছক্-মত কাজ এগোচ্ছে না। যাবতীয় সরকারী বিধিব্যবস্থা সত্ত্বেও না। প্রথম প্রথম গায়ে মাখে নি। বিক্ষোভ একটু আধটু দেখা দেবে জানতই। নিজের ভালো যদি বুঝতে শিখত ওরা, তাহলে এতকাল ভুগতো না। সরকারী পরোয়ানার জোরেই এসব ছোটখাটো বাধাবিঘ্ন নিয়ে মাথা ঘামায় নি সে।

কিন্তু না ওরা এসে কাজে লাগছে, না জায়গা-জমি ছেড়ে নড়ছে।

অবশ্য বাইরে থেকেও হাজারে হাজারে মজুর চালান হয়ে আসবে এখানে।

কিন্তু সবার আগে স্থানীয় লোকেরই দরকার। বনজঙ্গল সাফ করে কুলি-কামিনের বসতির একটা ব্যবস্থা হলে তবে বাইরে থেকে যথেচ্ছ লোক চালান নিয়ে আসা যায়। দশ বিশ মাইল এদিক-ওদিক থেকে যারা আসছে তাদের সংখ্যাও খুব কম নয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। তাছাড়া ঠিক নির্ভয়ে কাজও করতে পারছে না তারা, হামলার ভয়ে তটস্থ আছে।

গাঁয়ের মুরব্বীদের প্রথমে ডাকা হল, বোঝানো হল, প্রলোভনও দেখানো হল অনেক। সরকারী নোটিসের ভ্রূকুটিও বাদ গেল না। তারপর, কর্মচারীদের ওপর আস্থা না রেখে বাদল গাঙ্গুলি নিজে গেল তাদের দরজায় দরজায়। স্থানীয় ভদ্রলোকদের অনুরোধ করল মধ্যস্থতা করতে। কিন্তু কিছুতে কিছু হয়ে উঠছে না।

মানুষটা নির্দয় নয় খুব। কিন্তু একটা যান্ত্রিক ঝোঁকে কাজ করে যায়। কাজের বেলায় তার আপস নেই কারো সঙ্গে কিছুর সঙ্গে। তাই ওদের এই অবুঝপনা বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছে। কাজে বাধা পড়লে ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ওড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ওদেরও নিঃশেষ করে দিতে পারে হয়তো। সম্ভব নয় বলেই মেজাজ চড়ছে আরও বেশি।

এমন দিনে দলবলসহ পাগল সর্দারের আগমনে বাদল গাঙ্গুলি ঠাণ্ডা হল কিছুটা। ভাবল, এই করে আস্তে আস্তে সকলেই বশীভূত হবে। আসা মাত্র মোটা মজুরিতে বাহাল করে নিল সর্দারকে এবং তার অধীনে আর সকলকে।

কিন্তু সেদিন লোকটাকে দেখে নি বাদল গাঙ্গুলি, তার আসাটাই বড় করে দেখেছে। দু'দিন না যেতে লোকটাকেও দেখল ভালো করে।

দিন দুপুর।

পাহাড়ের গায়ে গায়ে কাজ করছে মাত্র শ'দেড়েক লোক। প্রথম বারের পাহাড়-টলানো পাথরগুলো নিচে গড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। কর্মকর্তারাও আছেন। তদবির-তদারক করছেন, মাপজোখ করছেন। ওই পাহাড়ের মাথায় সারি সারি কোয়ার্টার হবে বাবুদের, রাস্তা তৈরী হবে—তারপর আসল কাজ।

দূরে দূরে ঝাঁক বেঁধে এসে দাঁড়াল প্রায় তিন চার শ' গ্রাম্য লোক। চিৎকার চেঁচামেচি হট্টগোল শুরু করে দিল তারা দূর থেকেই। কাছে আসতে ভরসা পাচ্ছে না খুব। কি অস্ত্র আছে এদের কাছে জানে না। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এদিকের সকলেরা।

ওদের বিক্ষোভটুকু উপলব্ধি করছে বাদল গাঙ্গুলি, কিন্তু চিৎকার করে কি যে ওরা শাসাচ্ছে কিছুই বুঝছে না। ওদের নিজস্ব ভাষা আলাদা। কেবল পাগল

সর্দারের নামটাই কানে আসতে লাগল বার বার ! বায়নাকুলারে চোখ লাগালো বাদল গাঙ্গুলি। না, অস্ত্র নেই কারো সঙ্গে।

এ দলের একজন এসে জানালো, পাগল সর্দারকে পেলে ওরা ছিঁড়ে খাবে, সেই কথাই বলছে।

অদূরে যেখানটায় পাগল সর্দার কাজ করছে দলবল নিয়ে, বাদল গাঙ্গুলি পায়ে পায়ে সেখানে এসে দাঁড়াল। কোদাল-শাবল-গাঁইতি হাতে তারাও দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। দেখছে চেয়ে চেয়ে। শুনছে।

ওদিকের চেঁচামেচি বাড়ছে।

হঠাৎ বাদল গাঙ্গুলি দেখল, এদেরই একজন ঠক্ করে হাতের কোদাল ফেলে দিয়ে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলল বিক্ষোভকারীদের দিকে। অনেকটাই এগিয়ে গেল। তারপর বেশ উঁচু একটা পাথরের ওপর উঠে দাঁড়াল সে। বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল পাথরের মতই।

হোপুন—!

প্রতিপক্ষের চেঁচামেচিতে আস্তে আস্তে ছেদ পড়ে গেল। কিছু একটা বিস্ময়ের কারণ ঘটল যেন তাদের। ক্রমশ একেবারেই চুপ করে গেল তারা। শুধু দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ···। নিজেদের মধ্যে কিছু একটা বলাবলি করতে লাগল তারা। তার পর ফিরে চলল।

হোপুন আস্তে আস্তে দলে ফিরে এলো আবার। কোদাল তুলে নিল।

দলের একজন বাদল গাঙ্গুলিকে বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা। হোপুনকে এই দলের মধ্যে দেখে অবাক হয়েছে তারা। গাঁয়ের খোদ মাঝির ছেলে হোপুন। তাই ফিরে গেল। এবারে মুরুব্বীদের বৈঠক বসবে, পরামর্শ হবে, তার পর যা হয় ঠিক করা হবে।

বাদল গাঙ্গুলি নিরীক্ষণ করে দেখল মাঝির ছেলে হোপুনকে। পরে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, এখন তোমরা কি করবে ?

হোপুন খানিক চেয়ে থেকে ক্ষুদ্র জবাব দিল, কামি—। অর্থাৎ কাজ করবে।

কিন্তু ওরা যে তোমাদের ভয় দেখিয়ে গেল ?

আবার একটু চুপ করে থেকে হোপুন সাদাসিধে জবাব দিল, কুদালে করে উদের মাথা কুপায়ে দুব—।

দলের কমবয়সী জোয়ানরা সব হেসে উঠল। বাদল গাঙ্গুলির চোখ পড়ল সর্দারের ওপর। সর্দার চেয়ে চেয়ে হোপুনকেই দেখছে। তার কালো চোখে স্নেহ

ঝরছে। কিন্তু এ কথায় নিশ্চিন্ত হওয়া চলে না বাদল গাঙ্গুলির। এই লোকগুলো ফিরে গেলে কি হবে কে জানে? সর্দারের কাছে গিয়ে বলল, সর্দার কি করবে তোমরা?

পাগল সর্দার বাংলাটা আর একটু ভালো রপ্ত করেছে। হেসে পাল্টা প্রশ্ন করল, কেনে, তোর ডর লেগেছে?

এরকম বাক্যালাপে অভ্যস্ত নয় চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি। কিন্তু এ তার কেতাদুরস্ত আপিসের পরিবেশ নয়। খারাপ লাগল না। বরং এ পরিবেশে এই যেন ভালো। বলল, তোমরা ফিরে গেলেই তো ওরা তোমাদের ধরবে আবার।

কিন্তু সে আর কোদাল দিয়ে ওদের মাথা কুপিয়ে দেবে বলল না। বলল, ধরে তো বল চিতায়ে দুব।

ধুম চিতিয়েই দিয়েছিল পাগল সর্দার।

আরো মাসখানেক পরের ঘটনা। এর মধ্যে প্রকাশ্য বিক্ষোভ আর কিছু দেখা যায় না। বরং অনেকেই এসে যোগ দিয়েছে আরো। প্রতিদিনই নতুন লোক আসছে কিছু কিছু। মড়াই-সংলগ্ন জনবসতিও একটু একটু করে হালকা হয়ে আসছে। ভদ্রলোকেরা আধা-ভদ্রলোকেরা মুখে যে পরামর্শই দিক, মগজ তাদের পরিষ্কার। ক্ষতিপূরণ বুঝে নিয়ে তারাই সবার আগে সরে যাচ্ছে। ভিন্ন ভিন্ন গাঁয়ের মাঝিরা সব ভেবে সারা। আজীবন বাঁধাধরা শাস্ত্র আর সংস্কারগত পথ ধরে চলতে অভ্যস্ত তারা। কিন্তু এ সমস্যার সমাধানই বা কি, বিধানই বা কি? আর, তাদের বিধান মানবেই বা কারা? যে যার আত্মীয়-পরিজনকেই সামলাতে পারছে না, অন্যকে বোঝাবে কি করে? বংশগত নিদারুণ দারিদ্র্যের মাঝে কি করে ঠেকাবে এই কাঁচা টাকার আকর্ষণ?

তারা বিধান দিতে পারে, টাকা দিতে পারে না।

সে বরং পারে ওই পাগল সর্দার। কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই ব্যবস্থা করে দিতে পারে। দিচ্ছেও। একটা ঘর বসতি ছাড়ে তো পাঁচটা ঘর দুর্বল হয়ে পড়ে মনে মনে। ঘুরে ফিরে আবার সকলে রাগ গিয়ে পড়ে ওই পাগল সর্দারের ওপর। নিজে সাত-তাড়াতাড়ি সর্দারী না করে গাঁয়ের মাঝি মোড়লদের সঙ্গে পরামর্শ করে যা হোক কিছু ঠিক করলেই তো হত!

কিন্তু পাগল সর্দারের নাগাল আর পাবে কেমন করে তারা! অনেক আগেই ঘর ছেড়ে মেয়ে নিয়ে নিরাপদ এলাকায় উঠে চলে গেছে সে। নতুন করে ঘর বেঁধেছে। সেই এলাকায় ওদের প্রতাপ খাটবে না। গাঁয়ের ঘরবাড়ি ছেড়ে যারাই মড়াইয়ের কাজে গিয়ে লেগেছে, তারাই ও এলাকায় গিয়ে দল ভারী করেছে।

মনে মনে কিছুটা আগস্ত হয়েছিল বাদল গাঙ্গুলিও। পরিবর্তনের পতিটা ধীর বলে মাঝে মাঝে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেও ধৈর্য হারায় নি। সেই দল বেঁধে চড়াও করার ব্যাপারটাও ভুলে গেছে। আর তেমন গোলযোগের আশঙ্কা আছে বলেও মনে হয় নি।

কিন্তু আবারও এক দিন থমকে যেতে হল তাকে। নিজে উপস্থিত ছিল না। লোকমুখে আদ্যোপান্ত শুনল।

পাঁচ সাত জন মাত্র লোক নিয়ে কিছু দূরে একটা জায়গা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েছিল ড্রাফটস্‌ম্যান নরেন চৌধুরী। বলা বাহুল্য, পাগল সর্দারও সেই পাঁচ সাত জনের এক জন। এখানকার সব মাটি, সব পাথর চেনে সে।

হঠাৎ এভাবে আক্রান্ত হতে পারে কেউ ভাবে নি। তীরধনু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রায় জন পঁচিশেক লোক অদূরে পথ আটকে দাঁড়িয়েছে। কখন তাদের লক্ষ্য করেছে, কখন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে, কেউ খেয়াল করে নি।

এদিকে সম্বল মাত্র গোটাকয়েক কোদাল আর শাবল। নরেন চৌধুরীর গলায় একটা ক্যামেরা আর তার সহকারীর হাতে নোটবই, ফিতে পেন্সিল।

ওই কালো মানুষদের অটুট সঙ্কল্প আর প্রতিহিংসার একটা হিমস্পর্শে সহসা যেন একেবারে স্থির হয়ে গেল সকলে। বোবা-মৃত্যুর ছায়া পড়ল একটা। তার পরেই সচেতন হয়ে পাগল সর্দারকে ঘিরে দাঁড়াল তার সেই পাঁচ সাত জন সঙ্গী। নিজের ভাষায় চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, কি চায় ওরা।

দূর থেকে তারা জবাব দিলে, পাগল সর্দারকে চায়—তাকে ওদের হাতে ছেড়ে দিলে কাউকে কিছু বলবে না, বাকি সকলকে ফিরে যেতে দেবে। আর যদি বাধা দেয় তো তীর মেরে সকলেরই কলজে ফুঁড়ে দেবে।

কালঘাম ছুটছে নরেন চৌধুরীর আর তার সহকারীর। পালাবার পথ নেই। পরিত্রাণও বোধ হয় নেই আর। হঠাৎ দেখা গেল, ক্ষিপ্ত পাগল সর্দার সঙ্গীদের ঠেলে চিৎকার করে কি বলতে বলতে প্রায় বিশ-ত্রিশ পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল বুক টান করে। তার পর ওদের সেই প্রায় দুর্বোধ্য ভাষায় উন্মত্তের মত যা বলতে লাগল তার মর্মার্থ, নে কত তীর মারবি মার। আমার কলজে ফুটো করে সব রক্ত মড়াইকে দে! কিন্তু আরো অনেক, অনেক রক্ত খাবে মড়াই, তোদের সকলের রক্ত খাবে—তোদের গ্রামসুদ্ধ সকলকে কেটে মড়াইকে রক্ত দেওয়া হবে—এত রক্ত খেয়ে মড়াইয়ের জল ভালো হবে খুব—কত তীর মারবি মার, কত কলজে ফুটো করবি কর।

পাহাড়ে পাহাড়ে যেন গমগম করতে লাগল তার কণ্ঠস্বর। কয়েক মুহূর্তের

জন্য বিমূঢ় হয়ে রইল কালান্তক যমের মত যারা দাঁড়িয়ে আছে তারাও। তার পরেই সচেতন হল। ধনুকে তীর লাগানোই আছে। এক পা দু' পা করে এগোতে লাগল তারা। চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ ভদ্রলোক দু'টির দিকে। অর্থাৎ নরেন চৌধুরী আর তার সঙ্গীর দিকে। যাদের আক্রমণ করছে তাদের নাড়ীনক্ষত্র চেনে ওরা, বোঝে। কিন্তু এই এদেরই ঠিক চেনে না, ঠিক বোঝে না—তাই বিশ্বাসও নেই, কোন্ মুহূর্তে কি করে ফেলবে।

কথায় আছে, পরমায়ুর জোর থাকলে স্বয়ং ভগবান বুদ্ধি যোগান। উত্তেজনার বশেই নরেন চৌধুরী দু'চার পা দ্রুত এগিয়ে এসে গলায় ঝোলানো ক্যামেরাটা তাড়াতাড়ি চোখে লাগালো। কেন লাগালো, কি হবে ছবি নিয়ে, সত্যি ছবি নেবে কি না নিজেও জানে না।

অকস্মাৎ হকচকিয়ে গিয়ে লোকগুলো পিছু হঠল খানিকটা। আর বিমূঢ় নেত্রে নরেনও ক্যামেরা নামালো চোখ থেকে। মাত্র মুহূর্তের জন্য। তারপরেই বিদ্যুৎঝলকের মত একটা চকিত উপলব্ধির বশে আবার ক্যামেরা তুলে নিল চোখে—এগিয়ে গেল আরো পাঁচ সাত দশ পা।

ছত্রভঙ্গ হয়ে দ্বিগুন পিছনে সরে গেল ওরা। ভাবল, আওতার মধ্যে পেলেই বাক্স থেকে লোকটা ছুটন্ত আগুন ছাড়বে। গলায় ঝোলানো ওই কালো বাক্সটার ভয়েই এতক্ষণ তারা এত কাছে আসতে পারছিল না।

এদিকেও প্রাণের দায় বড় দায়। মুহূর্তে ওদের দুর্বলতার কারণটা বুঝে নিয়েছে সকলে। চিৎকার চেঁচামেচি তর্জন গর্জন করে উঠল সবাই একসঙ্গে—দে কত্তা দে, দে ছুটন্ত আগুনে সব ক'টার মাথার খুলি উড়িয়ে!

নরেন চৌধুরী চোখে ক্যামেরা লাগিয়ে পাথরে ঠোক্কর খেতে খেতে এগিয়ে চলল, হাকডাক ছেড়ে অনুসরণ করল অনুচরেরা।

বেগতিক দেখে ছুটছাট সরে পড়ল সামনের ক্ষুদ্র বাহিনীটি।

এলাকায় ফেরামাত্র খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। যে যার কাজ ফেলে এসে জড় হতে লাগল এরকম একটা ব্যাপারে জটলা হবে না তো কি!

শুনল বাদল গাঙ্গুলিও। তাড়াতাড়ি এসে উপস্থিত হল। তাকে দেখে কলগুঞ্জন বন্ধ হল ওদের। কিন্তু যে দৃষ্টিতে সকলে তাকালো তার দিকে, তার অর্থ সুস্পষ্ট। আমাদের কি সত্যি আশ্রয় দিতে পেরেছ তুমি? সত্যি কি আমরা নিরাপদ?

আবার এরকম একটা বিঘ্নের সম্ভাবনা কল্পনাও করে নি বাদল গাঙ্গুলি। জটলার মধ্যে পাগল সাদারই বিচলিত হয় নি মনে হল। আর বিচলিত হয় নি হোপুন। মূর্তির মত এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেও।

বাদল গাঙ্গুলি তাদের কিছু বলা বা আশ্বাস দেবার আগেই আর একটি মূর্তির আবির্ভাব ঘটল সেখানে।

নারীমূর্তি। নিকষ কালো। স্বল্প আচ্ছাদন বিদীর্ণ করে সারা অঙ্গের উদ্ধত যৌবন উপছে পড়তে চাইছে।

পাগল সর্দারের মেয়ে চাঁদমণি।

নির্নিমেষ নেত্রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাপকে দেখে নিল আগে। কোথাও এতটুকু আচড় লেগেছে কিনা তাই দেখল। তারপর হোপুনের দিকে এক ঝলক তীব্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করে ভাঙা বাংলায় বাদল গাঙ্গুলিকে বলল, হেই বাবু, উই উকে ধর, উর বাপ ডাকু পেটাচ্ছে—রনখ করছে—উকে বল বাপের থানে যেয়ে নেবারন কত্তে—ইখানে সঙটা হয়ে দেখতে লেগেছে কি—!

চাঁদমণি! গরজে উঠল পাগল সর্দার।

হোপুনের মুখের ওপর আর এক পশলা আগুন ছড়িয়ে যেমন এসেছিল তেমনি দুমদাম পা ফেলে প্রস্থান করল চাঁদমণি।

নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল বিলেত জামানী ফেরত চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি।

ড্যামের কাজ এগোলেও তার মন্থর গতিই হয়তো পরোক্ষ একটু আশার কারণ হয়েছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের। হয়তো বা শেষ পর্যন্ত সকলকেই যেতে হবে না, অনেকেই হয়ত বা থেকে যেতে পারবে। অন্তত কিছু দূরে বসতি যাদের, আশা তাদেরই বেশি। কি এমন হবে যার জন্য এই এত দূর থেকেও সরতে হবে! ওই তো ফিতের মত পড়ে আছে শুকনো মড়াই, তাকে আর ক'হাজার গুণ ফোলাবে বাপু যার জন্য এত বাড়াবাড়ি তোমাদের? অতএব অসন্তোষের স্ফুলিঙ্গটুকু জিইয়ে রাখো আর শেষ পর্যন্ত দেখো কি হয়—ষোল আনা চাইছে, যে ক'আনা রাখা যায়। তাই একটা কিছু করো, একটা কিছু করে ড্যামওয়ালাদের বুঝিয়ে দাও তোমাদের ভিতরের জ্বালা।

কি করবে?

কেন পাগল সর্দারকে দেখছ না? তার বিশ্বাসঘাতকতা দেখছ না? জাতি-দ্রোহিতা দেখছ না?

কিন্তু ফল বিপরীত দাঁড়াল। দ্বিতীয় বারের এই ঘটনার পর কর্তব্য স্থির করে ফেলল চিফ ইঞ্জিনিয়ার। দু'চার মাস পরে যা করত, সব কাজ বাতিল করে সেদিকেই আগে মন দিল।

ছোটখাটো একটা হিল ব্লাস্টিং দেখেছিল এখানকার লোক। ওটুকু ধ্বংসের রূপ দেখেই স্তব্ধ হয়েছিল। আর একবার তাই দেখবে তারা। তার থেকে

অনেক বেশি দেখবে।

দিন স্থির হল। সপ্তাহ চারেক পরের একটা দিন। শহর থেকে পুলিস এলো, মিলিটারি এলো, কর্মচারী এলো। সর্বত্র ঘোষণা করা হল, চারিদিকে রাষ্ট্র করা হল ওই দিনটির কথা। ঘোষণার আড়ম্বরে হকচকিয়ে গেল দূরের গ্রামবাসীরাও। বিস্তৃত একটা গণ্ডি ধরে বিপদের লাল নিশানা পড়ল সারি সারি।

সরে যেতে হবে। ওই দিনের আগে এই গণ্ডি থেকে সকলকে সরে যেতে হবে। নয়তো গুঁড়িয়ে ছাতু হয়ে যাবে সব, আর চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না। ব্লিল্ ব্লাষ্টিং হবে সেদিন, একবার যা হয়ে গেছে তার দশগুণ হবে। ওই দিনের আগে যে সরবে না সে মরবে। অবধারিত মৃত্যু।

একটা ত্রাস সঞ্চার করতে চেয়েছিল বাদল গাঙ্গুলি। তাই হল। ওই নির্দিষ্ট দিনটা যেন মগজে বসে গেল সকলের। প্রচার সমারোহে ওই দিনের বিভীষিকা দিনে দিনে বাড়তে লাগল।

শিথিল হয়ে গেল মাটির বাঁধন। যারা সরতে চায় নি, নড়তে চায় নি, এবারে তারা সরতে লাগল, নড়তে লাগল। কি হবে···কি না জানি হবে সেদিন! তুমি সরছ কেন, তুমি তো লাল গণ্ডির বাইরে? বাইরে হলেও কাছাকাছি তো বটে! বিপদ এলে কি আর ফিতে মেপে আসবে!

তারপর সেই দিন।

সমস্ত এলাকাটি পরিদর্শন করে দেখা গেল, জীবনের চিহ্ন দূরের কথা, যে পেরেছে ঘরের ইটমাটিও তুলে নিয়ে গেছে।

সকাল থেকেই নিঃশব্দে উত্তেজনা। একটা গুমোট স্তব্ধতা। সমাজ ছাড়া হয়ে যারা ড্যামের কাজে এসে লেগেছে তারাও থমকে গেছে যেন। নির্দেশমত পাহাড়ে পাহাড়ে একের পর এক গর্ত করে চলেছে তারা। তারপর এই সব গর্তের মধ্যে কি সব গুঁজে গুঁজে দেওয়া হচ্ছে। পুরু ফিতের মত কি দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে একটার সঙ্গে আর একটা। ফিতের আর এক মাথা এসে থেমেছে তাঁবুর ধার ধরে আধ মাইল দূরের একটা তাঁবুর মধ্যে। ওখান থেকেই যা কিছু করা হবে। সময়ে ওখান থেকে পালাবার জন্যে গাড়ি মজুত রেখেছে বাবুরা।

বিকেল হতেই ছুটি হয়ে গেল সকলের। সন্ধ্যা পেরুলো। রাত্রি হল।

আকাশবাতাসের সমস্ত স্তব্ধতা একটানা একটা যান্ত্রিক আর্তনাদে খান খান হয়ে গেল।

সাইরেন বাজছে। অনভ্যস্ত কানে শব্দটা একেবারে হাড়ে গিয়ে লাগল।

একটানা দ্বিগুণ স্তব্ধতা তারপর। আধ ঘণ্টার ওপর কেটে গেল প্রায়। যেন আধ যুগ কেটে গেল।

তারপর বসুন্ধরা কেঁপে উঠল বুঝি।

ঘোষণার আড়ম্বরে অত্যুক্তি ছিল না খুব।

ভোর না হতে দলে দলে লোক আসতে লাগল দেখতে। সেই বিরাট ধ্বংসের সামনে একেবারে বোবা হয়ে গেল সকলে। তাদের 'বোঙ্গা' অর্থাৎ উপ-দেবতা পবত-দেবই হল তাদের 'মারাং বুরু'। এই উপদেবতার উপাসনা করে আসছে আজন্ম কাল। পর্বত-দেবের আসল নাম 'লিটা' অর্থাৎ শয়তান—যে তাদের আদি নারী-পুরুষ 'পিলচু বুড়ী' আর 'পিলচু হারাম'কে সর্বপ্রথম হাড়িয়া খাইয়ে তাদের মধ্যে পাপ ঢুকিয়েছিল, লজ্জা-ভয় ঢুকিয়েছিল। সেই লিটা যেন আজ নিজের দেহ থেকে সহস্র সহস্র অতিকায় পাথর খুলে খুলে পায়ের নিচের মড়াইকে মেরেছে ক্ষিপ্ত আক্রোশে। পাথরে পাথরে মড়াই ছেয়ে গেছে।

যথার্থ অনুমান করেছিল চিফ ইঞ্জিনিয়ার।

ওদের বাস্তু আগলে থাকার আশা একেবারে নির্মূল হওয়ার পরে আস্তে আস্তে বিক্ষোভের স্ফুলিঙ্গও নিবেছে। এত বড় এক ভাঙনের পরেই যেন একটা গঠনের ছন্দ দেখা যেতে লাগল ধীরে ধীরে। বহু মজুর আসছে বাইরে থেকে। রোজই আসছে।

…এত সব হচ্ছে যখন, কিছু একটা হবেই বোধ হয়।

ভিতরে বাইরে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল যারা, মলিন মুখে তারাই এসে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। কর্মপ্রত্যাশী। একরোখা হলেও দারিদ্র্যের সীমা-পরিসীমা নেই মানুষগুলোর। রোখ গেছে, এখন দারিদ্র্যটাই বড়। মনে মনে হাসলেও পাগল সর্দার নিরাশ করল না কাউকে। সকলকেই দু হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করে নিল। যে এলো তাকেই। সবই সহজ হয়ে গেল। মাঝি পারাণিকরা পর্যন্ত নতুন করে সেই পুরানো সমাজেরই হাল ধরল আবার।

তিন

সান্ত্বনার স্বপ্নরাজ্যের সঙ্গে মিল নেই।

তার থেকে অনেক স্থূল, অনেক বেশি অপরিচিত। পুরোপুরি এক অনাবিল সৃষ্টির ছবিই কল্পনা করেছিল। সৃষ্টির এ কঙ্কালও তাই বলে রমণীয় নয় খুব। যে পর্যন্ত হয়েছে, কঙ্কালের আভাসও নেই। শুকনো মড়াইয়ের একটা দিকে খুঁড়ে খুবলে দগদগে ঘায়ের মত করে চলেছে এরা।

একেবারে তলা থেকে দুই পাহাড়ের খানিকটা পর্যন্ত অতিকায় এক মাটির দেয়াল তুলে মড়াইকে দু'আধখানা করে ফেলা হয়েছে। ওই অদূরে পাথরের পাকা দেয়াল তোলা হলে এটা ভেঙে ফেলা হবে। মাটির দেয়ালের ওধারে এক বর্ষার জল জমেছে খানিকটা। কিন্তু সেও কল্পনার মন্দাকিনী নয়। হাত ছোঁয়ালে গা ঘিনঘিন করার মত। কোথাও মাটি দেখা যাচ্ছে, কোথাও পাথর, কোথাও গাছ ভাসছে, কোথাও জঙ্গল পচছে, কোথাও বা ভাঙা আটচালার মাথা ভেসে উঠেছে জলের ওপর।

অন্য দিকটা খটখটে শুকনো। কাজ সেদিকটাতেই হচ্ছে। এদিক দিয়েই নাকি জল যাবে। কিন্তু সেদিকে চেয়েও সান্ত্বনার ভিরতটা শুকিয়ে যায় কেমন। যতদূর চোখ যায়, সেই হাঁ-করা মাটি, সেই পাথরের স্তূপ আর সেই জঙ্গলের অবরোধ। বন্ধ্যা, নীরস। ওখান দিয়ে জল চলা দূরের কথা, বাতাস চলাচলের অভাবে জায়গাটা যেন দমবন্ধ হয়ে পড়ে আছে কতকাল ধরে।

কিন্তু স্বপ্নরাজ্যের না হোক, এত বড় বাস্তবেরও আবেদন আছেই। উত্তেজনা আছে, রোমাঞ্চ আছে। তার থেকেও বেশি আছে দুর্বোধ্যতার বিস্ময়। একসঙ্গে কাজ করে প্রায় আট দশ হাজার লোক। এত উঁচু থেকে খুদে খুদে দেখায়। ওপরের পাথুরে জঙ্গল সাফ করে কুলিবসতি গড়ে উঠেছে একটা। এ-পাড় থেকে সারি সারি ব্যাঙের ছাতার মত দেখায় ওদের তাঁবুগুলো। সকাল না হতে যে যার সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে আসে পিলপিল করে।

যন্ত্রপাতির সমারোহও তেমনি। পাহাড়ের ওপর থেকে নয়, সান্ত্বনা সেই নিচে নেমে গিয়েই দেখে এসেছে। কড়কড় করে মাটি ফুঁড়ে চলেছে, না যেন জমাট-বাঁধা মাখনের তাল ফুঁড়ে চলেছে। বিশ-ত্রিশ-পঞ্চাশ মণের এক একটা পাথর তুলছে যা তো, যেন এক একখানা পলকা ইট তুলছে অবলীলাক্রমে। এরকম অজস্র ব্যাপার।

প্রথম দিনকতক স্তব্ধ বিস্ময়ে শুধু দেখেই গেল সান্ত্বনা। তারপর একদিন বলে ফেলল, কি হচ্ছে না হচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না বাবা, বিচ্ছিরি লাগছে।

অবনীবাবু তার বিচ্ছিরি লাগাটাই শুনলেন শুধু। বললেন, আমি তো আগেই জানি, তখন অত করে আসতে বারণ করলাম, না শুনলে কি করব। আর ক'টা দিন থাক্, ফাঁকমত রেখে আসব'খন তোকে—

বেশ, আমি কি বললাম আর তুমি কি শুনলে! বললাম, কি দিয়ে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিচ্ছু বুঝছি না বলে ভালো লাগছে না—না ফাঁকমত রেখে আসব'খন তোকে! তুমি বললেই আমি গেলাম আর কি!

সকালের রাউণ্ডে বেরুবার তোড়জোড় করছিলেন অবনীবাবু। খুব খেয়াল করে শোনেন নি আগে। এবারে শুনলেন। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের কি হচ্ছে না হচ্ছে বুঝছিস না?

সান্ত্বনা লজ্জা পেয়ে গেল একটু।—এই কি ক'চ্ছ না ক'চ্ছ তোমরা মাথামুণ্ডু তাই। দাঁড়াও, তোমার খাবারটা নিয়ে আসি—

প্রস্থান করল। মেয়ের বিচ্ছিরি লাগার হেতু শুনে অবনীবাবুর কি জানি কেন ভালো লাগল না খুব।

সান্ত্বনা তার দু'ঘরের ক্ষুদ্র গৃহস্থালি বেশ কায়েমী ভাবে গুছিয়ে নিল। মাসি চিঠিতে তাড়া দিলেন ফেরার জন্য। সান্ত্বনা উল্টে আমন্ত্রণ জানালো তাকে, চমৎকার লাগবে মাসিমা, দু'দিন এসে থেকে যাও—

বাঁধাধরা আপিস-টাইম বলে কিছু নেই এখানে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কাজ চলছে। আপিস বা যাবতীয় কাজ সবই পাহাড়ের নিচে। ওপরে শুধু কোয়ার্টার। পায়ে হেঁটে ওপর নিচ করাটা রীতিমত পরিশ্রমের ব্যাপার। সারাক্ষণ একটা ট্রাক মজুত আছে এই জন্যে। দিনের মধ্যে কতবার ওটা লোক নিয়ে ওঠা-নামা করে ঠিক নেই। পাহাড় ঘেঁষে ঘুরে ঘুরে এঁকেবেঁকে পাকা রাস্তা চলে গেছে এক মাথা থেকে আর এক মাথায়। ট্রাকটা অবশ্য মজুত থাকে মেন কোয়ার্টারস্‌এ। যে দিকটায় হোমরাচোমরা কর্তাব্যক্তিদের আবাস, যেখানে গেস্টহাউস ইত্যাদি। সান্ত্বনাদের কোয়ার্টার সেখান থেকে অনেক দূরে, অনেকটা বিচ্ছিন্ন। সাধারণ চাকুরেদের জন্য কিছু দূরে মাত্র তিন-চারটে কোয়ার্টার হয়েছে সেখানে, নতুন আরও দু'তিনটে হচ্ছে।

সকালে স্নানাদি সেরে অবনীবাবু মেন কোয়ার্টারে চলে আসেন। নিচে নামতে হলে এখান দিয়েই একমাত্র পথ। সেখান থেকে ট্রাকে করে নিচে নেমে যান। আর ওঠেন সেই সন্ধ্যায়। বেয়ারা এসে টিফিন-ক্যারিয়ার করে

দুপুরের খাবার নিয়ে যায়। বাড়ি ফিরতে একেবারে রাতও হয় প্রায়ই। আপিসের পর গেস্ট-হাউসের হল-ঘরে কর্মকর্তাদের মিটিং বসে, নয়তো কিছু না কিছু আলোচনা থাকে।

অখণ্ড অবকাশ সান্ত্বনার।

দুর্বিষহ লাগার কথা। কাছাকাছি কোয়ার্টার ক'টাতে কোন মেয়েছেলের নামগন্ধও নেই। পাঁচ-ছ'জন করে পুরুষ কর্মচারী মেসের মত করে আছে। কিন্তু মাঝখানের মাসির বাড়ির ক'টা বছর বাদ দিলে এরকম অবকাশে সান্ত্বনা অনেকটাই অভ্যস্ত। আর অবকাশই বা কোথায়? 'চোখের খোবাক যেখানে অফুরন্ত আর মনের কৌতূহল যার এত সজাগ, সময় তার আপনি কাটে।

প্রথম প্রথম অবশ্য একলা ঘোরাফেরা করতে সাহস পেত না খুব। স্তব্ধ, নির্জন পরিবেশে দিনেদুপুরেও কেমন লাগত যেন। হাজার হোক অজানা অচেনা জায়গা। কিন্তু সে অস্বস্তি কাটতে ক'টা দিন আর। আজ এদিকে খানিক দূর উঁকিঝুঁকি দেয়, কাল ওদিকে। তা ছাড়া যে বেয়ারা দুপুরে বাবার খাবার নিতে আসে তার কাছ থেকে শুনেছে, ভয়ের নাকি কোথাও কিচ্ছু নেই। সাঁওতালরা সব মাটির মানুষ—ঘরদোর খোলা ফেলে রাখলেও কুটোটি সরাবে না। এই মানুষদের খবর বৃত্তান্ত সান্ত্বনা ভালই জানত। তবু শুনলে সাহস বাড়ে।

মেয়েছেলে আছে মেন কোয়াটারসএ। শাড়ির আভাস পেলেই সান্ত্বনা বিনা দ্বিধায় হানা দেয় একবার দু'বার। কিন্তু বয়স যাই হোক, কর্তাদের পদমর্যাদায় সকলেই বিশিষ্ট মহিলা এঁরা। পাশাপাশি বসবাসের ফলে নিজেদের মধ্যেই পাল্লা দিয়ে চলেন একটু আধটু। এই সাদাসিধে মেয়েটা তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ঠিকই। ওভারসিয়ারের মেয়ে শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হলেন তাঁরা।

—ও, অমুক ওভারসিয়ারবাবুর মেয়ে তুমি? জেনারেল কোয়ার্টারে থাকো বুঝি? আর কে আছেন? শুধু বাবা, আর কেউ না? তাহলে তো বড় কষ্ট তোমার···মাঝে মাঝে চলে এসো, গল্পসল্প করা যাবে।

কেউ না থাকার কষ্টটা সান্ত্বনার থেকে এঁদেরই বরং বেশি। কিন্তু ওভারসিয়ারের মেয়ের কাছে তো আর দুঃখ প্রকাশ করা চলে না। গল্পসল্পের আকর্ষণে ওভারসিয়ারের মেয়ে যদি মাঝেসাঝে আসতে শুরু করে, অপরাপরদের চোখে সেটা বিসদৃশ ঠেকবে কিনা, তাই বরং ভাববার কথা।

নাকের ডগায় এত বড় এক সৃষ্টির মহড়া চলেছে, কিন্তু সে সম্বন্ধে এতটুকু কৌতূহল নেই তাঁদের। সাগ্রহে হয়তো সান্ত্বনা বলে উঠেছে, বাঃ, আপনাদের এখান থেকে তো সুন্দর দেখা যায় সব কিছু।

জবাব : আর বোলো না, দেখে দেখে চোখ পচে গেল। সকাল সন্ধ্যা তো ওই দেখছি।

নির্বাক নেত্রে চেয়ে থাকে সান্ত্বনা। দেখে দেখে চোখ পচে যায় কি করে বুঝে ওঠে না। বরং সকাল সন্ধ্যা দেখছে শুনে ঈর্ষা হয়।

মেন কোয়ার্টারসএর মহিলাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল না সান্ত্বনার। নিজেই কেটে পড়ল সে। কিন্তু এদিকটায় আনাগোনা বেড়ে গেল। মেন কোয়ার্টারস্ থেকে একটা রাস্তা এসেছে পাহাড়ের একেবারে শেষপ্রান্তে। দুপুরের নিরিবিলিতে যে কোনো একটা পাথর বেছে নিয়ে বসে পড়ো হাত পা ছড়িয়ে। নিচে মড়াই। আর তার ভাবী বন্ধন-সমারোহ। এত উঁচু থেকে ছবির মত দেখায়। যন্ত্রের কাছ থেকেও ওই কুলিকামিনদের কাজ দেখতে ভালো লাগে বেশি। পুরুষেরা মাটি কাটে, পাথর ভাঙে। মেয়েরা সেগুলো মাথায় করে বয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু এটুকুর মধ্যেই কোথায় যেন বেশ একটা ছন্দ আছে। মনে মনে আস্বাদন করার মত কিছু একটা।

এক একদিন নিজের কাছেই লজ্জা পেয়ে যায় সান্ত্বনা।···ভাবছে কি না, ওই মেয়েগুলোর মত সেও যদি অবাধে কাজে লেগে যেতে পারত! ওদের মত ওদের সঙ্গে! দৃশ্যটা কল্পনা করতে চেষ্টা করল। মাথায় মাটির ঝুড়ি বা পাথরের বোঝা। একা একাই হেসে কুটিকুটি তারপর। মা গো মা, কি বেয়াড়া সাধ!

সেদিন দুপুরে বেয়ারা বাবার খাবার নিতে এলে কি ভেবে সান্ত্বনা বলল, চলো আমিও যাই তোমার সঙ্গে।

টিফিন-ক্যারিয়ার গুছিয়ে নিজেই সেটা হাতে করে বেরিয়ে পড়ল। এই পাহাড়ী পরিবেশে কিছুই যেন বেমানান নয়। এই মুক্তির আস্বাদনটুকুই সব থেকে ভালো লাগে।

অবনীবাবু অবাক হলেন, তুই যে?

এলাম। রোজ রোজ এই লোকটাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি, মাঝে মাঝে আমিই তো নিয়ে আসতে পারি তোমার খাবার।

অবনীবাবু কি আর বলবেন। ঘরে আরো পাঁচ-সাতজন লোক আছে। আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছেও তারা। এই বৈচিত্র্যটুকু তাদের ভালো লেগেছে। কিন্তু বাবার এই খুপ্‌রি আপিস-ঘর সান্ত্বনার একটুও ভালো লাগে নি। বলল, এখানে বসে কাজ করো নাকি তোমরা?

ঘরের কাজ কমই। কিন্তু সে-কথা না বলে অবনীবাবু বললেন, হ্যাঁ। তোর পছন্দ হচ্ছে না?

না।

গায়ে গায়ে লাগানো ছোট ছোট টেবিলের সামনে সমাসীন লোক ক'টিকে সান্ত্বনা দেখে নিল একবার। এখানে এদেব সামনে বসে বাবা খায় কি করে ভেবে পাচ্ছে না। মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় ওদেবও খিদে পেয়েছে। দ্বিধা কাটিয়ে বলেই ফেলল, কোথায় বসে খাবে তুমি ?

তার সমস্যাটা স্পষ্টই বোঝা গেল। সকৌতুকে দেখতে লাগল সকলেই। বিব্রতমুখে টিফিন-ক্যারিয়ার হাতে করে দাঁড়িয়ে রইল সান্ত্বনা। অবনীবাবু উঠে এক গ্লাস জল গড়িয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিলেন। পবে ডাকলেন, আয়—।

বাইরে পাহাড়ের ছায়ায় বড় একটা পাথরের ওপব বসলেন তিনি।—বার কর্ কি এনেছিস !

এদিক ওদিক চেয়ে সান্ত্বনা ভারি খুশি হয়ে গেল। অমনি এক একখানা পাথরের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে অনেককেই নিবিষ্টচিত্তে 'লাঞ্চ' খেতে দেখা গেল। সান্ত্বনার ভালো লাগল খুব। নিজে খেয়ে এসেছে বেশিক্ষণ হয় নি, কিন্তু এরকম জায়গায় বসে খাবার লোভেই আর একবার বসে যেতে পারে বোধ হয়। সানন্দে টিফিন-ক্যারিয়ার থেকে খাবার বের করতে করতে জিজ্ঞাসা করল, তোমার ঘরের ওই ভদ্রলোকেরা খাবে না বাবা ?

ওদের খাবার এলেই খাবে। কিন্তু তুই যে নেবে এলি এখন, উঠতে কষ্ট হবে না ? হেঁটে উঠে কাজ নেই, ট্রাক এলে বলে দেব'খন, তুলে নেবে—

পাহাড়ী রাস্তায় ট্রাকে চড়ার লোভ আছে। কিন্তু তাহলে আসাটাই পণ্ড। এক্ষুনি হয়তো হুস করে উঠে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি বাধা দিল, তোমার ট্রাকে কাজ নেই, পায়ে হেঁটেই খুব উঠতে পারব আমি। তুমি আস্তে ধীরে খাও বসে, আমি একটু ঘুরেটুরে দেখে আসি। খাওয়া হলে বেয়ারাকে সব গুছিয়ে রাখতে বোলো, আমি নিয়ে যাব'খন।

আসলে এই জন্যেই আসা।

আর কোনো কথার অপেক্ষা না রেখে সান্ত্বনা এগিয়ে চলল। এখান থেকেও মড়াইয়ের তলদেশ অনেক নিচে। পাথর ভেঙে নামতে লাগল। বেশ পরিশ্রমের ব্যাপার। টাল সামলানো দায় এক এক জায়গায়। ওই লোকগুলো তরতর করে নেবে যায় কি করে, ভেবে অবাক হয়। মেয়েগুলো পর্যন্ত। কিন্তু মড়াইয়ের বুকের ওপর গিয়ে সেও আজ দাঁড়াবেই। অভ্যেস নেই বলে—কিন্তু অভ্যেস হতে ক'দিন আর !

সত্যিই ক'দিন আর ! বেলা গড়াবার সঙ্গে সঙ্গে উন্মুখ হয়ে ওঠে

বাবার খাবারটা নিয়ে কতক্ষণে নিচে নেমে আসবে। অর্থাৎ, কতক্ষণে তারপর মড়াইয়ের গহ্বরে অবতরণ করবে। ভয় তারও ভেঙেছে, এখন প্রায় দৌড়ে নেমে আসে সেও। তারপর যেদিকে খুশি পা চালিয়ে দাও, সর্বত্রই দেখার উৎসব।

সান্ত্বনা দেখে। আবার তাকেও ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সকলে। কালোর তরঙ্গে একটি মাত্র ব্যতিক্রমের দিকে আর চোখ না যায় কার? তাই এই নীরব অথচ সজীব কৌতূহলটুকু বেশ লাগে ওদের। মেয়েরা হাসে। সান্ত্বনাও হাসে। পুরুষেরা কোদাল শাবল থামিয়ে সোজাসুজি নিরীক্ষণ করে। নীরব চোখে সান্ত্বনা কৈফিয়ৎ দেয় যেন, তোমাদের বিরক্ত করতে চাই নে, একটু দেখছি শুধু—।

ফাঁকমত সেদিন আলাপ হয়ে গেল একজনের সঙ্গে। লোকটাকে অনেক সময়েই লক্ষ্য করেছে সান্ত্বনা। মাতব্বর গোছের একজন, বেশ বোঝা যায়। ছোট ছোট অনেকগুলো কুলি-কামিনের দল তার আদেশ-নির্দেশমত কাজ করে। মস্ত একটা পাথরের ওপর বসে বোধ হয় বিশ্রাম করছিল একটু। পাশ কাটাতে গিয়েও সান্ত্বনা দাঁড়িয়ে পড়ল। দুই এক মুহূর্ত নিরীক্ষণ করে তার মেজাজ বুঝতে চেষ্টা করল হয়তো। তারপর বলল, এখানে বসি একটু?

অবাক হয়ে লোকটি চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। পরে মাথা নেড়ে অনুমতি দিল। অর্থাৎ বসতে পারো।

শান্তশিষ্ট মেয়েটির মত বসল সান্ত্বনা। লোকটি আবার খানিক দেখে নিয়ে বলল, কার বিটি বট্‌টে?

বলল।

একটু ভাবল সে। উ লয়া উবাসির বাবুর কুড়ী বট্‌টে তু?

কুড়ী কি? বাংলার বহর শুনে সান্ত্বনা হেসেই ফেলল।

জবাব না দিয়ে লোকটিও হাসল অল্প একটু। পরে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করল, লোতুন উবাসির বাবু খুব ভালো নোক্।

পাসপোর্ট পেল যেন। পাথরে পা গুটিয়ে বসল সান্ত্বনা।—তোমার নাম কী?

পাগড় সর্দার।

অর্থাৎ পাগল সর্দার। সান্ত্বনা আবার প্রশ্ন করল, তুমি বুঝি এই সব লোকেদের সর্দার?

হেঁ।

এখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে তুমি সব জানো বুঝি?

পাগল সর্দার সকৌতুকে মাথা নাড়ল, জানে।

সোৎসাহে আবার কি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল সান্ত্বনা। থামতে হল।

অসহিষ্ণু পদক্ষেপে এদিকে আসছে একটি মেয়ে। সান্ত্বনার দিকে ফিরেও তাকালো না। তড়বড় করে সর্দারকে কি সব বলতে লাগল। বিষম রেগে গেছে এবং একটা কিছু নালিশ জানাচ্ছে, এটাই বোঝা গেল। কালো অঙ্গ ঘামে জবজব করছে। টানা দুই চোখে খরখরে রোষবহ্নি।

পাগল সর্দার গম্ভীর মুখে শুনে গেল। পরে হঠাৎ তারস্বরে হাঁক পাড়ল, ই হো-প্-পু ন্—!

সেই বাজখাঁই হাঁক শুনে সান্ত্বনা চমকে উঠল একেবারে। ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে দেখতে লাগল দু'জনকেই। দূর থেকে একটা লোক এদিকে এগিয়ে আসছে দেখা গেল।

ওই লোকটাকে আগে দেখেছে সান্ত্বনা। ছোটখাটো একটা দলের পাণ্ডা গোছের হবে। আর এই মেয়েটাকেও দেখেছে। কিন্তু কাজের মধ্যে তখন অন্য মূর্তি দেখেছে এর। মাথায় করে প্রায় দেড় মণ দু' মণ একটা পাথর বয়ে এনে ধুপ করে ওই জোয়ান লোকটার পায়ের কাছে ফেলছে। সান্ত্বনাকে দেখেই সম্ভবত ভাঙা বাংলায় রসিকতাও করেছে, লে কেতো বড় 'ধিরি' লিবি লে— তুর কলিজা থিকে উ 'ধিরি' অনেক লরমছে।

মেয়েটার ওই দুই চোখে তখন ঝিকমিক করে উঠেছিল যা, সেটা রাগ নয়, আর কিছু। এই হোপুন লোকটার মুখেই শুধু তখন কোনো ভাববিকার দেখে নি সান্ত্বনা, নইলে কাছাকাছি যারা ছিল, সকলেই হেসে উঠেছিল। দৃপ্ত ভঙ্গিতে দুই কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটা, আর দুধ-সাদা দাঁত বার করে হাসছিল। সান্ত্বনা অদূরে দাঁড়িয়ে আড়ে আড়ে ওকে দেখেছে আর পাথরটাকে দেখেছে আর অবাক হয়ে ভেবেছে, ওই অত বড় পাথর মেয়েটা এমন অবলীলা-ক্রমে মাথায় করে বয়ে নিয়ে এলো কি করে!

হোপুন সামনে এসে দাঁড়াতে পাগল সর্দার কি যেন বলল তাকে। একবর্ণও বুঝল না সান্ত্বনা। কিছু শুনেই ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত গজরাতে গজরাতে প্রস্থান করল মেয়েটা। চলনের ঠমকে পায়ে পায়ে সমস্ত আক্রোশ ঝরে পড়তে লাগল যেন।

নিষ্প্রাণ দুই চোখ তুলে হোপুন সর্দারের দিকে তাকালো একবার। সান্ত্বনাকেও দেখল। তেমনি অলস গতিতে ফিরে চলল তারপর।

পাগল সর্দার বলল, উ আমার বিটি চাঁদমণি।

আগ্রহ আরো বাড়ল সান্ত্বনার। কিন্তু সে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগে পাগল সর্দার আবার বলল, আর উ হোপুন, বিটির সঙ্গতে উর বিয়ো দুব— জাঁওয়াই কুরব।

মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ওকে জামাই করবে। শুনতে মজা লাগছে সান্ত্বনার। মেয়েটার এই রাগ-বিরাগের পিছনে মিষ্টি কিছু আছে নিশ্চয়—তোমার মেয়ে অমন করে এলো আর রাগ করে গেল কেন ?

জবাবে পাগল সর্দার যা বলল তার মর্মার্থ, মেয়েটা ভয়ানক দুষ্টু, কাজকর্মে মন নেই, কেবল হাসাহাসি ফষ্টিনষ্টি করে। সেই জন্য সর্দার ওকে অন্যের দল থেকে ছাড়িয়ে হোপুনের তত্ত্বাবধানে কাজে লাগিয়েছে। হোপুনকে সকলে সমীহ করে, কিন্তু মেয়েটা এমন পাজী যে তাকেও পরোয়া করে না। তাই হোপুন খুব কষে খাটায় ওকে। রাগ করে মেয়ে তাই বাপের কাছে নালিশ জানাতে এসেছিল—হোপুনের দলে কাজ করবে না। পাগল সর্দার হোপুনকে ডেকে চুলের মুঠি ধরে চাঁদমণিকে কাজে লাগাতে বলে দিল।

ভাবী জামাইয়ের ওপর শ্বশুরের টান দেখে সান্ত্বনা অবাক হল, খুশিও হল। এরকম নিরপেক্ষতা দুর্লভ। দূরের দিকে চেয়ে চাঁদমণিকে খুঁজল একবার। বাপের সাদাসাপটা বিচারের ফলটা কি রকম দাঁড়াল না জানি! কিন্তু এতদূর থেকে সঠিক চোখে পড়ে না।

শীগগিরই ওদের বিয়ে দেবে বুঝি ?

মনে হল, শোনেই নি। কারণ দূরের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল পাগল সর্দার। পরে ক্ষুদ্র জবাব দিল, দুব, সময় আসলে দুব।

খুব প্রাঞ্জল ঠেকল না। সময়ের আর বাকি কি তাও বুঝল না। হোপুনের দীর্ঘায়ত পাথুরে মূর্তিটি চোখে ভাসল একবার। আর যৌবনোচ্ছল চাঁদমণির মূর্তিও। হঠাৎ নিজের কাছেই লজ্জা পেয়ে অন্য দিকে ঘাড় ফেরালো সান্ত্বনা।

এই পাগল সর্দারের সঙ্গেই তার হৃদ্যতা বেড়েছে ক্রমশ। সে ওকে ডাকে দিদিয়া বলে। সান্ত্বনার ভারী মিষ্টি লাগে শুনতে। সর্দারের গোষ্ঠীর সঙ্গেও আলাপ না হোক জানাশুনা হয়ে গেল বেশ। সর্দারের দিদিয়া সকলেরই দিদিয়া। সকলেরই কৌতূহলের পাত্রী। সর্দারের মেয়ে চাঁদমণির সঙ্গেও আলাপের চেষ্টা করেছে সান্ত্বনা। কিন্তু মেয়েটার বেজায় দেমাক। আর মুখেরও আগল নেই। গভীর অবজ্ঞায় সান্ত্বনার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করেছে। তারপর ফিক করে হেসে বলেছে, তু ওজ ওজ মড়াইয়ে লামিস কেনে, তুকে দেখে যে মরদগুলার পেরাণে অঙ লাগে।

লাল হয়ে সেই যে ফিরে এসেছে সান্ত্বনা আর তার ধারে-কাছে ঘেঁষে নি। আর এড়িয়ে চলে হোপুনকে। চাঁদমণির ভয়ে কিনা কে জানে। তবে তার ওই ষণ্ডমূর্তি আর মরা চাউনি দেখেও কেমন অস্বস্তি লাগে। মুখের দিকে

তাকালে লোকটা যেন ভেতর সুদ্ধু দেখতে পায়।

গল্প জমে পাগল সর্দারের সঙ্গে ছুটির দিনে আর অবকাশকালে। শিকারের গল্প, পূর্বপুরুষদের বীরত্বের গল্প, মড়াই-বাঁধা নিয়ে সেই গোড়ার বিভ্রাট—কি হয়েছিল, কি হচ্ছে, কি হবে—সব। দিদিয়ার মত এমন শ্রোতা পাগল সর্দার আর পাবে কোথায়? তার সবেতে কৌতূহল, সবেতে বিস্ময় আর সবেতে বিশ্বাস।

প্রথম যেদিন পাগল সর্দার ওদেব বাড়ি এলো, সান্ত্বনা খুশিতে আটখানা। যেন মস্ত গণ্যমান্য কেউ এসেছে। কোথায় বসাবে, কি খেতে দেবে—বাবাকেই তাড়া দিল তিনবার করে। পাগল সর্দার এসেছে, শীগগির এসো বাবা।

সে চলে যেতে অবনীবাবু বললেন, ওদেব সঙ্গেই আজকাল বুঝি খুব ভাব তোর?

চোখ বড় বড করে ফেলে সান্ত্বনা।—পাগল সর্দাব কম লোক ভাবো নাকি! কত বড় একটা সর্দার ও জানো? ও না থাকলে তোমাদের মড়াইয়ের কাজ হত কিনা সন্দেহ।

প্রতিবাদ না করে অবনীবাবু মুখ টিপে হাসেন শুধু।

সেদিন সন্ধ্যায় একজন অপিরিচিতকে সঙ্গে করে অবনীবাবু বাড়ি ফিরলেন। অচেনা লোক দেখে সান্ত্বনা ভিতবের ঘরে চলে যাচ্ছিল। অবনীবাবু বাধা দিলেন, যাচ্ছিস কোথায়, দাঁড়া—এঁকে চিনলি?

লোকটিকে আর একবার ভালো করে দেখে নিয়ে সান্ত্বনা ঈষৎ বিব্রত মুখে বাবার দিকে তাকালো।

চিনলি নে তো?—বোসো তুমি বোসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন! আগন্তুকের দিকে একটা বেতের চেয়ার ঠেলে দিয়ে অবনীবাবু মেয়েকে বললেন, দেশের চৌধুরী-বাড়ির কথা মনে নেই তোর?—কি করেই বা থাকবে, তোর বয়স তখন পাঁচ বছরও নয় বোধ হয়—তোমরা কত বছর হল দেশ ছেড়েছ নরেন?

নরেন চৌধুরী। ড্রাফট্‌স্‌ম্যান। হেসে জবাব দিল, পনের-ষোল বছর হবে বোধ হয়, বছর চোদ্দ বয়স আমার তখন। সোজাসুজি তাকালো এবার সান্ত্বনার দিকে। বলল, না চিনলেও আমার কিন্তু মনে আছে ঠিক, ফ্রকপরা এতটুকু দেখেছি। অবনীবাবুর উদ্দেশে বলল, তা ছাড়া আপনিও বিশেষ বদলান নি, দেখেই চেনা-চেনা লাগছিল।

অবনীবাবু আর একটা চেয়ার টেনে বসলেন।—তুমি না বললে আমি চিনতেই পারতুম না, আজ বলতেই তোমার ছেলেবেলার চেহারাসুদ্ধ মনে

পড়ে গেল—অথচ, এত দিন দেখছি একবারও মনে হয় নি কিছু।

নবাগতকে লক্ষ্য করে সান্ত্বনা এবারে হালকা সুরে বলল, এতদিন একসঙ্গে কাজ করার পর আজ সবে পরিচয়টা বেরুলো!

জবাব দিলেন অবনীবাবু।—একসঙ্গে কি রে, নরেন হল পাস করা ইঞ্জিনিয়ার ড্রাফট্‌সম্যান—কত বড় চাকরি! ওর নেহাত চোখ আছে বলেই চিনেছে। আমার মত কতজনকে দেখছে রোজ, মনে রাখা সহজ নাকি!

সান্ত্বনার ভালো লাগল না কথাগুলো। এ বয়সে তাব বাবার ওপরে কাজ করে শুনেই বোধ হয়। না, দেশের চৌধুরী-বাড়িটার কথা তার কিছু মনে নেই। একেও কখনো দেখেছে বলে মনে পড়ছে না। ওপরঅলাদের ওপরে মনোভাব খুব প্রসন্ন নয় সান্ত্বনার। তাদের না দেখুক, তাদেব বাড়ির মেয়েদের দেখেছে। মাটিতে পা পড়ে না। বাবার সামনে পাগল সর্দারের শ্রদ্ধাবনত মূর্তিটি বরং ভালো লেগেছিল।

ভাবান্তরটুকু নরেন চৌধুরী লক্ষ্য করল কিনা বলা যায় না। সান্ত্বনার দিকে চেয়েই বলল, আপনার বাবা কিন্তু আমাকে চা খেতে দেবার লোভ দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন!

অবনীবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, হ্যাঁ রে সান্ত্বনা, তাই তো—একটু চা দে, আর দেখ্ নরেনের বোধ হয় ক্ষিদেও পেয়েছে—

নরেনই গম্ভীর মুখে জবাব দিল, বোধ হয় নয়, নিশ্চয় পেয়েছে।

অবনীবাবু হা হা করে হেসে উঠলেন। সান্ত্বনাও হাসিমুখে তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে এলো। কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে ভাবল দু'চার মুহূর্ত।

বড় চাকরি করলেও লোকটা দেমাকী নয় বোধ হয় তেমন। মুখের আদলেও ভালোমানুষ-ভালোমানুষ ভাব আছে। নামটাও শোনা শোনা মনে হচ্ছে। কোথায় শুনল? পাগল সর্দার—হ্যাঁ, পাগল সর্দারের মুখেই শুনেছে। তাকে ছাড়া আর কাকে চেনে সে। মনে পড়তে নীরব আগ্রহ পরিস্ফুট হ'ল মুখে।

আনন্দে চোখ বড় বড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নরেন চৌধুরী। হাত বাড়িয়ে সান্ত্বনার হাত থেকে ডিস দু'টো নিয়ে টেবিলের ওপর রাখল নিজেই, রসনায় একটা সিক্ত শব্দ বার করে বসে পড়ল আবার।

সান্ত্বনা হেসে ফেলল।

হাসছেন কি! এই ঘোড়ার ডিমের জায়গায় না খেয়েই মারা গেলাম। এগুলো কি—বেসন দিয়ে আলু-বেগুনের কাটলেট! মার্ভেলাস—আর এটা মাছের ফ্রাই! মাছ পেলেন কোথায়?

তার হাবভাব দেখে সংকোচ প্রায় কেটেই গেল সান্ত্বনার হেসে জবাব দিল, চৌবাচ্ছায় পুষছি।

লোকটি ভোজনরসিক বটে। অবনীবাবু নিলেন কি নিলেন না। একাই সে সানন্দে এবং সাড়ম্বরে প্লেট দু'টি খালি করে ফেলল। পরে বড় একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে চায়ের পেয়ালা টেনে নিয়ে অবনীবাবুকে জিজ্ঞাসা করল আপনার তাহলে খাবার কষ্ট নেই কিছু?

স্মিতহাস্যে অবনীবাবু মাথা নাড়লেন, না—এ বিদ্যেটা ও পাকা গিন্নীর মত শিখেছে।

মহাবিদ্যে শিখেছেন, আমাদের ভুতুবাবুকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব, তাকে একটু আধটু শিখিয়ে দেবেন।

সান্ত্বনা সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করল, ভুতুবাবু কে?

ভুতুবাবুকে চেনেন না! ওই যে পাহাড়ের নিচে যার অলফাউণ্ড স্টল্—স্নো পাউডার থেকে মাংস ভাত পর্যন্ত সবই নামমাত্র মূল্যে পাওয়া যায়! তার ওখান থেকেই তো রোজ আমার খাবার আসে—দু'বেলা ভাত-ডাল-মাংস—এর বাইরে কিছু চেয়েছেন কি দশ মাইল দূরে যাতায়াতের নামমাত্র খরচটা সুদ্ধ ধরে নেবে—এখানকার বেশির ভাগ লোকেরই ভুতুবাবু ভরসা।

ভুতুবাবুর স্টল্ সান্ত্বনা দেখেছে। নামটাই জানত না। অবনীবাবু ঠাট্টার ছলে বললেন, তোমাদের ভুতুবাবু ছাড়া গতি কি! পাগল সর্দারের সঙ্গে তো আর ভাব হয় নি তোমাদের—তার লোক প্রায়ই বাড়ি বয়ে মাছ পর্যন্ত দিয়ে যায়। শীগ্‌গিরই আবার গরুও যোগাড় করে দেবে বলেছে।

নরেন চৌধুরী সবিস্ময়ে তাকালো সান্ত্বনার দিকে। গোরু! গোরু কি হবে?

অবনীবাবুই জবাব দিলেন, একটু খাঁটি দুধ না পেয়ে আমার শরীর দিনকে দিন কত খারাপ হয়ে যাচ্ছে দেখছ না?

হাসতে লাগলেন তিনি। নরেন চৌধুরীও। সান্ত্বনা বলল, বেশ যাও, ওই ভুতুবাবুর হোটেল থেকে দু'বেলা মাংস ভাত আনিয়ে খেও এবার থেকে। হেসে ফেলল, মাগো কি নাম, ভুতুবাবু!

হাসিখুশি আমোদপ্রিয় মানুষ নরেন চৌধুরী। পদমর্যাদায় চালচলন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে নি। দেখছে চেয়ে চেয়ে। সেই ফ্রকপরা মেয়েটির সঙ্গে বাইরে মিল নেই বটে, কিন্তু ভিতরে যেন আছে। বলল, না আমাদের ভুতুবাবুর থেকে আপনার পাগলা সর্দার অনেক ভালো, মাছের ক্রাই খাওয়ার পরে সে কথা আমি একবাক্যে বলব। মড়াইয়ের ওদের মধ্যে প্রায়ই আপনাকে

ঘোরাঘুরি করতে দেখি, ওরাই আপনার ফ্রেণ্ড-স্টাফ বুঝি সব ?

তাই। অবনীবাবু সায় দিলেন, তুমি আর ক'জনকে চেনো, ওসকলকে চেনে।

চিনিই তো। সান্ত্বনা জোর দিয়ে বললে, ওদের অত অহঙ্কার নেই ভদ্র-লোকদের মত, ওরা খুব ভালো।

সত্যি কথা। নরেন চৌধুরী সমর্থন করল, আর ওই সর্দারটি ভারি খাঁটি লোক।

পাগল সর্দারের প্রশংসা শুনে সান্ত্বনা খুশি হল। বলল, তার মুখে আপনারও খুব সুখ্যাতি শুনেছিলাম একদিন। প্রথম দিকে মড়াই বাঁধার গণ্ডগোলের সময় কারা সব চড়াও করেছিল ওকে, আপনি নাকি তখন 'ফুটুক' তোলার যন্ত্র দিয়ে ভয় দেখিয়ে তাদের তাড়িয়েছিলেন।

নরেন চৌধুরী হাসতে লাগল।—সে একটা দিন গেছে, বাদল তো শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে চলেই যাবে কিনা ভাবছিল।

বাদল কে ? সান্ত্বনা উৎসুক হল।

অবনীবাবু বললেন, বেশ, এখানকার চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলির নাম শুনিস নি ?

শুনেছে। অনেক শুনেছে। মানুষটির প্রতিও বিশেষ একটা সম্ভ্রম-মেশানো কৌতূহল আছে। এত বড় এক দায়িত্ব যার, এত অজস্র লোক কাজ করছে যার নির্দেশে, কত বড় একজন সে না জানি! তাকে দেখে নি, কিন্তু দেখার আগ্রহ অপরিসীম। তার কাজের গল্প শুনেছে, তার গুরু-গাম্ভীর্যের কথা শুনেছে। বাবাকেও কতদিন হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে দেখেছে চিফ ইঞ্জিনিয়ার ডাকছে শুনে। সেই বাদল গাঙ্গুলিকে কালু-ভুলুর মত শুধু বাদল বললে সান্ত্বনা চট করে ধরবে কি করে ?

অবনীবাবুই বললেন আবার, বাদল গাঙ্গুলি নরেনের খুব বন্ধু জানিস নে বুঝি ? সেই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ওরা একসঙ্গে পড়েছে, একসঙ্গে কাজও করেছে তারপর। উনিই তো চেষ্টাচরিত্র করে নরেনকে নিয়ে এসেছেন এখানে।

ছন্দপতন ঘটল যেন। সান্ত্বনা নরেনের মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক।—ওমা, তাহলে তাঁর বয়স কত ?

মনে মনে সান্ত্বনা যে চোখ দিয়ে কল্পনা করেছিল সেই লোকটিকে, তাতে তার বয়সের হিসেব কোন সংখ্যাতেই হয় না বোধ হয়। দু'জনকেই হেসে উঠতে দেখে লজ্জা পেয়ে গেল। একটু বাদে নরেন বলল, আপনার নিরাশ হবার কারণ নেই, ও লোকটার আসল বয়সের কোনো গাছপাথর নেই।

সঠিক বুঝল না সান্ত্বনা। চেয়ে রইল। অবনীবাবু প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ফেললেন।—এসব কথা থাক এখন, এ ও সারারাত বসে শুনতে পারে। কিন্তু তুমি সেই থেকে ওকে আপনি আপনি বলছ কি, ও কত ছোট—তুই কি রে সান্ত্বনা!

ফ্রক-পরা দেখেছে, আপনি করে বলতে নরেনের কেমন লাগছিল সত্যিই। কিন্তু তুমিও বলে উঠতে পারছিল না চট করে। অবনীবাবুর কথায় এবার সকৌতুকে তাকালো সান্ত্বনার দিকে।

বাবার অনুযোগে বিব্রত হাস্যে সান্ত্বনা জবাব দিল, ডাকলে কি করব—বেশ লাগছিল শুনতে, তুমি দিলে বোধ হয় পণ্ড করে!

জোর হাসিতে ঘর ভরে তুলল নরেন চৌধুরী।—বেশ লাগলে সেটুকু আর পণ্ড করি কেন, আপনি-আজ্ঞে করেই বলব'খন তাহলে!

সান্ত্বনা টেনে টেনে জবাব দিল, নাঃ, এর পর আর কি করে হয়—

যাবার আগে নরেন জিজ্ঞাসা করল, আলু-বেগুনের কাটলেট খেতে আবার কবে আসছি?

ভারী তো, রোজই আসুন না!

রোজ না হোক, মাঝে মাঝেই এর পর পদার্পণ ঘটতে লাগল নরেন চৌধুরীর। আসলে এই আশাতেই তার প্রথম দিন আসা।

প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা একটি মেয়ে মড়াইয়ের বুকে এক দঙ্গল কালো মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, কে না দেখেছে?

শুভ্রশ্রী গিরিকন্যার মতই পাহাড়ের গায়ে গায়ে এক মেয়েকে অবাধে বিচরণ করতে কে না দেখেছে?

পাহাড়ী পথের উঁচু-নিচুতে দিনের মধ্যে ক'বার করে নারীদেহবন্দিনী এক যৌবন-তরঙ্গের ওঠা-নামাই বা কে না দেখেছে?

এই দেখার খবর শুধু সান্ত্বনাই রাখে না। নরেন চৌধুরীও আর সকলের মতই দূরে থেকে তাকে লক্ষ্য করেছে অনেক দিন। ওই রুক্ষ, নীরস পরিবেশে সে দৃশ্য যেন এক মস্ত রিলিফ। অন্যথায় যোগসূত্র পেয়েই ইঞ্জিনিয়ার ড্রাফট্‌সম্যান নরেন চৌধুরী সাধারণ ওভারসিয়ার অবনীবাবুর সঙ্গে এত আগ্রহে পুরানো পরিচয় ঝালিয়ে নিত কিনা বলা যায় না।

ভিন্ন ভিন্ন গাছেরও সবুজ পত্রালীতে একটা মিল চোখে পড়ে। সেটা পাতার নয়, সবুজের। নরেন আর সান্ত্বনার মধ্যেও তেমনি মিল আছে খানিকটা। সেটা বয়সের নয় মনেরও নয়, সজীব তারুণ্যের। সেদিক থেকে দু'জনেই এরা

অনেকটা সমগোত্রীয় ছেলেমানুষ।

পরিবেশও অনুকূল। এই পাহাড়ী রুক্ষতায় আর যাই থাক, সংকীর্ণতা কম।

অবনীবাবু ঠাট্টা করেন, এবারে যত খুশি ড্যামের গল্প শোন্।

সান্ত্বনা মুখে আগ্রহ দেখায় না কিছু। বরং ঠোঁট উল্টে বলে, ভারী তো হচ্ছে, তার আবার গল্প!

নরেন জবাব দেয়, কি হচ্ছে বুঝলে মেয়েরাই ইঞ্জিনিয়ার হত।

সান্ত্বনা বলে, মেয়েরা ইঞ্জিনিয়ার হলে ভুতুবাবুরা রান্নাঘরে ঢুকত।

ছদ্মত্রাসে শিউরে ওঠে নরেন, বাপ রে বাপ!

এই ভোজনরসিকতার ভিতর দিয়েই এমন অল্প সময়ে এত অন্তরঙ্গ একজন হয়েছে সে। কখনো এসে হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়ে এমন, সে মূর্তি দেখে হেসে ফেলে সান্ত্বনা। নরেন চৌধুরী হাত-মুখের ইশারায় জানায়, রসদ কিছু না পড়লে নাড়ী ছেড়ে গেল বলে! কখনো নিজেই আবার হাতে করে নিয়ে আসে কিছু। বিশেষ করে ছুটির দিনে। বলে, এটা করো, ওটা রাঁধো—।

প্রথম প্রথম সান্ত্বনা অনুযোগ করেছে, পরে রাগ দেখিয়েছে।—কিছুই করব না, এসব নিয়ে ভুতুবাবুর কাছে যান, রেঁধে দেবে।

বড় রকমের একটা নিঃশ্বাস ফেলে নরেন চৌধুরী।—ওই একটা লোককে মাঝে মাঝে আমার খুন করতে সাধ যায়।

ভিতরের দাওয়ায় মোড়া পেতে দেয় সান্ত্বনা। নরেন গ্যাঁট হয়ে বসে খাবার তৈরী করা দেখে তার। আর নীরব প্রতীক্ষায় সিগারেট টানে। অবনীবাবুর জন্যে পাঁচবার করে লুকোতে হয় একটা সিগারেট। ইঞ্জিনিয়ার নরেন চৌধুরী লুকাতো না, দেশের ছেলে নরেন লুকোয়। ভদ্রলোক আড়াল হলে সান্ত্বনাকে শুনিয়ে টিপ্পনীও কাটে তাঁর উদ্দেশে। সান্ত্বনা কখনো হাসে, কখনো শাসায়, দাঁড়ান বাবাকে বলছি!

সান্ত্বনার হালকা তর্জন হয়ত অবনীবাবু শুনে ফেলেন। আবার এসে দাঁড়ান তিনি।—কি বলবি?

জবাবে সান্ত্বনা আবারও হেসেই ফেলে। নয়তো বলে, এই ক'টি খাবার আবার তিন ভাগ হবে বলে নরেনবাবু দুঃখ ক'চ্ছিলেন।

অবনীবাবু হেসে বলেন, তা ওকে দে না বেশি করে—।

চলে গেলে নরেন ভুরু কুঁচকে তাকাল সান্ত্বনার দিকে। আমাকে কি ভেবেছ শুনি? আমি রীতিমত উপোস পর্যন্ত করতে পারি জানো?

জানি।

জানো কি রকম? নরেন ঘাবড়ে যায়।

মরুভূমির পেটে জল ঢাললেই কি আর মরুভূমি ঠাণ্ডা হয়! উপোস তো করেই আছেন—।

বৃথাই জুৎসই জবাব হাতড়ে বেড়ায় নরেন।

মানুষটার আর এক অভ্যাস দেখে হেসে কুটি কুটি হয় সান্ত্বনা। হাতীর দাঁতের কান-কাঠি দিয়ে তার কান সুড়সুড়ির আয়াস উপভোগ করা। সারাক্ষণ সঙ্গেই থাকে ওই কান-কাঠি। স্পেশাল অর্ডার দিয়ে করানো নাকি। হাতে যখন সিগারেট নেই তখন ওটা আছে। সন্তর্পণে কানের রন্ধ্রে চালান করে দিয়ে একটু একটু নাড়ে, আর গলা দিয়ে কুড়কুড় শব্দ বার করে একটা—আমেজে চোখ বুজে আসে।

সান্ত্বনা এ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা কম করে নি। শাড়ির আঁচলে কোণ পাকিয়ে সেটা নিজের কানে গুঁজে দিয়ে অনুকরণ করেছে তারই সামনে। গলা দিয়ে ওর মত শব্দ বার করতে গিয়ে হেসে গড়িয়েছে।

নরেন বলে, খুব হাসো, অভ্যোসটা হলে দেখবে কত মজা।

কি মজা?

একটুখানি কানের তদ্‌বির করেই দুনিয়াটাকে দার্শনিক চোখে দেখার মজা।

দার্শনিক চোখে মানে?

দর্শন বোঝ?

দু চোখ টান করে সান্ত্বনা তাকায় তার দিকে।—এই আপনাকে দর্শন করছি।

দর্শনতত্ত্ব আর বোঝানো হয় না নরেন চৌধুরীর। অজ্ঞাতে নিজেও সে স্থূল দর্শনেরই পাঠ নেয়।

কিন্তু ড্যামের কর্মপরিবেশে এই মেয়েরই আবার আর এক ধরনের অবিচ্ছিন্ন শ্রদ্ধা এবং কৌতূহল দেখে নরেন চৌধুরী বিস্মিত হয়েছে। গঠন-যান্ত্রিকতার প্রতি কোন মেয়েরই এরকম আগ্রহ থাকার কথা নয়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে। বুদ্ধির অগম্য কিছু দেখলে না জেনে নেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই। এই ঘনিষ্ঠতার পরে সান্ত্বনা শুধু সাঁওতালদের এলাকাতে নয়, সর্বত্রই ঘুরে বেড়ায়। হাঁ করে চেয়ে চেয়ে অতিকায় বুলডোজারের মাটি সরানো দেখে, ড্রেজার দিয়ে মাটি ঠেলে ঠেলে লেভেল করার প্রক্রিয়াও নীরস নয় তার চোখে। নিরাপদ ব্যবধানে দাঁড়িয়ে দুরু দুরু বক্ষে হয়েস্ট দিয়ে তিন-চারতলা সমান উঁচুতে অতিকায় এক একটা পাথর তোলা দেখে। ওই দড়ির মত বস্তুটা ছিঁড়ে

গেলে কি মারাত্মক ব্যাপার হতে পারে ভেবে কণ্টকিত হয় মনে মনে। নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে তার পর, যাক ছেঁড়ে নি।

কিন্তু আবার নেমে আসছে ওটা, আবার একটা তুলবে। প্রত্যেক বারই রীতিমত ভয় হয় তার। চার্নিং মেসিনে করে জল দিয়ে সিমেণ্ট বালি আর পাথরকুচি মেশানোর ব্যাপারটাও যেন এক সকৌতুক পর্যবেক্ষণের বস্তু। আরও অবাক লাগে, আথবোরার দিয়ে মাটি ফোঁড়া দেখে। নদীবক্ষেরও আশি নব্বুই একশ ফুট পর্যন্ত খুঁড়ে পাথরের স্তর বার করতে হবে। সেই স্তরের ওপর দাঁড়াবে পাকা পাথরের দেয়াল। নরেনের মুখে সেই দেয়ালের ফিরিস্তি শুনে সান্ত্বনার বিস্ময়ের শেষ নেই। নদীর নিচে থাকবে একশ ফুট, ওপরেও প্রায় তাই —চওড়া হবে পঞ্চাশ-ষাট ফুটের মত। ওপরের দিকে সেই দেয়ালের ভিতর দিয়ে চলাচলের পথ থাকবে এপার ওপার—যন্ত্রপাতি থাকবে অজস্র, এক একটা সুইচ টিপলে এক একটা লক্ গেট উঠবে, নামবে—।

লক্ গেট কী ?

আগাগোড়া নিটোল দেয়াল দিয়ে জল আটকে বসে থাকলে আর জল পাবে কেমন করে লোকে! গেট থাকবে পনেরো-বিশটা। গেট খুলে দিলে জলে জলময় হয়ে যাবে অন্য দিক, আবার গেট ফেলে দিলেই সব বন্ধ।

সান্ত্বনার যেন বিশ্বাস হয় না। দেয়ালের এদিকে অবরুদ্ধ হয়ে জল উঠবে পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর ফুট উঁচুতে। তারপর এক একটা গেট খুলে দিলে রুদ্ধ জল আছড়ে পড়বে অন্য দিকের শুকনো অতলে—তার মুখে পড়লে একসঙ্গে হাজার হাতীর হাড়গোড়ও নাকি গুঁড়িয়ে যাবে পলকা খেলনার মতই। নালা কেটে কেটে সেই জল নিয়ে যাও যেখানে খুশি, যেখানে দরকার। তাই শুধু নয়, ওই শুকনো দিকেরই একধারে আবার বিদ্যুৎ তৈরীর ব্যবস্থাও হবে নাকি। জল থেকে বিদ্যুৎ হয় এরকম কথা অবশ্য শোনা ছিল সান্ত্বনার। কিন্তু শোনা কথায় আর চোখে দেখা রোমাঞ্চে রাত-দিনের পার্থক্য।

সান্ত্বনা ভাবতে পারে না সবটা। এ যেন এক আজব কারীগরির রূপকথা। স্বপ্ন-সম্ভবের মহড়া। ওরা কাজ করে, সান্ত্বনার মনে হয় বিশ্বকর্মার দূত বুঝি ওরা।

সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের কথাও মনে হয়। এই গঠন সমারোহের সর্ব-প্রধান যে। এই গঠন অভিযানের নায়ক যে মানুষ। চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি। দূর থেকে মাত্র একটিবার তাকে দেখার লোভ যে কত, সে শুধু সান্ত্বনাই জানে। হিরো ওয়ারশিপের যুগ নয় এটা। কিন্তু বড় দুনিয়ায়ও বড়র অর্ঘ্য আছেই। সান্ত্বনার ছোট পরিসরে এত বড় আর কে? কলের মানুষ;

কলের মতই অবিশ্রান্ত কাজ করে নাকি। পরিচিত জনেরা বলে। তার বাবা, নরেনবাবু, এমন কি পাগল সর্দারও প্রায় ওই কথাই বলে। তাদের চোখে দেখা কাছে দেখা মানুষ। সাদা কথা সাদা অর্থেই বলে তারা। কিন্তু শুনে সান্ত্বনার সম্ভ্রম বাড়ে আরো। নৈষ্ঠিক দূরত্ব বাড়ে।

এই ড্যামের কাহিনী শুরু থেকে শুনতে বসলে, বিশেষ করে পাগল সর্দারের মত একজনের মুখ থেকে শুনতে বসলে শুনবে যা, এক কথায় তাকে অ্যাডভেঞ্চার বলা যায়। সান্ত্বনা তাই শুনেছে। বিশ্বাস করেছে। রোমাঞ্চিত হয়েছে। পাগল সর্দারের অ্যাডভেঞ্চারে অত্যুক্তি খুব না থাকুক, আবহাওয়া সৃজনের মালমসলা কিছু থাকাই স্বাভাবিক। দিদিয়ার বিস্ময়বিহ্বল দুই বড় বড় চোখের দিকে চেয়ে তার বলার ঝোঁকে সেই অ্যাডভেঞ্চারের নায়ক বাদল গাঙ্গুলি মড়াই কোন ছার, সাত সাগরের পায়েও শেকল পরাতে পারত।

কিন্তু সদ্য বর্তমানে নিজের অগোচরে এই পাগল সর্দারের মনেই একটুখানি খেদ আছে বোঝা যায়। এখন রাস্তা হয়েছে, কোয়ার্টার হয়েছে, আপিসঘর হয়েছে, জিপ ট্রাক এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবধানও এসেছে খানিকটা। বর্তমানের এই আপিসি-আবহাওয়াটাই সর্দারের পছন্দ নয়। পাহাড়ে-পাথরে, জলে-জঙ্গলে বিঘ্ন উত্তরণের একাত্মতায় মড়াইয়ের নায়ক ছিল তাদেরই একজন। কিন্তু সে অ্যাডভেঞ্চারের নায়ক আজ আপিসের বড় সাহেব। বড় সাহেব কথাটার তাৎপর্য একটু একটু যেন বুঝতে শিখেছে। তার সাক্ষাৎও বড় একটা পায় না আজকাল। হুকুম আসে কাগজে কলমে পাঁচ হাত ঘুরে। নীরস একটা ছকের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে বলেই পাগল সর্দারের কাছেও কলের মানুষের মতই হয়ে উঠেছে বাদল গাঙ্গুলি। সান্ত্বনা ভাবে, কলের মত কাজ না করলে যন্ত্রযুগের সৃষ্টির অ্যাডভেঞ্চার যে অচল হয়, সে আর ও বুঝবে কি করে?

কিন্তু নরেনের কথা শুনে সান্ত্বনা তটস্থ। তার আগ্রহ দেখে ভাতের সঙ্গে ডাল মাখার মত করেই বলল, বেশ তো চলো না, বাদলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি আজই—এখন বোধ হয় কোয়ার্টারেই পাওয়া যাবে তাকে।

আলাপ করিয়ে দেবেন! আমার সঙ্গে?

বিস্ময় দেখেই নরেনও অবাক হয় একটু। হেসে বলে, কেন, সে বাঘ না ভালুক!

বাঘ ভালুক নয়, তবু শুনেই আড়ষ্ট প্রায়। সামনে গিয়ে দু পায়ের ওপর ভর করে সান্ত্বনা দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ। হ্যাঃ, আমি যাব তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে, আপনি যেন কি!

এ রকম অনেক সময় অনেক কথা হয়েছে আরো। সান্ত্বনা ছেলেমানুষের মতই জিজ্ঞাসা করেছে, আচ্ছা আপনিও তো তাঁর সঙ্গে একত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছেন, আপনি তাঁর মত হলেন না কেন?

নরেন হালকা জবাব দেয়, সবাই তো স্কুল-কলেজে পড়ে, সবাই প্রাইম-মিনিস্টার হয় না কেন?

বুঝতে চেষ্টা করে সান্ত্বনা বলে, ভিতরে খুব বড় একটা কিছু থাকা দরকার, না—?

ছদ্মগাম্ভীর্যে নরেন চৌধুরী জবাব দেয়, হ্যাঁ, হিমালয়েব মত বড় কিছু।

যান্, আপনার কেবল ঠাট্টা!

এবারে কিছুটা আন্তরিক ভাবেই বলে নরেন চৌধুরী।—পাস করার পরেও ও হাতে কলমে কত কাজ করেছে, তা ছাড়া বিলেতে গেছে জার্মানীতে গেছে।

আপনিও গেলেন না কেন?

গেলে কি হত?

বেশ হত।

কি বেশ হত, আর না গিয়েই বা কতটুকু হয়েছে, সে সম্বন্ধে সান্ত্বনার সুস্পষ্ট ধারণা নেই কিছু। প্রথম আলাপের সময় বাবার মুখে তার বড় চাকরির কথা শুনেছিল, এ ক'দিনের ঘনিষ্ঠতায় তার গুরুত্ব গেছে। বড় মানে আর কত বড়! তাই সত্যিই ও ভাবছিল, বেশ হত নরেন চৌধুরীও তেমন বড়র মতই বড় একজন হলে। আর বেশ হত, তখনও তার সঙ্গে যদি সহজ আলাপ পরিচয় থাকত এরকম।

এই সাদাসিধে মনোভাব জ্ঞাপনের ফলে নরেন চৌধুরীর একটু ক্ষুণ্ণ হওয়ার কথা। কিন্তু স্পষ্ট সহজতার একটা দিকও আছে। যা মনকে বিরূপ করে না, বরং টানে। হেসেই জবাব দিল, দুর্ভাগ্য আমার। কিন্তু এখন দেখছি, বাদল গাঙ্গুলির সঙ্গে তোমার আলাপ করতে না যাওয়াই ভালো।

কেন? না যাক, সান্ত্বনার আগ্রহ কম নয়।

তারও মাত্র দুটো হাত, দুটো পা, একটা মাথা, দুটো চোখ—

প্রায় আপনার মতই? নিরীহ অভিব্যক্তি।

ভুরু কুঁচকে ফেলে নরেন চৌধুরী। প্রায় মানে? আমার কি ওগুলো ঠিক ঠিক নেই নাকি?

জব্দ করতে পেরেই সান্ত্বনা খুশি।

ছদ্ম কোপে নরেন মাটির কাছে হাত এনে বলল, তোমাকে এতটুকু ফ্রকপরা

দেখেছি জানো ?

প্রচ্ছন্ন কৌতুকে সান্ত্বনা কয়েক মুহূর্ত দেখল তাকে। পরে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, সেই আপনিও হাফপ্যান্ট পরতেন যখন ?

মৃদু মৃদু হাসতে থাকে নরেন। হাফপ্যান্ট তো এখনো পরি।

আপনার হাফপ্যান্টের বয়স তাহলে পেরোয় নি এখনো ! আমার ফ্রকপরার বয়স অনেককাল গেছে।

আবার জব্দ। খুশিভরা চোখে চেয়েই থাকে নরেন চৌধুরী। পরে বলে, জিভের ডগায় যে সরস্বতী ঠাকরোন বসেই আছেন দেখি। লেখাপড়া শিখলে খুব ভালো করতে তুমি।

সান্ত্বনা যথার্থ লজ্জা পেয়ে যায় এবার। লেখাপড়ার প্রসঙ্গ উঠলে মাসির বাড়িতেও রান্নাঘরে পালিয়ে বাঁচত। এ ব্যাপারে তার যত লজ্জা তত সঙ্কোচ। অবনীবাবুর সামনে নরেন আর একদিনও কি কথায় ওর লেখাপড়ার প্রসঙ্গ তুলেছিল। সান্ত্বনা তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করেছে সেখান থেকেও। কিন্তু বাবা ওদিকে উৎফুল্ল মুখে তার ছেলেবেলার পড়াশুনার গল্প ফেঁদে বসেছেন তাও কানে এসেছে। এক এক সময়ে হিড় হিড় করে টেনে এনে পিঠে গুমগুম কিল বসিয়ে ওর মা পড়তে বসাতেন ওকে। কিন্তু তিনি আড়াল হলেই চুপি চুপি ও উঠে আসত বাবার কাছে। মুখখানা যতটা সম্ভব করুণ করে বাবার একখানা হাত তুলে নিজের কপালে ঠেকাত। অর্থাৎ দেখো তো গা-টা গরম লাগছে কি না। নয়ত জিভ বার করে দেখাত বাবাকে—কোন রোগের উপসর্গ যদি বার করা যায়। রোগ ঠিক না হোক, রোগ-সম্ভাবনার উপসর্গ অবনীবাবুও অবধারিত দেখতে পেতেন। পড়াশুনার অনুশাসন তার পরেও আর শিথিল না করে উপায় কি ! কিন্তু সান্ত্বনাই বিপদ বাধাতো আবার সব ভুলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দু চোখ লাল না হওয়া পর্যন্ত পুকুরে ডুবে উঠে। মায়ের খপ্পরে পড়তে হত আবারও। বহ্নি-উদ্‌গিরণ থেকে তখন রেহাই পেতেন না অবনীবাবুও।

আড়াল থেকে শুনতে শুনতে সান্ত্বনা লাল হয়ে ওঠে এক একবার। আবার রাগও হয় বাবার ওপর। খুব গল্প করা হচ্ছে এখন ! তখন অমন আদর না দিলে আজ এরকম হত !

পরে খেতে বসে নরেন বলে, পড়াশুনার নিকুচি করেছে, রান্নার বিদ্যেয় তোমাকে ডক্টরেট দেওয়া উচিত।

প্রায় রাগ করেই সান্ত্বনা জবাব দেয়, আর খাওয়ার বিদ্যেয় আপনাকে মহামহোপাধ্যায় দেওয়া উচিত।

মেঘের ফাটলে রোদের ঝলকের মত রাগের মুখেই হাসি ছলকে ওঠে আবার।

—চার—

হোটেলের মালিক ভুতুবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল সান্ত্বনার।

আলাপের পরামর্শ দিয়েছিল পাগল সর্দার। দিদিয়ার অনুরোধ মত একটা দুধলো গোরু সংগ্রহ করতে না পেরে একেবারে অকর্মণ্য মনে হচ্ছিল নিজেকে। বেচারীর সময় কম, খোঁজ করে কখন। মড়াইয়ের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর রাতে হাড়িয়া টেনে সুপ্তির কোলে ঢলে পড়ে। শুধু ও নয়। দলকে দল। মেয়ে পুরুষ সকলে। আর মড়াইয়ে যারা কাজ করে না, অর্থাৎ যাদের সময় আছে, গায়-গতরে প্রায় স্থবির তারা। তবু এদের অনেককেই বলে রেখেছে সর্দার। সপ্তাহের ছুটির দিনে নিজেই যতটা সম্ভব খোঁজখবর করে। কিন্তু পছন্দমত পেয়ে ওঠে না। নিজের মেয়ে চাঁদমণিকেও বলেছিল। পাঁচ জায়গায় ঘোরে, পাঁচ ঘরের খবর রাখে। যদি কোন সন্ধান দিতে পারে। কিন্তু হতচ্ছাড়ি মেয়ে এমন জবাব দিয়েছিল যে হাতের কাছে পেলে আচ্ছা করে দু ঘা কসিয়ে দিত। গম্ভীর মুখে বলেছে, গোরুটোরুর খবর সে রাখে না, তবে তার সন্ধানে একটি বলদ আছে বটে, হলে সেটাই দিদিয়াকে দিয়ে দিতে পারে। আঙুল দিয়ে ঘরের তৃতীয় ব্যক্তিটিকে দেখিয়ে দিয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়েছে।

তৃতীয় লোকটি হোপুন।

এদিকে দেখা হলেই সান্ত্বনা জিজ্ঞাসা করে, আমার গোরু কি হল সর্দার?

সর্দার মুখে আশ্বাস দেয় বটে, গোরুর মত গোরু পেলেই এনে দেবে। কিন্তু মনে মনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে।

পরে এক ছুটির দিনের সকালে উঠেই হঠাৎ গোরুর কথা আর ভুতুবাবুর কথা একসঙ্গেই মনে হল তার। এতদিন মনে হয় নি বলে নিজের ওপরই বিরক্ত হল সে। সময় নষ্ট না করে সোজা চলে এলো দিদিয়ার কাছে।

ভুতুবাবু গোরু যোগাড় করে দেবে! সান্ত্বনা অবাক।

তু টুকচি চল না কেনে আমার সঙতে, উ ঠিক দেবে। পাগল সর্দার নিঃসংশয় প্রায়।

সান্ত্বনা মুশকিলে পড়ল একটু। সকালের দিকটায় রান্নাবান্নার কাজ থাকে।

ছুটির দিন নরেনের এখানে খাওয়া বরাদ্দ বলে একটু বেশিই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু তারই জন্য এত আগ্রহ নিয়ে লোকটি এসেছে, ফেরাতে মন সরল না। ওদিকে এই রোদে নিচে নামবে শুনলেও বাবার কাছেও বকুনি খেয়ে মরতে হবে। কিন্তু কি আর করা যাবে। চুপি চুপি রান্নাঘর বন্ধ করে চলে এলো সে। বাবা আপিসের কাগজপত্র নিয়ে বসেছেন, টের না-ও পেতে পারেন।

শীগগির পা চালিয়ে চলো, চট করে ঘুরে আসতে হবে।

কিন্তু ভুতুবাবুর আপ্যায়ন এড়িয়ে চট করে ঘুরে আসাটা অত সহজ নয় জানত না।

কালো বেটেখাটো গোলাকৃতি মানুষ। হাত-পা চোখ-মুখ সবেতেই ফোলা ফোলা গোলাকার ভাব। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স, হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা, গায়ে বগলছেঁড়া আধময়লা নেটের গেঞ্জি।

সর্দারের সঙ্গে সান্ত্বনাকে দেখেই হাঁটুর কাপড় যতটা সম্ভব টেনে নামিয়ে ভুতুবাবু ব্যস্তসমস্ত ভাবে উঠে দাঁড়াল। আনত অভিবাদন জ্ঞাপন করল দু হাত জুড়ে।—আসুন, আসুন, কি সৌভাগ্য, বসুন। ত্রস্তে ময়লা ঝাড়ন এনে একটা বেঞ্চি ভালো করে ঝেড়েমুছে দিল। বসুন, এইখেনটায় বসুন।

তার ব্যস্ততায় আরও বেশি ব্যস্ত হয়ে সান্ত্বনা বসে বাঁচল।

প্রবেশ পথের ধুলো-বালির ওপরেই সর্দার বসে পড়ল। দেয়াল-সংলগ্ন হুঁকোর মুখ থেকে কলকেটা তুলে নিয়ে ভুতুবাবু তার হাতে দিল। নাও তামাক খাও।

হৃষ্টচিত্তে সর্দার দু হাতে কল্কে বাগিয়ে ধরে মুখে ঠেকালো। ভুতুবাবু সবিনয়ে এবং সহাস্যে সান্ত্বনার সামনে এসে দাঁড়াল—আপনি এলেন, পরম সৌভাগ্য আমার—আপনি তো আমাদের ওভারসিয়ারবাবুর মেয়ে—চিনি চিনি, সক্কলকে চিনি আমি এখানকার। আর আপনাকে তো সবাই চেনে, এই ড্যামের যত্রতত্র আপনার মত অত আর কে ঘোরে—বড় ভালো লাগে দেখতে।

লজ্জায় আর গরমে সান্ত্বনা রাঙিয়ে উঠেছে প্রায়। তামাকের কল্কেয় পাগল সর্দারের নিবিষ্টতা দেখে মনে হল, কি জন্যে এসেছে তাই বোধ হয় ভুলে গেছে ও। হেসে বলল, আপনার কাছে কিন্তু একটা কাজের জন্য এসেছি আমি। সর্দার বলল, আপনি ছাড়া আর কেউ যোগাড় করে দিতে পারবে না।

অমায়িক হাসিতে ভুতুবাবুর গোল মুখ ভরে উঠল প্রায়—ওরা আমাকে জানে যে। দরকার হলে এই রাত্তে এই ভুতুই বাঘের দুধও যোগাড় করে দিতে পারে। আপনি সেজন্যে কিচ্ছু ভাববেন না, আগে একটু চা হোক।

না, না, এখন আর চা নয়।

হাত জোড় করে ফেলল ভুতুবাবু। মা-লক্ষ্মী শুধুমুখে ফিরে গেলে ভুতুর দোকানে ঘুঘু চরবে—এই শীগগির চা দে না এখানে—সর্দারকেও একটু দিস্। কর্মচারীকে আদেশ দিয়ে ভুতুবাবু একটা টুল টেনে নিয়ে বসল।

নিরুপায়। সান্ত্বনা ভুতুবাবুর হোটেল আর দোকান পর্যবেক্ষণে মন দিল। দুটো ছাপরা ঘর। মাঝে দরজা। যেখানে তারা বসেছে সেটাকে হোটেল এবং রেস্তোরাঁ বলা চলে। তিন-চারটে তেলচিটে বেঞ্চি পাতা। সামনে ততোধিক মলিন একটা কাচের আলমারিতে কিছু খাবার সাজানো। কোণের দিকে মস্ত একটা মাটির উনুনে বড় এক হাঁড়ি ভাত চড়ানো হয়েছে। ওদিকের ঘরটায় মণিহারী এবং মশলাপাতির দোকান। দেয়ালের দিকে একটা খাটিয়ার ওপর বিছানা গোটানো। একজন ছোকরা চাকর বিবর্ণ দুটো ছোট কাচের গ্লাসে কেটলি থেকে চা ঢালার ব্যবস্থা করছে। ওই গ্লাসে চা খেতে হবে ভেবেই সান্ত্বনার অবস্থা কাহিল। আমতা আমতা করে বলেই ফেলল, গেলাস দুটো একটু গরম জলে ধুয়ে নিলে হ'ত—

বিলক্ষণ, বিলক্ষণ! টুল ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠল ভুতুবাবু। ওরে এই ব্যাটা মুখখু—গরম জলে গেলাস না ধুয়েই তুই চা ঢালছিস? শীগগির ধুয়ে দে ভালো করে। আচ্ছা, দাঁড়া—

তাড়াতাড়ি এক টুকরো সাবান এনে নিজেই গ্লাস দুটো ধুয়ে রঙ ফেরালো, পরে গরম জলে আর একপ্রস্থ ধুয়ে বলল, নে এইবার ঢাল চা—একটু জ্ঞানগম্যি যদি থাকত, যেন ওর মতই কেউ খাবে।

সঙ্কোচ সত্ত্বেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সান্ত্বনা। চায়ের গ্লাস এলো। আর একটা গেল পাগল সদারের হাতে। কল্কে যথাস্থানে রেখে দিয়ে সাগ্রহেই চায়ের প্রতীক্ষা করছিল সে।

ভুতুবাবু টুলে ফিরে এসে সবিনয়ে বলল, একটু মিষ্টি বা নোনতা কিছু দিই?

সান্ত্বনা ব্যস্ত হয়ে বাধা দিল, না না, এখন আর কিচ্ছু না—

গ্লাস ধোয়ার ব্যাপার থেকেই ভুতুবাবু বুঝে নিয়েছে আর কিছু চলবে না।

তাই জোর করল না। ওই চাকরটার ওপরেই ক্রুদ্ধ হল মনে মনে। দিলে ব্যাটা দোকানের প্রেস্টিজটাই নষ্ট করে। অথচ এরই মধ্যে মনে কত কথাই না ভেবে ফেলেছে ভুতুবাবু। 'জেন্টলম্যান' তার দোকানে অনেক আসে। কিন্তু 'লেডি'র পদার্পণ এই প্রথম। দেখাদেখি যদি কিছু কিছু মহিলার সমাগম হয় এমনি করে, তাহলে পর্দার আড়ালে টেবিল আর বেঞ্চি ফেলে একটা ক্যাবিনের

মত করা যায় কি না ভাবছিল। কানের টানে মাথা আসে। মা-লক্ষ্মীদের টানে রেস্তোরাঁ জমে উঠতে কতক্ষণ।

বেশ চা! ভুতুবাবুকে খুশি করার জন্যেই বলল সান্ত্বনা।

খুশিই হল। লজ্জাবিনম্র হাসি।—একটুখানি ভালো জিনিস সংগ্রহ করার জন্য খেটে খেটে হয়রান হতে হয় আমাকে। আমার পরিবার তো সারাক্ষণই বলে তোমাকে দিয়ে ব্যবসা হবে না, তুমি আশ্রম খোলো। আমি বলি এ-ও তো আশ্রমই, নেহাত দুটো পয়সা নিতে হয় বলেই নেয়া।

হাসি চেপে সান্ত্বনা জিজ্ঞাসা করল, কাছেই আপনার বাড়ি বুঝি?

বাড়ি এখান থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে। সপ্তাহে কি পনের দিন অন্তর হট করে এক আধ দিন ঘুরে আসি। আসলে এই আমার ঘর-বাড়ি হয়ে গেছে—এক পা নড়ার উপায় আছে? দেখলেন তো, একটু কথা বলছি আপনার সঙ্গে, অমনি গরম জলে গেলাস না ধুয়েই চা ঢালতে বসে গেল হাঁদারাম।

গ্লাস ধোয়ার ব্যাপারে লোকটি বেশ আহত হয়েছে বুঝে সান্ত্বনা অপ্রস্তুত হল একটু। পাগল সর্দার ওদিকে তার কোন্ চেনা লোকের সঙ্গে গল্প শুরু করেছে। ডেকে বলল, আমরা কি জন্য এসেছি এখনো বললে না তো সর্দার?

ভুতুবাবু বাধা দিলে, আপনি কিচ্ছু ব্যস্ত হবেন না, যে জন্যেই আসুন, এসেছেন যখন পেয়েই গেছেন। এই ভুতুর কাছে কেউ কখনো না শোনে নি। চা-টুকু খেয়ে নিন আগে—আর একটু চা দিক?

বাকি চা-টুকু তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করে গ্লাসটা সরিয়ে রাখল সান্ত্বনা। না, আর না। আতিথেয়তা-প্রসঙ্গ এড়াইবার জন্যই জিজ্ঞাসা করল, আপনি এখানে গোডা থেকেই আছেন বুঝি?

জাঁকিয়ে বসল ভুতুবাবু। ছুটির দিনে দোকানের খুচরো খদ্দের থাকেই না প্রায়। ঢালা অবকাশ। জবাব দিল, এক্কেবারে গোড়া থেকে। হিল্ ব্লাস্টিং-এর পর নগদ পাঁচশ টাকায় এ জায়গা নিতে সকলে হেসেছে। বলেছে, শুকনো পাথর ধুয়ে জল খেতে হবে—এখানে নাকি আবার ব্যবসা হয়! উৎফুল্ল নিঃশ্বাস ছাড়ল একটা। ভুতুর হোটেল না থাকলে কি যে হত এখন সকলেই বুঝছে সেটা।

অর্থাৎ এই হোটেল বিহনে এখানে ড্যামের পরিকল্পনাটাই ব্যর্থ হত বললেও অত্যুক্তি হবে না। এর ওপর সান্ত্বনা উসকে দিল আরো।—নরেনবাবুর মুখে আপনার কথা অনেক শুনেছি, তাঁর দু বেলার খাবারও তো আপনার এখান থেকেই যাচ্ছে?

খুশিতে ভুতুবাবুর গোলাকার দেহ দুলে উঠল যেন। আমাদের ড্রাফট্সম্যান

নরেন চৌধুরী সাহেব ? বলেছেন বুঝি ?—অতি মহাশয় ব্যক্তি, খুব স্নেহ করেন আমাকে।

পাছে হেসে ফেলে, সেই ভয়ে মুখ বুজে থাকে সান্ত্বনা।

ভুতুবাবু বলে গেলেন, শুধু খাওয়া ! প্রথম দিকে এই ড্যাম দেখতে এসে বিপাকে পড়ে কত গণ্যমান্য লোক রাত কাটিয়েছে এই হোটেল-ঘরে ঠিক নেই। দোকানপাট গুটিয়ে রাত্রিতে তাদের শোয়ার জায়গা করে দিতে হয়েছে এই ভুতুকেই। বলতে তো পারি নে, না জেনেশুনে এসেছ যখন রাতভোর থাকো ওই আকাশের নিচে পাথরের ওপর বসে !

নিজের বদান্যতায় নিজেই গলে গলে পড়তে লাগল ভুতুবাবু। বেশ লাগছে সান্ত্বনার। কিন্তু আর বসা চলে না। বাড়ির কথা মনে হতেই এবারে বেঞ্চি ছেড়ে দাঁড়াল।—অনেক দেরি হয়ে গেল, সর্দার আমি চললাম কিন্তু—

তাড়া খেয়ে সর্দার গাত্রোত্থান করল। কাছে এসে সান্ত্বনাকেই জিজ্ঞাসা করল, ভুতুবাবু 'ডাংরা' মিলায়ে দিবে তো ?

তার ধারণা আগমনের উদ্দেশ্য সান্ত্বনা এতক্ষণে নিশ্চয় ব্যক্ত করেছে। কিন্তু ভুতুবাবুর সুগোল দুই চোখ সেই অবলা জীবটির মতই হয়ে উঠল প্রায়। ফ্যাল ফ্যাল করে খানিক চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল, ডাংরা—মানে আপনার কি গোরু চাই নাকি ?

সান্ত্বনা মাথা নাড়ল, তাই বটে।

সর্দার জোর দিয়ে বলল, দিদিয়াব 'বেঁজায়' দরকাব, তু একটো 'বেশ ডাংরা' লিয়ে আয়, দিদিয়া কিনে লিবে। আমি দিদিয়াকে বুলেছি ভুতুবাবু ঠিক মিলায়ে দিবে।

ভাবনায় পড়ল ভুতুবাবু। এখানে হোটেল ফেঁদে বসার পর থেকে গোপনে এবং প্রকাশ্যে অনেককে অনেক কিছুই সংগ্রহ করে দিতে হয়েছে তাকে। হচ্ছেও। কিন্তু তা বলে গোরু ! বোকার মত জিজ্ঞাসা করল, গোরু কি হবে ?

বাবার জন্যে সব সময় ঠিকমত দুধ পাই নে, তাই ভাবছিলাম বাড়িতে একটা গোরু রাখতে পারলে সুবিধে হত।

ভাবতে লাগল ভুতুবাবু। একটু আগে নিজের মুখে যে বড়াই করেছে তাতে আর পারব না বলা সাজে না। তার থেকেও বড় কথা, যে এসেছে তাকে নিরাশ করতে মন সরে না। তাছাড়া পারলে দু পয়সা লাভের দিকটাও ফেলনা নয়। কিই বা এমন শক্ত কাজ, গোরু কি রাজ্যে নেই নাকি ? বলল, আচ্ছা দেখি, এখানে তো আর পাওয়া যাবে না, সেই শহর থেকে আনতে হবে—কিন্তু

খরচ তো একটু বেশি পড়ে যাবে।

সান্ত্বনা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, খুব বেশি ?

গেরস্থ বাড়ি থেকে পেয়ে গেলে তত বেশি পড়বে না—আচ্ছা সে যা হয় হবে, খোঁজ পেলে আপনার বাবার সঙ্গে না হয় কথা বলব'খন।

ব্যস্ত হয়ে বাধা দিল সান্ত্বনা, বাবার সঙ্গে কথা বলতে হবে না, পেলে আমাকে জানাবেন, সর্দারকে দিয়ে খবর দিলেই হবে। আচ্ছা, আমি যাই আজ, কেমন ?

চড়াইয়ের পথে যতক্ষণ দেখা গেল তাকে, ভুতুবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। দিনগত পারম্পর্যের মধ্যে আজকের বৈচিত্র্যটুকু নিঃশব্দে রোমন্থন করতে লাগল।

পাগল সর্দার তার নিজের কাজে চলে গেছে। পাহাড়ী রাস্তা ধরে সান্ত্বনা একাই উঠে আসছে হন্ হন্ করে। এত দেরি হয়ে যাবে কে জানত! সর্দারের ওপরেই তার রাগ হচ্ছে এখন। একটু যদি সময়ের জ্ঞান থাকত। নরেনবাবু এতক্ষণে এসে গেছে নিশ্চয়ই। বাবার বকুনির হাত থেকেও রেহাই নেই আজ।

চড়াইয়ের পথে তাড়াহুড়ো করে উঠতে গেলে হাঁফ ধরে যাবেই। তার ওপর কড়া রোদ। সান্ত্বনার সমস্ত মুখ তেতে উঠেছে।

পিছনে গাড়ির শব্দে ফিরে তাকালো সান্ত্বনা। জিপ আসছে একটা। পথ ছেড়ে এক পাশ ধরে চলতে লাগল। জিপ পাশ কাটিয়ে গেল। চালক এবং তার পাশে আর একজন কে।—ইস্, ওকে যদি তুলে নিত···এখনো কতটা পথ—।

বিশ-পঁচিশ হাত এগিয়ে গিয়ে ঘ্যাচ করে থেমে গেল জিপটা। চালকের আসনের লোকটি ঝুঁকে পিছন দিকে তাকালো। নীল সানগ্লাসে চোখ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার দিকেই চেয়ে আছে বোঝা যায়।

সান্ত্বনা ভড়কে গেল। কি সর্বনাশ! ওর মনের কথা শুনেছে নাকি! কাছাকাছি হতে লোকটি জিজ্ঞাসা করল, আপনি ওপরে যাচ্ছেন তো ?

সান্ত্বনার পা থেমে গেল। হাঁ না কিছুই বলল না।

প্রশ্ন অবান্তর। কারণ এ রাস্তা ধরে ওপরে ছাড়া আর কোথায় যাবে—আসুন, আমরাও যাচ্ছি, রোদ্দুরে আর হেঁটে কষ্ট করবেন কেন ?

তার পাশের লোকটি আসন ছেড়ে টপকে পিছনে গিয়ে বসল। জিপগাড়িতে মেয়েদের পক্ষে পিছনে গিয়ে বসার থেকে সামনে বসা সহজ বলেই বোধ হয়।

সান্ত্বনা বিব্রত মুখে দাঁড়িয়ে রইল তবু। বলতে চাইছে, আপনারা যান, আমি হেঁটেই যাব: কিন্তু বলা হল না। লোকটি আবার ডাকল, আসুন, আমরা তো যাচ্ছিই ওপরে।

দ্বিধা কাটিয়ে উঠেই বসল সান্ত্বনা। মরুক গে, পাহাড়ের মাথায় উঠে তো

নেমেই পড়বে। আলাপ না আছে না-ই আছে।

পাহাড়ী রাস্তায় এঁকেবেঁকে জিপ চলল আবার। বাঁকের মাথায় ভদ্রলোককে এক একবার ঝুঁকতে হচ্ছে তার দিকে। কিন্তু নীল চশমায় চোখের দৃষ্টি ঠাওর করা যাচ্ছে না। সান্ত্বনা আড়চোখে বার-কতক দেখে নিল তাকে। পিছনের লোকটির দিকেও তাকালো একবার। না, কখনো দেখেছে বলে মনে হল না।

কিন্তু মনে হতে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল সান্ত্বনা। চীফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি নয় তো! সেও তো জিপে ঘুরে বেড়ায় শুনেছে। সান্ত্বনা ঘেমে উঠল একেবারে। ঘাড় না ফিরিয়ে যতটুকু দেখা যায় দেখল আবার। চকচকে চেহারা, ঝকঝকে বেশবাস, হাতে সোনার ঘড়ি, সোনার ব্যাণ্ড, দু হাতের আঙুলে একটা করে হীরের আঙটি। নীল চশমা সত্ত্বেও এবার চোখাচোখি হয়ে গেল। সান্ত্বনা কাঠ হয়ে বসে রইল অন্য দিক ঘেঁষে। আর দু-তিনটি বাঁক পেরুলেই মেন কোয়ার্টারস্। নামতে পারলে বাঁচে এখন।

কিন্তু জিপ মেন্ কোয়ার্টারস্ ছাড়িয়ে যেতেই সান্ত্বনা অস্ফুটস্বরে বলল, আমি এখানে নেমে যাই।

নীল চশমা ফিরে তাকালো আবার। কিন্তু রাস্তাটা বেঁকে গেছে বলেই সামনের দিকে লক্ষ্য করতে হল তখুনি।—আপনি অবনীবাবুর মেয়ে তো?

মাথা নাড়ল, তাই বটে।

পৌঁছে দিচ্ছি।

সান্ত্বনা চুপ আবার। স্টিয়ারিং ধরা দুই হাতের হীরার আঙটি থেকে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। ইচ্ছে করছে, ঘুরে বসে লোকটার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নেয়। কিন্তু মুখ তুলে তাকাতেও পারছে না।

দোড়গোড়ায় জিপ থামতেই বাইরের ঘর থেকে নরেন চৌধুরী গলা বাড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করল। সান্ত্বনাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে বিস্মিত নেত্রে দরজার কাছে এগিয়ে এলো সে।

নমস্কার মিঃ চৌধুরী, ভালো তো?

নমস্কার, কি আশ্চর্য, আপনি কোত্থেকে?

সহাস্যে জবাব এলো, আপনাদের মেন কোয়ার্টার্স-এ যাচ্ছিলাম, ইনি রোদে কষ্ট করে উঠে আসছেন দেখে পৌঁছে দিলাম। চলি, কেমন—?

জিপ ঘুরিয়ে নিল। প্রত্যাবর্তন। সান্ত্বনা এতক্ষণে সহজ হল যেন। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, কে এঁরা?

নরেন অবাক, তুমি চেনো না?

না তো !

চেনো না, অথচ গাড়ি চেপে চলে এলে ?

পাহাড় ভেঙ্গে উঠে আসছি দেখে গাড়ি থামিয়ে ডাকলেন তো কি করব ! বলুন না কে ?

কন্‌ট্রাক্টার ঘোষ-চাকলাদার—একজন রণবীর ঘোষ, পিছনের জন দ্বিজেন চাকলাদার।

সান্ত্বনা মহা অপ্রস্তুত। একেবারে যেন বোকা বনে গেছে। বলেই ফেলল, ধেৎ ছাই !

নরেন চৌধুরী নিরীক্ষণ করে দেখছিল তাকে।—তুমি কি ভেবেছিলে ?

সান্ত্বনা আরও লজ্জা পেল একটু। কে ভেবেছিল বললে এক্ষুনি ঠাট্টা শুরু হবে। কিন্তু গাড়িতে আসার আনন্দটাই মিছিমিছি মাটি হল। কে না কে, না জেনেই একেবারে কিনা কাঠ হয়ে বসে রইল সারাক্ষণ ! কিন্তু আশ্চর্য, ওকে কিন্তু ঠিক চেনে ভদ্রলোকেরা।

এতক্ষণ বাদে বাড়ি ফেরার কথাটা মনে হতেই সচকিত হল। সিঁড়ির কাছ থেকেই ভিতর দিকে উঁকি দিল একবার। পরে প্রায় ইশারায় জিজ্ঞাসা করল, বাবা কোথায় ?

ভিতরে। যাও এক হাত হবে'খন আজ।

ছোট মেয়েরই মতই ভয়ে ভয়ে সান্ত্বনা জিজ্ঞাসা করল, খুব রেগে গেছে বুঝি।

খু উ-ব। তোমার মাসিমা না কারা এসেছেন—সেই থেকে সকলে অস্থির তোমার জন্য।

মা-সি-মা ! মুহূর্তের বিমূঢ় বিস্ময় ভাব কাটিয়ে নরেনের গায়ের উপর দিয়েই ছুটল ভিতরের দিকে। বাবার বকুনির ভয়-ভাবনা রসাতলে গেল।

নরেন গিয়ে চেয়ারে বসল আবার। অন্যমনস্ক। ভিতরের হৈ-হল্লোড় কানে আসছে, কিন্তু তার থেকেও বেশি কানে লেগে আছে কন্‌ট্রাক্টার ঘোষ-চাকলাদারের জিপের ঘড়ঘড় শব্দটা।

সত্যিই মাসিমা !

সঙ্গে মাসতুত ভাই আর বোনও। ছুটে গিয়ে সান্ত্বনা গলা জড়িয়ে ধরল মাসির। আচমকা আক্রান্ত হয়ে অবস্থা সঙীন তাঁর। বললেন, খুব দরদ বুঝেছি ছাড়—এতক্ষণ ছিলি কোথায় তুই ?

জবাব না দিয়ে উৎফুল্ল আনন্দে সান্ত্বনা মাসিকে ছেড়ে ভাই-বোনকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করল একপ্রস্থ। তার কাণ্ড দেখে অবনীবাবুরও হাসি চাপা দায়

হচ্ছে। কিন্তু হাসলে আর শাসন করা যায় না। বললেন, এই চনচনে রোদে সকাল থেকে কোথায় টো-টো করে ঘুরছিলি শুনি ?

মাসির কোল ঘেঁষে বসে এই সব অপ্রিয় প্রসঙ্গ একেবারে বাতিল করে দিতে চাইল সান্ত্বনা।—কোথাও না, যাও। দেখলে মাসিমা, কোথায় তুমি এলে, ন বাবা আমাকে বকার ফিকির খুঁজছে।

অর্থাৎ মাসি যখন এসেছে, যা-ই করে থাকি আর বকাবকির প্রশ্ন উঠতে পারে না। কিন্তু মাসিমাই উল্টো সুর ধরলেন।—হ্যাঁ রে, তুই নাকি দিনরাত কাঠফাটা রোদ্দুরে আর হিমের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াস, অসুখ-বিসুখ হলে তখন ?

সান্ত্বনা তাচ্ছিল্য করে জবাব দিল, হ্যাঁ, অসুখ হলেই হল—

অবনীবাবু বললেন, আমি বলে বলে হায়রান হয়ে গেছি, আপনি ওকে নিয়ে যান এবার—বিদেশ-বিভুঁইয়ে ও একটা কিছু বাধিয়ে বিপদে ফেলবে আমাকে।

কিন্তু বোনঝির দিকে চেয়ে চেয়ে অসুখ-বিসুখের কোনো সম্ভাবনার কথা মনে হল না মাসির। বরং দেখলেন, ফর্সা রঙের ওপর কচি শ্যামলের ছোপ লেগেছে। চোখে মুখে হাসিতে খুশিতে নিটোল গ্রাম্য প্রাচুর্যের ছাঁদ এসেছে একটা।

প্রসঙ্গ এড়াবার জন্যেই সান্ত্বনা বলল, তুমি সত্যি সত্যি এত শীগ্‌গির চলে আসবে মাসিমা, আমি একবারও ভাবি নি।

মাসিমা জবাব দিলেন, অত করে আসতে লিখেছিলি তাহলে অমনি বুঝি ? কি দিয়ে কি করছিস সেই থেকে ভাবছি···। কিন্তু তোর বাবা যে তোকে নিয়ে যেতে বললে শুনলি ?

আবার সেই কথাই এসে পড়তে সান্ত্বনা হতাশ নয়নে তাকালো তার বাবার দিকে।—তুমি যাও না বাবা ও-ঘরে, নরেনবাবু একলা বসে আছেন মুখ বুজে, গল্প করোগে।

সকরুণ অনুনয়ে সকলে হেসে উঠতে উৎফুল্ল মুখে নিজেই উঠে দাঁড়াল সে। দাঁড়াও আমিই ডেকে আনছি ভদ্রলোককে, লজ্জায় আসতে পারছে না—

চলে গেল এবং প্রায় জোর করেই নরেন চৌধুরীকে এ ঘরে নিয়ে এলো। তড়বড় করে বলে গেল, এই আমার মাসিমা—এই মাসতুত বোন—বোনের বিয়ের ভাবনায় মাসির চোখে ঘুম নেই—আর এই হল মাসতুত ভাই—খুব ভালো ছেলে, ক্লাসে একদিনও পড়া পারে না।

বাড়িতে পদার্পণ করেই মাসিমা একে দেখেছেন। অবনীবাবু আলাপও করিয়ে দিয়েছেন। এবারে অন্তরঙ্গতাটুকু চোখে পড়ল মাসির। পড়ল বলেই কয়েক

নিমেষ নিরীক্ষণ করে দেখলেন তাকে। নরেন হাসছে মুখ টিপে।

খুব পরিচয় করিয়ে দিয়েছিস, বোন আর ভাই দেখাবে'খন পরে তোকে—এঁকে একটা কিছু পেতে বসতে দে।

তকতকে মেঝের ওপরেই সমাসীন সকলে। নরেন চৌধুরীও খাঁকি ট্রাউজার টেনে অবনীবাবুর কাছাকাছি পা গুটিয়ে বসে পড়ল। পরে মাসির দিকে চেয়ে হেসে বলল, আপনি আসায় সান্ত্বনার আনন্দ বোধ হয় মড়াই থেকেও শোনা যাচ্ছে। যাবেই তো! সান্ত্বনার পরিচয় করানো শেষ হয় নি এখনো, তুমি একদিন রাগ করে আমাকে বাবাকে মাকে দাদুকে সক্কলকে নিয়ে কি একটা গাল দিয়েছিলে না মাসিমা—পঞ্চতপার গুষ্টি? এই দেখো মূর্তিমান পঞ্চতপা। খুশিভরা দুই চোখ নরেনের মুখের অপর সংবদ্ধ হল।—বুঝলেন না তো? মাথার ওপর সূর্যের তাপ, চারদিকে পৃথিবীর তাপ—এই পাঁচ তাপের মধ্যে বসে—এই! মেরুদণ্ড সোজা করে দু চোখ বুজে যোগাসনের একটা নমুনা দেখাতে গিয়ে হেসে ফেলল। পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে বলল, শুধু ইনি নয় মাসিমা, এঁদের চিফ ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে পাগল সর্দার পর্যন্ত সব্বাই তাই—সাধনার চোটে এই পাহাড়ী মরুভূমির ওপর দিয়েও তরতরিয়ে জাহাজ চলবে দেখো'খন।

আর একপ্রস্থ হাসি।

অবনীবাবু বললেন, নে খুব হয়েছে এখন, বেলা কত হল খেয়াল আছে, খাওয়া-দাওয়া নেই আজ?

তড়াক্ করে উঠে দাঁড়াল সান্ত্বনা। সত্যিই একেবারে ভুলে বসেছিল। কিন্তু নরেন মাঝখানে ফোড়ন কাটল আবার। নিরীহ মুখেই অবনীবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, সান্ত্বনার খাওয়া হয়েছে?—মানে, বকুনি খাওয়া? সকাল থেকে এ পর্যন্ত কোথায় ঘুরছিলে—

সান্ত্বনা তর্জন করে উঠলা, ভালো হবে না কিন্তু।

ঘর ছেড়ে দ্রুত প্রস্থান করল সে।

মাসতুত বোন আর ভাইও অনুসরণ করল। উঠতেন মাসিমাও, কিন্তু ছেলেটির প্রতি কৌতূহলবশত উঠলেন না। এটা সেটা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। গ্রামের কথা, বাড়ির কথা, চাকরির কথাও দু'চারটে।

রান্নার ফাঁকে ফাঁকে সান্ত্বনা এক একবার আসছে এ ঘরে। শেষে বাবাকে স্নানে পাঠিয়ে মাসির রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল। বলল, আমার রান্নাতেই এই, মাসিমার হাতের রান্না খেলে একেবারে দ্রৌপদীর শোক উথলে উঠবে আপনাদের।

মাসি হেসে ফেলেও প্রায় ধমকের সুরেই বললেন, মেয়ের কথার ছিরি দেখো!

নরেন টিপ্পনী কাটল, এ কথা বলে আসলে রান্নার ব্যাপারটা আপনার ওপর চাপাতে চাইছে বোধ হয়।

সান্ত্বনা চাক্ বা না চাক্ যে দুদিন ছিলেন রান্নার ভার তিনিই নিলেন আর নরেনও যথাবিধি দু'দিনই নিমন্ত্রিত হ'ল। হৈ-চৈয়ের মধ্যে কাটল সে দিনটা। পরদিনও প্রায় তাই। আপিস ফেরত নরেন চৌধুরীকে বাহন করে সান্ত্বনাই মহা উৎসাহে মাসি এবং ভাইবোনদের ড্যামের কার্যকলাপ দেখাল শোনাল এবং বোঝাল। পাহাড়ে পাহাড়ে ওঠানামা করিয়ে পায়ে ব্যথা ধরিয়ে দিল সকলের।

কিন্তু পরদিন রাত্রিতে সান্ত্বনার আনন্দ-প্রাচুর্যে একটা ছেদ পড়ে গেল যেন হঠাৎ।

একটু আগে সকলকে বাড়ি পৌঁছে নিয়ে নরেন চলে গেছে। রাতের নাম-মাত্র রান্না সেরে নেবার জন্য সান্ত্বনা রান্নাঘরে ঢুকেছে। ওদিকের ঘর থেকে বাবা এবং মাসির কথাবার্তা কানে এলো। ইতিমধ্যে সাংসারিক আলাপের অবকাশ বড় পেয়ে ওঠেন নি মাসি। পরের দিন তাঁর যাওয়ার কথা। তাই অবনীবাবুর সঙ্গে দুটো কথাবার্তা কইতে বসেছেন।

তাড়াহুড়ো করে হাতের কাজ করছিল সান্ত্বনা। আর ভাবছিল, কাল মাসির যাওয়া বন্ধ করতে হবে। কাল কেন, পরশুও যেতে দেবে না।

ওদিক থেকে মাসির একটা মন্তব্য কানে এলো।—ছেলেটি বেশ, দিব্বি হাসিখুশি, একেবারে আপনার জনের মত।

খুব ভালো, ভারী ভালো। অবনীবাবু বললেন—এই বয়সে কত বড় চাকরি করে, একটু অহঙ্কার নেই, একেবারে ছেলেমানুষ।

কিন্তু ওরা চৌধুরী না কি শুনলাম, বামুন তো?

বামুন—? কি জানি। ভাবলেন একটু, বামুন নয় বোধ হয়···

কণ্ঠস্বর বদলে গেল মাসির। একটু চুপ করে থেকে ঈষৎ উষ্ণকণ্ঠে বললেন, কোন্ জগতে যে বাস করছ তোমরাই জানো বাপু।

আবার কিছুক্ষণ নীরব থেকে একেবারে অন্য প্রসঙ্গ তুললেন তিনি।—তুমি তো আপাতত এখানেই থাকবে বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু এখানে বসেই তুমি মেয়ের বিয়ে দিতে পারবে মনে করো নাকি?

বিব্রত মুখে অবনীবাবু বললেন, তাই তো ভাবছি।

কিছুই ভাবছ না, ভাবলে আর অমন নিশ্চিন্তে কাটাতে পারতে না। ভালো চাও তো মেয়েকে কালই আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও, আমি চেষ্টা-চরিত্র

করে দেখি। আর ··এখানে এসব আমার ভালও লাগছে না।

কি ভাল লাগছে না, সেটা অবনীবাবুর বোধগম্য হল না ঠিক। চেষ্টাও করলেন না বুঝতে। চিন্তিত মুখে বললেন, ও কি যাবে এখন, আপনিই বলে দেখুন না।

এদিকে সান্ত্বনার হাতের কাজ থেমে গেছে। ভুরুর মাঝে কুঞ্চনরেখা পড়েছে। দুই চোখ শূন্যের মধ্যে এক-একবার ঘুরে এসে থেমে যাচ্ছে।

হঠাৎ সমস্ত ভিতরটাই যেন তিক্ত হয়ে গেল তার। মাসতুত বোনের একটু আধটু চপল ইঙ্গিতের তাৎপর্যও সুস্পষ্ট হল এতক্ষণে। মনে হল মড়াইয়ের এই উন্মুক্ত মুক্তির মধ্যে মাসিকে মানায় না, মাসতুত বোনকে মানায় না। তারা ভিন্ন গণ্ডির মানুষ, তার মধ্যে নিয়ে পুরতে চাইছে একেও। ওর এই মুক্তি কেড়ে নিতে এসেছে। নরেনবাবুর প্রসঙ্গে কই তার তো কোন দিন কিছু মনে হয় নি। সান্ত্বনা নিজের অধর নিজেই দংশন করতে লাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর মাসি কথা পাড়লেন। কাল দুপুরেই কিন্তু যাচ্ছি রে সান্ত্বনা, তুইও এবার যাবি তো আমার সঙ্গে?

সান্ত্বনা প্রস্তুত ছিল। একরাশ বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, আমি! তুমি বলো কি মাসিমা, আমি গেলে বাবাকে দেখবে কে?

তোর বাবাকে তুই চিরকাল আগলে রাখবি ভেবেছিস নাকি?

ভেবেছি মানে? রাখবই তো।

ভগবান করুন রাখিস'খন। এখন তো চল, তোর বাবাই নিয়ে যেতে বলছে।

সান্ত্বনা বাবার দিকে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জবাব দিল, আমাকে বলে দেখুক একবার।

কিছু বলা দূরে থাক, মেয়ের কথায় বাপকে হাসতে দেখে অসন্তুষ্ট হলেন মাসি। আদর দিয়ে মেয়েকে একেবারে মাথায় তুলেছে। বললেন, বেশ, তোমাদের ভালো তোমরা বোঝো, আমি আর কিছুতে নেই।

সান্ত্বনাকে প্রথম দেখেই মাসি উপলব্ধি করেছিলেন ওকে নড়ানো যাবে না এখান থেকে। এ ক'মাসে ওর চেহারা নয়, ভেতরসুদ্ধ যেন বদলে গেছে।

পরদিন মাসি চলে গেলেন।

আর দুটো দিন থাকার জন্য সান্ত্বনা মৌখিক অনুরোধও করতে পারল না একবার। উল্টে যেন স্বস্তির মত লাগছে। এত দিন এত আদরে কাটিয়েছে মাসির কাছে, ভারী অকৃতজ্ঞ মনে হতে লাগল নিজেকে। কিন্তু যা হচ্ছে তা হচ্ছেই। হচ্ছে বলেই স্বস্তির সঙ্গে সঙ্গে অতি অস্বস্তিও

মাসি যাওয়ার পরেও কটা দিন গুম হয়ে কাটালো সান্ত্বনা। অকারণ বিরক্তিতে মন ছেয়ে রইল। আগের মত নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া আর ছড়িয়ে দেওয়ার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে ব্যাঘাত ঘটতে লাগল।

কিন্তু শীগগিরই এই গুমোট অসহিষ্ণুতা কেটে গেল আবার। কাটল পাগল সর্দার আর ভুতুবাবুর কল্যাণে। অপ্রত্যাশিত বৈচিত্র্যে মাঝের এই কটা দিন একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল যেন। নিজেকে ফিরে পেল সান্ত্বনা।

সেও ছুটির দিন। তার বিগত কটা দিনের আচরণে মনে মনে বিস্মিত হচ্ছিল নরেন চৌধুরী। অবনীবাবুর সামনেই হালকাভাবে বলেছিল, মাসি চলে গেলেন বলে একেবারে যে মুষড়ে পড়লে দেখছি।

সান্ত্বনা ফস্ করে জবাব দিয়েছে, আনন্দে হাততালি দেব ?

ওব্ বাবা! তা তুমিও তো গেলেই পারতে মাসির সঙ্গে—দিন কতক না হয় তোমার ড্যাম্ সুপারভিশান বন্ধই থাকত।

আগে এ ধরনের ঠাট্টায় অনেক হেসেছে সান্ত্বনা। কিন্তু এই লোকের সম্বন্ধেই বিচ্ছিরি ভাবে সচেতন করে দেওয়া হয়েছে তাকে। আগের মত হাসতে পারা সহজ নয়। পারলও না।

এমন সময় দরাজ গলায় হাঁক শোনা গেল বাইরে।—দিদিয়া! ই-দিদিয়া—

সান্ত্বনা বাইরে এসে দাঁড়াতেই উল্লসিত পাগল সর্দার বলে উঠল, দিদিয়া, ভুতুবাবু ডাংরা লিয়ে আসলো—আরাঃ ডাংরা—ভাগে ডাংরা—নাওয়া ডাংরা নাওয়া তোয়াদিবে—!

আনন্দাতিশয্যে অনেকগুলি দুর্বোধ্য শব্দ বলে ফেলল পাগল সর্দার। অর্থাৎ ওই গোরু নিয়ে আসছে ভুতুবাবু, রাঙা গোরু, খাসা গরু, নতুন গাইয়ের নতুন দুধ পাবে গো তুমি!

অদূরে বাঁকের মুখে চোখ পড়তেই সান্ত্বনাও সপুলকে বলে উঠল, ওম' তাই তো!

দশ বারো বছরের একটা গ্রাম্য ছেলে দড়ি ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে গোরুটাকে। রাঙা গোরুই বটে। পিছনে একটা খড়ের বাছুর বুকে করে থপ থপ চরণে আসছে গোলাকৃতি ভুতুবাবু।

এক দৌড়ে ভিতরে চলে গেল সান্ত্বনা।—শীগগির এসো বাবা, কি সুন্দর গোরু এনেছে দেখে যাও!

তক্ষুনি বাইরে চলে এলো আবার। গোরুটাকে অভ্যর্থনা করে আবার আগ্রহেই এগিয়ে গেল খানিকটা। কিন্তু খুব কাছে যেতে সাহস [illegible]

করে। কাছাকাছি গিয়ে থমকে দাঁড়াল। তারপর সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল।

এত পরিশ্রম সার্থক হল যেন ভুতুবাবুর। ঘামদরদর মুখে একগাল হেসে বলল, ভুতুর অসাধ্য কম্ম নেই মা-লক্ষ্মী, দেখলেন তো? পছন্দ হয়েছে?

হাসিমুখে দুই চোখের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে গিয়ে থমকে গেল সান্ত্বনা। —আ-হা, ওর বাছুরটা মরে গেছে বুঝি?

হ্যাঁ তাতে কি, এটাকে কাছে পেলেই ও খুশি, ভারী ভালো গোরু। নামও খাসা—সুন্দরী।

ওদিকে নরেন চৌধুরী বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। তার পিছনে অবনীবাবু। মেয়ে গোরু আনাবে করে করে শেষে সত্যিই এনে হাজির করবে এতটা ভাবেন নি বোধ হয়। ফ্যাল ফ্যাল করে দেখতে লাগলেন তিনি।

বক্ষসংলগ্ন খড়ের বাছুর মাটিতে নামিয়ে দু'জনেরই উদ্দেশে বিনয়াবনত হ'ল ভুতুবাবু। পরে সিঁড়ির ছায়ায় ধপ করে বসে পড়ে ঘাম মুছতে মুছতে বলল, মা-লক্ষ্মী নিজে গিয়ে বলে আসতে সেই থেকে খুঁজছি—তা গোরুর মত গোরুই পেয়ে গেলাম বটে—সাক্ষাৎ যেন ভগবতী আশ্রয় করেছেন ওর মধ্যে।

নরেন হাসছে। অবনীবাবু চুপ। এই নতুন ঝামেলায় বিরক্ত হয়েছেন বোঝা যায়। টাকা কত গুনতে হবে সেটাও ভাবছেন।

জিজ্ঞাসা করতে হ'ল না। ভুতুবাবুই বলল, অনেক ঝকাঝকি করে একশ পঁচিশে রাজী করিয়েছি, দিতে কি চায়—সবে প্রথম বিয়ান, এখন তো জীবন-ভোর দুধ দেবে। প্রসন্ন বদনে সান্ত্বনার দিকে চেয়ে বলল, খুব শস্তায় পেয়ে গেছেন মা-লক্ষ্মী।

কিন্তু মা-লক্ষ্মী তখন শঙ্কিত নেত্রে বাবার মুখভাব পর্যবেক্ষণে রত। খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না। একশ পঁচিশ বেশি হ'ল কি কম হ'ল ধারণা নেই। শুধু মনে হ'ল একশ পঁচিশ অনেকগুলো টাকা।

মেয়ের মুখের দিকে চেয়েই বোধ হয় কিছু আর বললেন না অবনীবাবু। টাকা আনতে ভিতরে চলে গেলেন। উৎফুল্ল আনন্দে সান্ত্বনা এবার গোরুটার কাছে এগিয়ে গেল। ছেলেবেলা থেকেই গোরু নিয়ে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। ভয় বিশেষ নেই! চিনলে দু'দিনেই ঠিক হয়ে যাবে। তবু এই মুহূর্তে ওর গায়ে পিঠে একটুখানি হাত দেবার লোভ সামলায় কি করে। গোরুটা একটু আধটু নড়েচড়ে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর গায়ে পিঠে কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সান্ত্বনা। নরেনকে বলল, কি ঠাণ্ডা চাউনি দেখেছেন?

নরেন আর যাই হোক, গোরুর সমঝদার নয়। তবু ভালোই লাগছে। ওকে

খুশি করার জন্যেই গোরুটার বেশ কাছে গিয়েই দাঁড়াল সেও। হাত বাড়িয়ে একটু আদর করতে গেল তারপর।

কিন্তু ঝামেলা বাড়ছে দেখেই হোক বা বেশি আপ্যায়ন পছন্দ নয় বলেই হোক, হঠাৎ সিং নেড়ে অসন্তোষ জ্ঞাপন করে উঠল গাভীকন্যা।

বাব্‌রা! এক লাফে প্রায় হাত তিনেক সরে এলো নরেন চৌধুরী।

খিল খিল করে হেসে উঠল সান্ত্বনা। হাসতে লাগল পাগল সর্দার আর ভুতুবাবুও।

সান্ত্বনা টিপ্পনী কাটলো, দেখলেন, ও লোক চেনে!

পাল্টা জবাব দিল নরেন চৌধুরী, চিনবেই তো, মা-লক্ষ্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ভগবতীর আর তফাত কতটুকু?

পাগল সর্দার বুঝল না। কিন্তু প্রায় চার আঙুল জিভ বার করে ফেলল ভুতুবাবু। নিরুপায় রোষের অভিব্যক্তি সান্ত্বনার চোখে।

পথ-খরচা সমেত টাকা বুঝে নিয়ে ভুতুবাবু প্রস্থান করতে অবনীবাবু এবার বললেন, মাসীর সঙ্গে তোকে পাঠিয়ে দিলেই ভাল হ'ত দেখছি—তুই একেও গিয়ে ধরেছিলি গোরুর জন্যে?

এখন কোন জবাব দেবে, এত বোকা নয় মেয়ে। নিরীহ মুখে দাঁড়িয়ে রইল। পরে ইশারায় নরেনকে বলল, বাবাকে নিয়ে ঘরে যান না।

তাঁরা আড়াল হতে পাগল সর্দারকে তাড়া দিল, ওর ঘর ঠিক না করে দিয়ে যেতে পাবে না কিন্তু সর্দার।

সর্দার এক পায়ে প্রস্তুত। বলল, হেঁ আখুনি দুব—

ঘর এক রকম ঠিক করেই রেখেছিল সান্ত্বনা। পিছনের দিকে ছাপরা ঘরের মত আছে একটা। হয়তো চাকর-বাকর থাকার জন্য করা হয়েছিল। গৃহ-সংলগ্ন হলেও বিচ্ছিন্ন, পাশের সরু রাস্তা দিয়ে আলাদা প্রবেশ-পথও আছে।

গোয়াল-ঘরে পরিণত হ'ল ওটাই। সর্দার খুঁটি পুতে দিল। তারপর পয়সা চেয়ে নিয়ে দড়ি টব বালতি খোল ভুষি ইত্যাদি কিনে নিয়ে এলো। নতুন আলয়ে গৃহপ্রবেশ সম্পন্ন হ'ল সুন্দরীর। যে ছোকরা ওকে টেনে নিয়ে এসেছিল, গোরুর জন্যে অবনীবাবু তাকেই বহাল করলেন। দু'বেলা দুইয়ে দেবে, গোয়াল ঘর পরিষ্কার করবে, চরাতে নিয়ে যাবে। সান্ত্বনার মতে কিছুই দরকার ছিল না, ও নিজেই পারে সব। কিন্তু এখন এ নিয়ে বাবার কথার ওপর কথা কইলে নির্ঘাত বকুনি আছে কপালে। পরে ভেবে দেখল, লোক একজন দরকারও.. গোরুর খাবারদাবার তো আর নিজেই বয়ে আনতে পারবে না।

কিন্তু অদৃষ্টে বকুনি আছেই। প্রথম দিনকতক প্রায় আহার নিদ্রাই ঘুচে গেল। ফাঁক বুঝে ছোকরাটাও ফাঁকি দিতে শুরু করল। কিন্তু সান্ত্বনা ওর পরোয়া করে ভারি। চরাতে নিয়ে যাওয়ার সময়েও সে সঙ্গে থাকে। তার নির্দেশমত কিছু দূরে পিছনের দিকের একটা খোলা জায়গায় খুঁটিতে বাঁধা হয় গোরুটাকে। ঘাস খুব নেই। কাজেই জাবনার বালতিও আনতে হয় সঙ্গে। ভদ্রলোকের বিশেষ আনাগোনা নেই এদিকটায়। গ্রাম্য পথচারীরা শুধু এই পথে পাহাড় ডিঙিয়ে যাতয়াত করে। সঙ্কোচ এমনিতেই কম, সেটা আরো গেল। ছোকরাটা সময় মত না এলে গোরু আর বালতি নিয়ে সান্ত্বনা এক-একদিন নিজেই বেরিয়ে পড়ে।

ফলে জল ঘাঁটাও বাড়ছে, রোদের ধকলও যাচ্ছে। অবনীবাবু রীতিমত রেগে গিয়ে বলেন, একটু শরীর খারাপ হয়েছে কি তোকে আমি ঠিক পাঠিয়ে দেব এখান থেকে।

দু'চার দিন সমীহ করে চলে সান্ত্বনা। তার পর যেই কে সেই। আবার একদিন বকুনি খায়।

কিন্তু অদৃষ্ট-বিড়ম্বনায় ব্যাপারটা ঘটল উল্টো রকম। অবনীবাবু হঠাৎ নিজেই পড়লেন অসুখে। দিন দুই সর্দি এবং জ্বরভাব, তারপর একেবারে শয্যাশায়ী।

সান্ত্বনা শাসন করল, নিশ্চয় ঠাণ্ডা লাগিয়ে আর রোদ লাগিয়ে অসুখটি এনেছ।

অবনীবাবু আর বলবেন কি। হেসে ফেলেন।

কিন্তু ভোগালে বেশ। জ্বর সহজে ছাড়তে চায় না। এসব কাজে বেশি দিন ছুটি নিয়ে বসে থাকাও চলে না। আবার না নিয়েই বা উপায় কি। সরকারী ডাক্তার রোজ এসে দেখে যান। নরেন নিয়ে আসে সঙ্গে করে। ওষুধপত্রও এনে দেয়। বাবার মুখেই সান্ত্বনা শুনেছে, ছুটিছাটা বেশি চাইলে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের নাকি মেজাজ বিগড়োয়। কিন্তু নরেন থাকতে এ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে হ'ল না কিছু।

সেরে উঠলেন অবনীবাবু কিন্তু বেশ কাহিল তখনো। বিকেলের দিকে সেদিন সান্ত্বনাকে বললেন, বাইরে থেকে একটু ঘুরে আয়গে যা না—একেবারে ঘরে বন্ধ হয়ে আছিস। নরেনের উদ্দেশে বললেন, ওর সুন্দরী পর্যন্ত সময়মত দেখা না পেয়ে অস্থির, খালি ডাকে।

নরেন আর প্রস্থ রঙ চড়ালো।—ড্যামের কাজও এ কদিন প্রায় বন্ধ বললেই চলে। একবার সুপারভাইজ করে আসবে চলো তা হলে—

যাব না যান! বাঁজ দেখায় সান্ত্বনা, তার থেকে সুন্দরীকে নিয়ে বেরুব আমি।

নরেনের চোখে চোখ পড়তেই মা-লক্ষ্মী আর ভগবতীর ঠাট্টাটা মনে পড়ে বোধ হয়। তার চোখে আবার সেই ঠাট্টারই আভাস দেখে তাড়াতাড়ি সরে পড়ে।

দশ-পনের দিন নয়, সান্ত্বনার মনে হ'ল যেন এক যুগ পরে বেরিয়েছে। পাহাড় থেকে নেমে নিরিবিলি গাঁয়ের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেল।

কিন্তু নরেন অত হাঁটায় অভ্যস্ত নয়। বার বার ফেরার তাড়া দিতে লাগল। অগত্যা প্রত্যাবর্তনের পথ ধরে সান্ত্বনা বলল, আপনি এক নম্বরের কুঁড়ে, মোটে হাঁটতে চান না।

এইতেই বাড়ি পৌঁছে বাবার কাছে তাড়া খেতে হবে দেখো'খন।

সান্ত্বনা হালকা ভাবেই জবাব দিল, যাই বলুক, অসুখ করার কথা বাবা আর মুখেও আনবে না, খুব জব্দ হয়ে গেছে।

তাকে বাগাবার জন্যেই নরেন ঠেস দিল, ওঁর এই ছোটখাটো অসুখটায় তোমার তাহলে কিছুটা সুবিধেই হয়েছে বলো?

কিন্তু সান্ত্বনার মেজাজ অন্যরকম এখন। রাগ-বিরাগের ধার দিয়েও গেল না। শুধু বলল, হ্যাঁ হয়েছে, আপনার যেমন বুদ্ধি!

ফেরার পথে ভুতুবাবুর হোটেলের পাশ কাটানো গেল না। নত অভিবাদন জ্ঞাপন করে একগাল হেসে পথরোধ করে দাঁড়াল। নরেনের দিকে চেয়ে সবিনয়ে বলল, একটু বসবেন না স্যার, একটুখানি চা—কাল সবে ফ্রেশ মাল এনেছি—

গম্ভীর মুখে নরেন চৌধুরী মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানাতে থেমে গেল। সান্ত্বনা একা থাকলে টেনে এনেই বসাতো। কিন্তু এই হোমরা-চোমরা মানুষগুলোর ধাত বুঝে চলতে হয় ভুতুবাবুকে।

নিস্পৃহ প্রত্যাখ্যানে লোকটার জন্য কেমন মায়া হ'ল সান্ত্বনার। মিষ্টি করে বলল, আজ দেরি হয়ে গেছে, আর একদিন এসে খাব, কেমন? আপনার গোস্ত কিন্তু চমৎকার হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে, একবারটি গিয়ে দেখে এলেন না তো?

ভুতুবাবু বিগলিত।—খুব ভালো হয়েছে? আমি ভাবছিলাম কেমন না জানি হ'ল। সবাই বলে আর জন্মে ভুতু খালি ভালো খোঁজার তপস্যা করেছিল। যাক, নিশ্চিন্দি হলাম, হোটেল ছেড়ে এক দণ্ড নড়তে পারিনে তো, তবু নিশ্চয় যাব।

দু'দশ পা এগিয়ে নরেন চৌধুরী মন্তব্য করল, ব্যাটা ঘুঘু।

সান্ত্বনা বলল, খুব ভালো লোক। কি মনে পড়তেই হেসে সারা তারপর। —সেদিন বলছিল, আপনি নাকি খুব স্নেহ করেন ওকে—অতি মহাশয় ব্যক্তি আপনি।

নরেনও হেসে ফেলল। বলল, ব্যাটা বাস্তুঘুঘু, তোমার গোরুর একশ পঁচিশ টাকার অন্তত পঁচিশ টাকা ওর গহ্বরে গেছে।

কক্ষনো না, আপনি মিছিমিছি বাড়িয়ে বলেন, বেশ ভালো লোক।

সে কথার আর জবাব না দিয়ে সামনের চড়াইয়ের রাস্তাটার দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল নরেন চৌধুরী—ট্রাকটাও যদি ছাই আসত এখন!

শুনেই কি মনে পড়ে যায় সান্ত্বনার। উৎফুল্ল মুখে বলে, ওই ঘোষ-চাকলাদার না কি কন্ট্রাক্টারদের জিপটা এলেও তো হত—।

ভুরু কুচকে নরেন তাকাল একবার ওর দিকে।...এলেও সঙ্গে আমাকে দেখে নিরাস হয়ে জিপ আর থামাতো না।

বেৎ, আপনার খালি ইয়ে! তেমনি হেসেই বলল, কি না জানি ওঁরা ভেবে গেলেন সেদিন, হঠাৎ এমন ঘাবড়ে গেলাম যে একটা কথাও বেরুল না মুখ দিয়ে।

সেটাও ওদের খুব অপছন্দ হয় নি বোধ হয়।

ফের! ভ্রূকুটি করে কয়েক পা এগিয়ে গেল সান্ত্বনা।

জিপ বা ট্রাক কিছুই নয়। মাঝামাঝি পথে দু'টি নারীমূর্তি। পাহাড়ের ধার-ঘেঁষা একটা বড় পাথরে সমাসীন। দৃষ্টি মড়াইয়ের দিকে। আবছা অন্ধকারে দূর থেকে ঠিক ঠাওর হ'ল না। কাছে আসতে চেনা গেল। নরেন চৌধুরী অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠল, এই সেরেছে!

বর্ষীয়সী মহিলাটিকে সান্ত্বনাও চেনে। অ্যাডমিনিসট্রেটিভ অফিসারের স্ত্রী মিসেস চ্যাটার্জী। সঙ্গের মেয়েটি সান্ত্বনারই সমবয়সী হতে পারে, কিছু বড়ও হতে পারে।

কাছাকাছি হতে দু'জনেরই চোখ পড়ল এদিকে। মহিলা দাঁড়িয়ে সানন্দে বলে উঠলেন, আপনার কোয়ার্টারেই যাব ভাবছিলাম মিঃ চৌধুরী—আপনার সঙ্গেই দেখা! সান্ত্বনার দিকে কটাক্ষপাত করে নিয়ে আবার বললেন, বেড়াতে বেরিয়েছিলেন নাকি? কত দূর গেলেন? আমি নিচে নামলে আর একবারে উঠতেই পারিনে, হাঁপিয়ে পড়ি।

নরেন দাঁড়িয়ে সবিনয়ে হাসতে লাগল শুধু।

কই রে ঝরনা এদিকে আয়, আলাপ করিয়ে দিই। আমার মেয়ে ঝরনা, এম-এ পড়ে কলকাতায়—ছুটিতে এসেছে।—ইনি এখানকার ইঞ্জিনিয়ার ড্রাফট্‌স্‌ম্যান নরেন চৌধুরী—এঁর কাছেই যাব বলছিলাম তোকে।

যথারীতি নমস্কার বিনিময়। সান্ত্বনা মেয়েটিকেই দেখছে চেয়ে চেয়ে। ছিপছিপে, চকচকে। চশমার নিচে ঝকঝকে চকিত দৃষ্টি।

ঝরনা মাকেই জিজ্ঞাসা করল, আর ইনি ?

ও—এই এখানকারই একজন ওভারসিয়ারের মেয়ে—কি নাম যেন তোমার ?

—সান্ত্বনা।

মেয়েটি এম-এ পড়ে শুনে গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না প্রায়। দু হাত তুলে মিষ্ট হেসে ওকেও যে নমস্কার জানাবে ভাবে নি। তাড়াতাড়ি হাসি টেনে কোন প্রকারে প্রতিনমস্কার করল সান্ত্বনা।

কাল বিকেলে আপনাকে চায়ের কথা বলতে আপনার কোয়ার্টারে যাচ্ছিলাম মিঃ চৌধুরী। মিসেস চ্যাটার্জী বললেন, আসতে হবে—মিঃ গাঙ্গুলিও কথা দিয়েছেন আসবেন।

শুনে নরেন চৌধুরী হতাশার ভঙ্গি করল একটা। কাল ? কি দুর্ভাগ্য, কাল যে এক বিশেষ কাজে আটকে আছি !

সে কি ! না না—সন্ধ্যের দিকে আসুন তাহলে, তখন তো আর কাজ নেই ? মোলায়েম আন্তরিকতা।

আর বলেন কেন, কাজ একেবারে সেই রাত পর্যন্ত। তাতে কি, আর একদিন হবে'খন। ঝরনা দেবীর তো ছুটি আছেই এখনো, যে কোনদিন গিয়ে চড়াও হব। চলি, নমস্কার, নমস্কার—আপনি বসুন, একেবারে অতটা ওঠা কারো হার্টের পক্ষেই ভালো নয় খুব। এসো সান্ত্বনা—

অপেক্ষা না করে হাঁটতে শুরু করে দিল। খানিকটা এগোবার পর সান্ত্বনার বোবা মুখ খুলল। চিফ ইঞ্জিনিয়ার ওঁর বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্নে যাবেন কাল ?

নেমন্তন্ন হলে আর যাবে না কেন ?

আর আপনি যাবেন না ? বিস্ময় এবং হতাশা।

কি করে যাই, শুনলে তো কাজ আছে।

ছাই কাজ, কি এমন কাজ আছে শুনি ?

প্রথম কাজ, রায় মশাই কেমন থাকেন না থাকেন খবর নেওয়া, দ্বিতীয়, তোমার সঙ্গে আড্ডা দেওয়া—কাল আর বেরুনো হবে না, বাড়ি বসেই আড্ডা দিতে হবে, হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে কেলেঙ্কারি !

পা থেমে গেল সান্ত্বনার। ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করেও পারল না বোধ হয়। আপনি তাহলে মিছে কথা বলে এলেন ওঁকে ?

কেন, এগুলো কাজ নয় ? দাঁড়ালে কেন, এসো—

কি যাচ্ছেতাই লোক আপনি ! দাঁড়ান দেখা হলে বলে দেব। নেমন্তন্ন নিলেন না কেন ?

নিলে কি হ'ত ?

আমি শুনতে পেতাম সব।

নরেন হেসে বলল, সেটা নেমন্তন্নে না গিয়েও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তোমাকে ঠিক ঠিক শুনিয়ে দিতে পারি।

ছাই পারেন, আপনি একটি মিথ্যে কথার জাহাজ। দেখা হোক না, ঠিক বলব আমি—ভদ্রমহিলা অত করে বললেন।

জেনারেল কোয়ার্টারের বাঁকা পথে পা বাড়িয়ে নরেন চৌধুরী সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, ভদ্রমহিলা মনে মনে খুশিই হয়েছেন।

কেন ?

মাথাটি তোমার নীরেট না হলে বুঝতে, চায়ের উদ্দেশ্য মেয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করানো। একলা একজনকে নেমন্তন্ন করলে সদিচ্ছাটা বড় বেশি প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাই আমাকে বলা। এখন সব দিক বজায় রইল, বাদল এলেই প্রথমে জানাবেন, মিঃ চৌধুরীকে অত করে বললাম, তিনি আসতে পারলেন না —ব্যস্ নরেন চৌধুরী ওখানেই শেষ—তারপর অখণ্ড অবকাশ। কিন্তু সুবিধে হবে না—চিফ ইঞ্জিনিয়ারটিকে ঠিকমত জানলে আর এগোতেন না মহিলা।

আভিজাত্যের এদিকটা সান্ত্বনার জানা নেই খুব। ঘাড় ফিরিয়ে হাঁ করে চেয়েই রইল নরেনের মুখের দিকে। শেষের কথাগুলো কানেই গেল না বোধ হয়।

এই মতলব ?

বাড়ি ফিরে কাজের ফাঁকে ফাঁকেও বেশ একটা রোমাঞ্চ অনুভব করছে সান্ত্বনা। ভারী মজা লাগছে ভাবতে। হাতের কাজ ভুলে পার্টির প্রহসনটা সকৌতুকে কল্পনা করতে চেষ্টা করছে এক-একবার। কিন্তু মানুষটাকে তো চোখেই দেখে নি, পারবে কি করে। মেয়েটা তেমন সুন্দরী না হলেও বেশ কিন্তু। আবার বিপরীত অনুভূতিও জাগছে থেকে থেকে। এত কালের এত বড় এক মরু-অভিশাপ দূর করতে বসেছে যে মানুষ—তার সঙ্গে ওই মেয়ে—

নাঃ! সেও আবার কেমন লাগছে যেন।

—পাঁচ—

ওপরের মেন্ কোয়ার্টারস্‌এর মতই অনেকটা জায়গা জুড়ে নিচের আপিস কোয়ার্টারস। হালফেশানের বড়সড় আপিস-বাড়ি বলতে যা বোঝায় তেমন নয়। ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন দালান গোটাকতক। দু-তিনটে করে ঘর। পদমর্যাদা অনুযায়ী সেই সব ঘরের আসবাবপত্র, সাজসরঞ্জাম। বিচ্ছিন্ন হলেও দালানগুলি মেন্ কোয়ার্টারর্স-এর মত অতটা দূরে দূরে নয়। প্রয়োজনে সব সময়েই কর্মচারীদের এক দালান থেকে অন্য দালানে আনাগোনা করতে হয়।

সকালের আপিস শুরু হবার আগে সাধারণ কর্মচারীদের আড্ডা বসে এক প্রস্থ। সব একসঙ্গে নয়। এখানে সেখানে বিচ্ছিন্ন ভাবে। দাওয়ার ওপর এবড়ো খেবড়ো পাথুরে মাটিতে, ছোট ছোট ঝোপের ছায়ায় অথবা শিলাসনে।

কিন্তু প্রায়ই ব্যতিক্রমও ঘটে আবার। মাঝপথে জটলা থামিয়ে যে যার কাজে বসে যায় চুপচাপ। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক। তখনই, যখন একেবারে ওই কোণের দালানটিতে একজনের উপস্থিতির আভাস পায়।

কারো কোনো অনুশাসন নেই এর পিছনে। কোনো ভ্রূকুটি নেই কারো। কিন্তু এমনি হয়ে আসছে। শুধু আপিস পরিবেশে নয়, আউট-ডোরেও। মড়াইয়ের বুকেও। দলে দলে কোদাল শাবল চালাচ্ছে মাটিকাটা কুলিরা, একটু আধটু মস্করা করছে মাটির ঝুড়ি বা পাথর মাথায় কামিনরা, তদ্‌বির-তদারকের ফাঁকে ফাঁকে তাদের খোলা বুকের উপর একটু আধটু চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে কুলিবাবুরা—এরই মধ্যে হয়তো দেখা গেল, প্রায় কোনো দিকে না তাকিয়েই লোকটি চলে যাচ্ছে একপাশ দিয়ে। কুলিরা সচেতন হ'ল একটু, ঝুড়ি মাথায় কামিনরা ফিরে ফিরে দেখে নিল, মুখের বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তৎপর হ'ল কুলিবাবুরা। যন্ত্র-সমাবেশের দিকেও তাই। লোকটি হয়তো দাঁড়াচ্ছে একটু কোথাও, কোথাও বা পাশ কাটিয়ে চলেই যাচ্ছে। কিন্তু এরই মধ্যে কর্মচারী-দের একটুখানি বাড়তি নিবিষ্টতা চোখে পড়বে।

…চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি।

কোণের দালানের স্বতন্ত্র ঘরটিতে কর্মমগ্ন। কাগজপত্র দেখছে। সই করছে। ফাইল ঘাঁটছে। টেবিলে ইঞ্জিনিয়ারিং সরঞ্জাম ছড়ানো। দেয়ালে দেয়াল চার্ট, ম্যাপ। ঘরে ঢুকলে প্রথমেই সমস্ত পরিকল্পনার নক্সাটা চোখে পড়ে।

টেবিলের গায়ের বোতাম টিপতে প্যাঁ—ক্ করে শব্দ হ'ল একটা। বেয়ারার আবির্ভাব।

ওভারসিয়ার রায় বাবু।

বেয়ারা চলে গেল। খানিক বাদে অল্পবয়স্ক একটি লোক হন্তদন্ত হয়ে ঘরে এলো।—রায় বাবু তো এখনো জয়েন করেন নি স্যার।

ইঞ্জিনিয়ারের মুখে বিরক্তির রেখা।—স্পিল্‌ওয়ে সারভে ফাইল কে ডিল করছে নিয়ে আসতে বলুন।

আগন্তুক বেশ একটু বিব্রত মুখে বেরিয়ে গেল।

সামনের উঠোন ডিঙোলেই আর একটা দালান। তেমনি একটা বড় ঘরের মেঝেতে দেয়ালে টেবিলে সর্বত্র ড্রইংয়ের ছড়াছড়ি। আঁকার সরঞ্জামেরও। টেবিলে ছড়ানো ড্রইংয়ের ওপরেই দু পা চালিয়ে দিয়ে চেয়ারে মাথা রেখে সিগারেট টানছে নরেন চৌধুরী। বাঁ হাতে হাতীর দাঁতের কানকাটি দিয়ে কানে সুড়সুড়ি দিচ্ছে আর গলা দিয়ে সেই পেটেন্ট শব্দ বার করছে।

ফাইল-হাতে সেই লোকটি ঘরে প্রবেশ করল। নরেন চৌধুরী সিগারেটের ধোঁয়ার জটিলতা সৃষ্টি করতে করতেই অলস নেত্রে তাকালো তার দিকে।

ফাইলবাহক একটু ইতস্তত করে বলল, বড় সাহেব ডেকেছিলেন—

ধূম্র রচনা বন্ধ হ'ল। ঈষৎ কৌতূহলে তাকালো নরেন চৌধুরী। পরে সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, যাচ্ছি।

না, মানে—আপনাকে নয়—স্পিল্‌ওয়ে ফাইল নিয়ে আমায় যেতে বলেছেন।

ব্যাপার বুঝে নিতে আর সময় লাগল না একটুও। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে নরেন চৌধুরী যে কাগজটার ওপর ছাই ঝাড়ছিল তাতে ভুক্তাবশিষ্ট সিগারেটটা টিপে টিপে নেবাল। তারপর ছাইসুদ্ধ কাগজটা মুড়ে ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে ফেলল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দেয়ালের গায়ে ওল্‌টানো একটা কার্ডবোর্ড সোজা করে দিল। বড় বড় হরফে তাতে ঘরে ধূমপান নিষেধ বাণী লেখা। ফিরে বসল।

দুশ্চিন্তা ভুলে ছেলেটি হাসতে লাগল মিটিমিটি। এই লোকটির সঙ্গে একটা সহজ অন্তরঙ্গতা আছে সকলেরই।

তোমাদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কাছে যেতে হলে আমি কি মাঝপথের হল্‌টিং স্টেশান?

কি করব, অবনীবাবুর তো অসুখ—এসব কখনো করেছি যে হুট্ করে ফাইল নিয়ে গিয়ে হাজির হব? ফাইল তো যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে।

হুঁ! তবু তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে! খুব কড়া করে তাঁকে দু'কথা শুনিয়ে এসো গে যাও—যাও যাও দেরি কোরো না।

অপ্রস্তুত হয়ে হেসে ফেলল ছেলেটি। কিন্তু হাসলে চলবে না, ব্যবস্থা কিছু

করতে হবে এক্ষুনি। ফাইল তার টেবিলের ওপর রেখে বলল, আপনি যা করার করুন, আমি চললাম—।

দ্রুত প্রস্থান।

ফাইল তুলে নিয়ে নরেন চৌধুরী নেড়ে-চেড়ে দেখল একবার। হাতীর দাতের কানকাঠি পকেটে ফেলল। পরে ফাইল হাতে হালকা মৃদু শিস দিতে দিতে বাইরে এসে উঠোন ডিঙিয়ে গন্তব্যস্থানে চলল।

গুড মর্নিং ইঞ্জিনিয়ার সাহেব! দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল।—এই নাও তোমার স্পিলওয়ে ফাইল।

বোসো, তুমি যে?

আমি ছাড়া ওই সাদা ফাইল নিয়ে কে আর তোমার কাছে এগোবে? সারাক্ষণ মুখখানা যা করে থাকো, ওপরঅলার ভয়েই অস্থির সব।

মৃদু হেসে বাদল গাঙ্গুলি তাকালো তার দিকে। সেই রকমই দেখছি বটে।

হা হা করে হেসে উঠল নরেন চৌধুরী—দুঃখ থাকে তো বলো, হুজুর-টুজুর জুড়ে দি—। সবার সব কিছু নিয়ে তোমার কাছে আসতে হয় বলে আমার একটা আলাদা এলাওয়েন্সের জন্য লেখা উচিত তোমার।

লিখব'খন। কিন্তু এ ফাইলের কি হ'ল?

কি আর হবে, অবনীবাবু সেরে উঠুন।

মনঃপূত হ'ল না স্পষ্টই বোঝা গেল।—অবনীবাবু যদি এখন ছ'মাসে সেরে না ওঠেন, ও ফাইল অমনি পড়ে থাকবে?

বড় সাহেবের কথার পিঠে কথা বলতে একমাত্র নরেনই পারে। মাথা নেড়ে সায় দিল সে, ঠিক কথা, ছ'মাসে কেন, অবনীবাবু আর যদি সেরে না-ই ওঠেন—স্পিলওয়ে কি বন্ধ হয়ে যাবে?

বাদল গাঙ্গুলি হার মানল প্রায়—ওরা বুঝি এই করতেই ফাইল দিয়ে তোমাকে পাঠিয়েছে?

কি করবে, ওদের তো বাঁচতে হবে। যাক্, কিছু ভেবো না, ফাইল তোমার দু'দিনেই ঠিক করিয়ে দিচ্ছি।...হঠাৎ কি একটা মতলব এলো যেন মাথায়। উঠতে গিয়েও চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পড়ল আবার। মন্দ হয় না, সান্ত্বনা আকাশ থেকে পড়বে একেবারে। বলল, তুমি তো আচ্ছা বড় সাহেব, রোদে জলে সারা হয়ে ভদ্রলোক অসুখে পড়ে গেলেন, আর এখান থেকে তুমি একটি বার দেখতেও গেলে না তাঁকে?

বিব্রত করাই উদ্দেশ্য। বিব্রত হ'লও—উনি তো এখন ভালো আছেন

শুনেছি—।

তাহলেও একবার যাওয়া উচিত তোমার। তুমি হলে ড্যাম-ফ্যামিলির মাথা—

হেসে উঠল দু'জনেই। বাদল গাঙ্গুলি বলল, গালাগালিটা ভালই দিলে, আচ্ছা আমি যাব'খন।

যেও, আজই যেও। অবশ্য ভালই আছেন এখন তিনি, তবু আশাও তো করে লোকে।

তার মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎই কিছু যেন মনে পড়ে গেল বাদল গাঙ্গুলিরও। মৃদু হেসে বলল, আশা যার করে সে তো রোজই যাচ্ছে বোধ হয়—। পরক্ষণে গম্ভীর মুখে হাতের কাজে মন দিল সে।

মুচকি হেসে নরেন চৌধুরী চেয়ে রইল তার দিকে। কিন্তু না। আর আশা নেই। দ্বিগুণ একাগ্রতায় কাগজপত্র দেখছে—প্রায় রূঢ় মনোযোগে।

চলি। হাত বাড়িয়ে ফাইলটা নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল নরেন চৌধুরী। একটা কাজ মন্দ হ'ল না। সান্ত্বনার চিফ ইঞ্জিনিয়ার দর্শন ঘটবে আজ। ওর তখনকার মুখখানা দেখার লোভ হচ্ছে খুব। কিন্তু দেখতে গেলে সব পণ্ড। পরে বর' শোনা যাবে। কিছু একটা দৃশ্য কল্পনা করেই হয়তো হাসছে আপন মনে।

কিন্তু ভবিতব্য অন্য রকম।

সান্ত্বনার সেদিন মেজাজ চড়া। ছোকরা চাকরটার দেখা নেই তিন দিন। গোরুটার খাবার পর্যন্ত ফুরিয়ে এসেছে। মেজাজ আরো বিগড়েছে অন্য কারণে। পাহাড়ের পিছন দিকেও নতুন রাস্তা বার করা হচ্ছে একটা। যেখানে গোরু বাঁধা হয় তার থেকে অনেকটাই দূরে অবশ্য। বড় একটা পাথরের চাঙ্ ভূমিসাৎ করা হচ্ছে সেখানে। আর থেকে থেকেই সেই বিস্ফোরণের গুরুগর্জনে ভয়ে ত্রাসে এদিকে সেদিকে ছুটে পালাতে চেষ্টা করছে গোরুটা।

ওদিকটা একবার পরিদর্শন করে আপন মনে আসছিল বাদল গাঙ্গুলি। অনতিদূরের নারীকণ্ঠে থমকে দাঁড়াল। খুঁটির সঙ্গে একটা গোরু বাঁধা। মেয়েটি তাকে বোঝাচ্ছে, গোরু বলে গোরু, আচ্ছা গোরু তুই, সেই থেকে শুনছিস ওই শব্দ তবু তো তোর ভয় গেল না! ওখানে শব্দ হচ্ছে তো তোর তাতে কী? ঘুরে ঘুরে দিব্বি খাবি-দাবি মোটা হবি, না ভয়েই ম'লো।

শান্তনেত্রে কথাগুলি শুনে গাভীকন্যা ভারী আশ্বস্ত হ'ল যেন।

চল্ বাড়ি চল্, আমি তো আছি, ভয় কি?

এক হাতে বালতি এবং অন্য হাতে খুঁটি থেকে দড়ি তুলে নিল সান্ত্বনা। অদূরের মানুষটির সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় হ'ল একবার। চেহারাপত্র বেশভূষা এম.

কিছু নয়, যাতে করে এই মেজাজ সত্ত্বেও কৌতূহল জাগতে পারে। ও রকম হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখাটাই বরং বিরক্তিকর আরো। লোকগুলোর স্বভাবই ওই।

ঠিক অমনি সময় আচমকা আবার সেই শব্দ একটা। ভয় পেয়ে গোরুটা দিল ছুট। হাত থেকে দড়ি ফসকে গেল সান্ত্বনার। বালতিটাও ছিটকে পড়ল। আর সামলাতে না পেরে নিজেও হুড়মুড় করে আছাড় খেল একটা।

বাদল গাঙ্গুলি দড়িটা ধরে ফেলে টেনে-হিঁচড়ে ভীতত্রস্ত গোরুটাকে থামালে কোন প্রকারে। তারপর ফিরে চেয়ে দেখে ওই অবস্থা। সান্ত্বনা মাটি ছেড়ে উঠতে পারে নি তখনো।

গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল শেষে। বেশ লেগেছে। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। কাপড় সামলাতে সামলাতে অগ্নিমূর্তিতে গোরুটার সামনে এসে হাত নেড়ে ঝাঁজিয়ে উঠল, চলো বাড়ি চলো আজ,তোমাকে দেখাচ্ছি মজা—পাজী হতচ্ছাড়া ভীতু গোরু—ঘাস খাস কি সাধে!

সামনের লোকটিকে দেখল। শক্ত হাতে গোরুর দড়ি ধরে নিষ্পলক নেত্রে তার দিকেই চেয়ে আছে। অসহিষ্ণু রাগে সান্ত্বনা ভূপতিত বালতিটার কাছে গেল। ক্রুদ্ধ অসহিষ্ণুতায় ত্রস্ত বেশবাস সম্বৃত করে নিল একটু। বালতিটা হাতে তুলে নিল তারপর। সামনে এসে বলল, ওটাকে ধরে একটু এগিয়ে দিতে পারবেন? ওই সামনেই বাড়ি—

নিজের অজ্ঞাতে সামনে পিছনে একবার দেখে নিয়ে বাদল গাঙ্গুলি ঘাড় নাড়ল, পারবে।

হন হন করে ক'পা এগিয়ে গেল সান্ত্বনা। পিছনে দড়ি ধরে গোরু আগলে চলল চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি!

আবারও সেই বিস্ফোরণ।

থমকে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা পিছন ফিরে দেখল। ভয় পেলেও গোরু হাতছাড়া হয় নি। রাগে গরগর করে বলে উঠল, ওঃ ঘটা কত! জল আনছে না তো একেবারে সমুদ্দুর নিয়ে আসছে সব। ভ্রূকুটি করে তাকালো, আপনি ওই ওখানে কাজ করেন?

প্রশ্ন অবান্তর, নিজেই জানে। ড্যামের কাজ ছাড়া আর কোন কাজ নেই এখানে। কিন্তু রাগের মাথায় অতশত খেয়াল নেই সান্ত্বনার।

বাদল গাঙ্গুলি ঘাড় নাড়ল, করে।

ওদের বলে দেবেন মাটির নীচে এন্তার জল আছে, মিথ্যে আর এত হাঁকডাক করা কেন, অমনি করে সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলেই জলে জলময় হয়ে যাবে সব!

মেয়েটি কে, অনেকক্ষণই চিনেছে বাদল গাঙ্গুলি। বলল, জলের জন্য নয়, ওখানে একটা রাস্তা হচ্ছে।

কোমরের ব্যথায় হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, হাঁটু বোধ হয় ছেড়ে গেছে। প্রত্যুত্তর সহ্য হ'ল না।—হ্যাঁ, দলে দলে লোক গিয়ে জলের মধ্যে সাঁতার কাটবে সেই জন্য রাস্তা হচ্ছে!

কেন যে বাদল গাঙ্গুলি একটু বোঝাবার লোভ সংবরণ করতে পারল না সে-ই জানে। মৃদু হেসে বলল, রাস্তা হলে তবে তার পাশ দিয়ে নালা কেটে এখানকার গাঁয়ের দিকে জল পাঠানো যাবে, নইলে—

থাক্ থাক্ থাক্—আপনাকে আর বোঝাতে হবে না, অষ্টপ্রহর এই জলকীর্তন শুনছি।

আবার সে হনহন করে এগিয়ে গেল। অর্ধবিস্মিত কৌতুকে বাদল গাঙ্গুলি অনুসরণ করল তাকে। আনাড়ি হাত বুঝেই গোরুটা যেন এদিক ওদিক যেতে চাইছে। কোন রকমে সে সামলে চলেছে ঠিকই, কিন্তু পায়ে পায়ে অনভ্যস্ততাও প্রকাশ পাচ্ছে।

সান্ত্বনা দাঁড়ায় আবার। নিস্পৃহ অবহেলায় দেখল একবার। দৃষ্টি বিনিময়। এই তো মুরোদ, ড্যাব-ড্যাব করে মেয়েদের দিকে চেয়ে থাকতে ওস্তাদ! বলল, একটা গোরু ঠিকমত চালিয়ে নিয়ে আসতে পারেন না, কোন্ কাজ হয় আপনাদের দিয়ে তাও বুঝিনে। অতটা দড়ি ছেড়ে দিয়ে ধরলে ও তো এদিক ওদিক যেতে চাইবেই, দড়িটা গুটিয়ে নিন আরো।

বেশ একটা বৈচিত্র্য অনুভব করছে বাদল গাঙ্গুলি। নির্দেশমত দড়ি গুটিয়ে গোরুটাকে কাছাকাছি আনা হ'ল।

বাড়ি। পাশের সেই প্রবেশ-পথ দিয়ে সান্ত্বনা আগে আগে চলল। পিছনে গোরু নিয়ে বাদল গাঙ্গুলি। গোয়াল-ঘর। সান্ত্বনার মেজাজ সপ্তমে চড়া তখনো। দুম করে বালতিটা রেখে তার হাত থেকে দড়িগাছা নিয়ে খুঁটিতে গলিয়ে দিল।

কিন্তু এই বন্দী-দশাও গোরুটার খুব পছন্দ নয়। পিছু হটতে চেষ্টা করে মানুষটার গা ঘেঁষে এলো প্রায়। একটু ব্যবধান বজায় রাখতে গিয়ে তাকেও সরতে হ'ল। ফলে এবার তারই পায়ে লেগে বালতি ওলটালো। ভিতরের আহার্য পদার্থ কিছুটা ছড়িয়ে পড়ল। আবার বকুনির ভয়েই হয়তো বাদল গাঙ্গুলি তাড়াতাড়ি মাটি থেকে সেই জলে-খোলে মেশানো পদার্থ দু'হাতের আঁজলায় তুলে নিল খানিকটা।

সান্ত্বনা মুখ ফিরিয়ে দেখল একবার। কিছু না বলে গড়ানো বালতিটা তুলে

নিয়ে গোরুর মুখের কাছে রেখে নতুন করে খাবার যোগান দিতে লাগল।

মাটি থেকে যা তুলেছিল তাই নিয়ে অঞ্জলিবদ্ধ দুই হাতে বাদল গাঙ্গুলি দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। বাড়ির ভিতর থেকে অবনীবাবুর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, সান্ত্বনা এলি—!

এদিক থেকে অসহিষ্ণু জবাব গেল, যাই বাবা যাই! জল আনার যা ঘটা তোমাদের, ভগীরথও গঙ্গা আনতে অত তোড়জোড় করে নি, ভয়ে সুন্দরীটা একেবারে আধমরা হয়ে গেছে।

ওদিক থেকে আবার শোনা গেল, কি বলছিস কিছু শুনতে পাচ্ছি না।

কিছু শুনে কাজ নেই, ওখানে চুপ করে বসে থাকো, আমি আসছি।

সামনের লোকটার দিকে তাকালো একবার। অনেক নাজেহাল হয়েছে। হাঁ করে চেয়ে থাকবার সাধ মিটেছে হয়তো। ঈষৎ সদয় কণ্ঠে বলল, আপনি আর দাঁড়িয়ে আছেন কেন, ওই ওদিকে জল আছে হাত ধুয়ে ফেলুন গে, তার পর বাবার কাছে বসুন গে যান, আমি আসছি—।

ধারণা, ড্যামে কাজ করে যখন—তার বাবাকে চেনেই। হাতের কাজ সেরে না হয় দুটো মিষ্টি কথা বলা যাবে।

হুকুমমত হাতের সেই বস্তু বালতিতে ফেলে বাদল গাঙ্গুলি বাইরে এসে জলের সন্ধানে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। গোয়ালঘরে কণ্ঠস্বর শুনল, গোরুর উদ্দেশে বলছে, তুমি হাড়বজ্জাত হয়েছ, বুঝলে? আছাড় খাইয়ে আমার হাড়গোড় ভেঙ্গে দিয়েছ—নাও গেলো এখন—!

জলের সন্ধানে এসে বাদল গাঙ্গুলি যাঁর সামনে পড়ে গেল তিনি অবনী রায়। ঘর-সংলগ্ন বারান্দার ইজিচেয়ারে অর্ধশয়ান। মুখ খবরের কাগজের আড়ালে। কোন দিক থেকে কে এলো টের পান নি। কাছাকাছি হতে খবরের কাগজ সরালেন। তারপর চেয়ার ছেড়ে শশব্যস্তে দাঁড়িয়ে উঠলেন একেবারে। —স্যর আপনি! এদিকে আসুন স্যর, এদিকে—ভারী সৌভাগ্য আমার!

ওদিকে গোয়ালঘর ছেড়ে সবে বেরিয়েছে সান্ত্বনা। শোনামাত্র স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে গেল সে। একখানি নির্বাক পুতুল যেন। মাথায়ও ঢুকছে না কিছু।

বাদল গাঙ্গুলির হাত ধোয়া হ'ল না আর। হাত দু'টো পিছনে নিয়ে সপ্রতিভ মুখে হাসল একটু।

আসুন স্যর আসুন, ওরে সান্ত্বনা, একটা চেয়ার দিয়ে যা না শীগগির—আপনি এখানে বসুন স্যর—

ব্যস্ত হবেন না, আপনি বসুন—আমি আপনাকেই একবার দেখতে এলাম,

বসুন আপনি, বসুন।

চেয়ার নিয়ে আসবে কি, মাটির সঙ্গে পা আটকে আছে সান্ত্বনার। কোন-রকমে একটা বেতের চেয়ার নিয়ে পিছনে এসে দাঁড়ালো। দেখল, বাবা অনেকটা যেন আজ্ঞাভিভূত হয়েই আবার ইজিচেয়ারে বসে পড়লেন।—চেয়ারটা এগিয়ে দে—এই আমার মেয়ে সান্ত্বনা।

বাদল গাঙ্গুলি ফিরে দেখল তাকে। হকচকিয়ে গিয়ে সান্ত্বনা বলল, ন্-ন-মস্কার—। কণ্ঠস্বর নয়, যেন কান্না বেরিয়ে আসছে গলা বেয়ে।

দু'হাত তুলতে গিয়ে হাতের অবস্থা দেখেই আবার যথাপূর্ব দাঁড়িয়ে বাদল গাঙ্গুলি মাথা নাড়ল শুধু। সান্ত্বনা চেয়ার নিয়ে আর এগোতে পারছে না।

থাক চেয়ারের দরকার নেই। হাত দু'টো তেমনি পিছনে রেখেই অবনীবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কেমন আছেন এখন ?

আমি তো সেরেই গেছি, আপনি মিছিমিছি কষ্ট করে এতটা পথ এলেন···

পিছন থেকে লোকটির দুই হাতের অবস্থা দেখে সান্ত্বনার দুই চক্ষু আরো স্থির। চেয়ার রেখে প্রস্থান করে বাঁচল।

বাদল গাঙ্গুলি বলল, না কষ্ট কি, আগেই আসা উচিত ছিল, আজ নরেন বলতে খেয়াল হ'ল।

আড়াল থেকে সান্ত্বনা কাঠ হয়ে দেখছে আর শুনছে। অবনীবাবু বললেন, নরেনের কাণ্ড—আমি তো দু'চার দিনের মধ্যেই কাজে যাব ভাবছি, আপনি বসুন না একটু, এক পেয়ালা চা অন্তত—

না, এখন চা নয়, আমার তাড়া আছে। আপনি বেশ সেরেউঠুনআগে, এখনি কাজে বেরুবার দরকার নেই। ভালো বোধ করলে দুই একটা ফাইল বরং এখানে আনিয়ে নেবেন। আচ্ছা—

উঠে দাঁড়িয়ে অবনীবাবু নমস্কার জানালেন। বাদল গাঙ্গুলি চলে এলো। বাইরে সিঁড়ির কাছে জল সাবান তোয়ালে নিয়ে সান্ত্বনা অপেক্ষা করছে। দাঁড়াতে হ'ল। দেখল একটু। কে বলবে খানিক আগে এই মেয়ে অমন মেজাজে গোরু আর মানুষ দুইই একসঙ্গে তাড়িয়ে নিয়ে বাড়ি ঢুকেছে। লজ্জা দেবার জন্যই জিজ্ঞাসা করল, পড়ে গিয়ে আপনার তখন লেগেছিল বোধ হয় খুব ?

জলের ঘটি তুলে নিয়ে সান্ত্বনা মাথা নাড়ল, লাগে নি।

সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে সান্ত্বনা জল ঢালতে লাগল। ওর বিব্রত মুখের দিকে চেয়ে আছে বাদল গাঙ্গুলি। বেশ কৌতুক অনুভব করছে।

প্রায় মরীয়া হয়েই সান্ত্বনা বলে ফেলল, আমি···আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।

কি বুঝতে পারেন নি ?

ঢোঁক গিলল সান্ত্বনা। কথা যোগাতে না পেরে তোয়ালে এগিয়ে দিল।

এখন বুঝতে পেরেছেন ?

সান্ত্বনা তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়ল, পেরেছে।

আচ্ছা। হাসি চেপে তোয়ালে তার হাতে ফেরত দিয়ে বাদল গাঙ্গুলি প্রস্থান করল।

সেদিকে চেয়ে সান্ত্বনা দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। বিভ্রান্ত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। গোয়াল-ঘর থেকে গোরুটার হাম্বা-রব কানে এলো। হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল সান্ত্বনার। বেদম হাসি। অফুরন্ত। হাসতে হাসতে সেখানেই বসে পড়ে মুখে তোয়ালে চাপা দিল।

ভিতর থেকে অবনীবাবু ডাকলেন।

হাসি সামলে কোন প্রকারে সাড়া দিল, যাই বাবা।

কিন্তু বাবার কাছেও আসতে পারছে না চট করে। তাঁর সামনেও হেসেই ফেলবে হয়তো। তোয়ালে দিয়ে বেশ করে মুখ মুছে দমটম নিয়ে উঠল সে।

দেখলি আমাদের চিফ্ ইঞ্জিনিয়ারকে ?

সান্ত্বনা নিরীহ মুখে মাথা নাড়ল। মুখে যাই বলুন, চিফ ইঞ্জিনিয়ার দেখতে আসায় অবনীবাবু মনে মনে খুশি খুব। প্রশংসায় মেতে উঠলেন।—এতটুকু অহঙ্কার নেই, শুধু কাজটি হলেই খুশি, আর কাজ বোঝে কত। তুই যদি চট করে একটু চা করে এনে দিতিস।

যেমন স্বভাব, সান্ত্বনা ফস করে বলে বসল, বেশ করে ঘোল খাইয়ে দিয়েছি।

ঘোল। ঘোল কি রে ? কার কথা বলছিস ?

সামলে নিল সান্ত্বনা।—ওই সুন্দরীর কথা, ভীতুর একশেষ, আজ আমায় নাজেহাল করেছে একেবারে। বড় রকমের জিভ কাটল, এই গো বাবা, তোমার ওষুধের সময় পেরিয়ে গেল, নিয়ে আসি আগে।

চপল পায়ে সরে পড়ল সেখান থেকে।

নিজের মধ্যে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছে না সান্ত্বনা। কাউকে না বলা পর্যন্ত ভেতরটা ফুলছে যেন। কাকে বলবে ? বাবাকে ? ও বা-বা। একজনকেই শুধু বলা যেতে পারে। উন্মুখ আগ্রহে নরেনের প্রতীক্ষা করতে

লাগল। কিন্তু আসবেই এমন কোন কথা নেই। সকালে আপিসে নামার আগে বাবাকে দেখে গেছে, না আসাই সম্ভব।

বাড়ি বসে থাকতেও ভালো লাগছে না আর। কোন ছোট্ট পরিসরে ওকে কুলোবে না এখন। বাইরের উন্মুক্ততা যেন টানছে। বাবাকে বলে বেরিয়ে পড়ল। কোন্ দিকে যাবে? যে দিকে লোক নেই। চলল। গোড়া থেকে ভাবতে চেষ্টা করল একবার ব্যাপারটা। কিন্তু ভাববে কি, মনে পড়ে আর নিজের মনেই হেসে সারা। লোকজন নেই এদিকটায় রক্ষা।

এই চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি! কি কাণ্ড! কিন্তু একেবারে হালকা লাগছে ভিতরটা। কিসের একটা আবিষ্টতা যেন কেটে গেছে। মোহগ্রস্ততাও বলা যেতে পারে। বাবা বাবা—অদেখা মানুষ দেখা মানুষকে কতই না ছাড়িয়ে যায়! এরই সামনে পড়ে যাওয়ার ভয়ে কত দিন সে কিনা একেবারে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল। অবশ্য লজ্জায় মরে যাচ্ছিল আজও। কিন্তু সে ওই বিদিকিচ্ছিরি কাণ্ডটা ঘটে গেল বলে। নইলে, হুঁ :—!

পাকা রাস্তা ছেড়ে এবড়োখেবড়ো সংকীর্ণ পাহাড়ী পথ ধরে চলেছে। কতটা এসেছে খেয়াল নেই। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের এম. এ. পড়া মেয়ে ঝরনার কথা মনে পড়ল। আর সেদিনের সেই পার্টির কথাও। এখন আর বেমানান মনে হচ্ছে না একটুও। ওই ভোঁতা চেহারার লোকটির তুলনায় মেয়েটাই বরং বেশি ঝকঝকে। কি হ'ল সেদিন আজ আরো বেশি জানতে ইচ্ছে করছে। নরেনবাবুর সবেতেই বেশি বেশি, গেলেই পারত—

অদূরে মেয়ে গলায় খিলখিল হাসির শব্দে সচকিত হয়ে থেমে গেল সান্ত্বনা। পাহাড়ের ওধারে বিদায়ী সূর্য গা-ঢাকা দিয়েছে। পাহাড়ের রঙ আর আকাশের রঙ এক হয়ে আসছে। এরই মধ্যে নারীকণ্ঠের উচ্ছল হাসিতে আসন্ন প্রদোষের স্তব্ধতা ফেটে চৌচির হয়ে গেল যেন।

পায়ে পায়ে এগলো সান্ত্বনা।—স্বেচ্ছায় নয়। দুর্বার কৌতূহলে। অদূরে একটা বড় পাথরের আড়াল পেরুতেই একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল। পালাতে পারলে পালাতো। কিন্তু আর সুযোগ নেই আড়াল হবারও।

পাগল সর্দারের মেয়ে চাঁদমণি। আর মাঝির ছেলে হোপুন। চাঁদমণির বুকের কাছে ঝুঁকে ছিল। চকিত উঠে দাঁড়াল।

—ই-ই-দিদিয়া! খুশির মাত্রা যেন চতুর্গুণ বেড়ে গেল চাঁদমণির। একটা ছোট পাথরে গা ঢেলে দিয়েছিল। সোজা হয়ে বসল।—ই দিদিয়া! আঁই রে দিদিয়া! মারাংবুরুর রাণীপানা দেখতে লাগছে তুকে—ইদিকে আয় না কেনে!

কি করবে সান্ত্বনা ? সম্ভব হলে উল্টো দিকে ছুটতো। সম্ভব নয়। কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হাসি টেনে জিজ্ঞাসা করল, তুই কি করছিস এখানে ?

বড় করে নিশ্বাস ফেলল চাঁদমণি। কালো চোখের বিদ্যুৎকটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হ'ল হোপুনের ওপর। চোখে মুখে দাঁতের আভাসে তড়িত চপলতার ঝিলিক। ওরাঃ চালাঃ কানাইং—ঘরপানে যেতে লেগেছিলাম—মরদটোর 'দিল্' দেখ কেনে—সনঝে কালে লুব্ ভির মতন পাছু নেছে—লাজ ডর নাই!

কি কুক্ষণে এই ফ্যাসাদের মধ্যে এসে পড়েছে! হতচ্ছাড়ী মেয়েটার জিভ যেন সাপের ছোবল। তবু হোপুনের দিকে একবার না তাকিয়ে পারল না সান্ত্বনা। যে ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেন একটা অপরাধ হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে। বিব্রত, সঙ্কুচিত। মড়াইয়ের পাথরে-কোঁদা পাণ্ডা নয়। নিরস্ত্র বিহ্বল দেউলে মূর্তি।

চাঁদমণির আলো-ঠিকরনো কালো চোখের তারা দুটো বারকতক নেচে বেড়ালো সান্ত্বনার মুখের ওপর। উচ্ছলকণ্ঠে খিলখিল্ করে হেসে উঠল তারপর। তীক্ষ্ণ পাহাড়চেরা হাসি। দেখে লে রে, দেখে লে, দিদিয়ার আঙ্গা মুখ দেখে লে—চান্দো মুখে আগ লেগেছে দেখ্।

এবারে সোজা পৃষ্ঠপ্রদর্শন। পিছনে হাসির দমকে ভেঙ্গে পড়ছে চাঁদমণি। হাসি নয় তো বরফ-গলানো জল! গায়ে কাঁটা দেয় আর অবশ করে ফেলে।

অনেকটা পথ এসে হাঁপ ফেলে বাঁচে সান্ত্বনা। হাঁপিয়েই গেছে। অজানা অনুভূতির স্পর্শ আছে মেয়েটার হাসির মধ্যে। দূরে আসা সত্ত্বেও সেটার অস্বস্তি যেন জড়িয়ে আছে গায়ের সঙ্গে। ধুপ করে বসে পড়ল এক জায়গায়। বড় বড় দম নিল দু'চারটে। হাতের কাছের একটা পাথর কুড়িয়ে নিল। নিজের অজ্ঞাতে হাতের মুঠোয় বারকতক নিষ্পেষণ করতে চাইল ওটা।

তারপর সুস্থ হ'ল, সহজ হ'ল।

কেন মরতে গিয়েছিল ওখানে! ভাবল, জেনেশুনে তো আর যায় নি। কিন্তু নিজের ভিতর থেকেই যেন খোঁচা খেল একটা। জেনেশুনে নয়? ওই নিরিবিলি নির্জন কি একজনের জন্য নাকি? না একা কেউ ওখানে বসে অমন করে হাসে?

রাগ করে পাথরটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল সান্ত্বনা।

মুখে হারমানা হাসির আভাস।

কিন্তু কেনই বা বিয়ে দিচ্ছে না পাগল সর্দার ওদের! লোকটা মেয়েকে যত না, হোপুনকে ভালবাসে তার থেকে বেশি। তবু বিয়ে দিচ্ছে না কেন? জিজ্ঞাসা করলে আনমনা হয়ে কি যেন ভাবে পাগল সর্দার। সেই এক কথাই বলে

তারপর। দেবে। সময় হলে দেবে। সময়ের আর বাকি কত সে তো দেখছে! মড়াই বাঁধার আগে পর্যন্ত গাঁয়ের মাঝি হোপুনের বাবার প্রতিপত্তি কম ছিল না। দিনকাল বদলালেও এখনো ফেলনা লোক নয় সে, মুরুব্বীই বটে। মড়াইয়ের গোলযোগ মিটে যেতে আপস-স্বরূপ সে নিজেই এসে ছেলের জন্য চাঁদমণিকে চেয়েছে। কিন্তু পাগল সর্দার সেই কথাই বলেছে তাকেও। বিয়ে দেবে। কিন্তু এখন নয়। পরে। বেশ অসন্তুষ্ট হয়েই ফিরে গেছে হোপুনের বাবা। হোপুনও খুশি হয় নি।

পাগল সর্দার নিজেই গল্প করেছে সান্ত্বনার কাছে।

হোপুনের বাবার মত সান্ত্বনার একবারও মনে হয় নি, মেয়ে নিয়ে মাঝির ছেলেকে খেলাচ্ছে পাগল সর্দার। বরং মনে হয়েছে, লোকটার বুকের কোথায় যেন মস্ত ক্ষত। কিন্তু বিয়ে যখন দেবেই ঠিক করেছে, দিচ্ছে না কেন? যে দজ্জাল মেয়ে ওর! হেসেই ফেলে সান্ত্বনা। পাজী হতচ্ছাড়ী মেয়ে!

বাড়ি ফিরে সান্ত্বনা দেখে নরেনবাবু বসে আছে বাবার কাছে। অপ্রত্যাশিত নয়। আসতে আসতে ভাবছিলও।

মড়াইয়ে নেমে অনেকদিন পরে আবার সেই পুরানো দিকেই পা বাড়ালো সান্ত্বনা। যন্ত্র-সমাবেশের দিকে নয়। ওর মনোযন্ত্রেরও নতুন কিছুর আমদানি ঘটেছে। তাই চোখ যেদিকে টানছে সেদিকে না গিয়ে মন যেদিকে টানছে সেদিকে এগলো।

দূরে এক জায়গায় হোপুন কাজ করছে। কিন্তু ওর দলের মধ্যে চাঁদমণি নেই। নিজের অজ্ঞাতে সান্ত্বনার দুই চোখ চারিদিকে ঘুরল একপ্রস্থ। হয়তো তার বাবার সঙ্গে আছে, হয়তো বা আর কারো দলে গিয়ে ভিড়েছে। কেন জানি ভালো লাগল না সান্ত্বনার। ঠিক এমনটি প্রত্যাশা করে আসে নি। ওই হোপুন লোকটার দিকেই চোখ গেল আবার। দুই হাতের কোদাল উঠছে মাথার ওপর। লৌহখণ্ডের ধারালো দিকটা সূর্যছটায় ঝকমকিয়ে উঠছে। আর সঙ্গে সঙ্গে চকচক করছে ঘামে ভেজা কালো দেহের পেশল রেখাগুলি। তেমনি ঋজু, কঠিন। আর তেমনই নির্বিকার, নিরাসক্ত।

কে বলবে, বিগত প্রদোষের অতনু-নির্জনে এই সেই ধরা-পড়া বিড়ম্বিত মূর্তি।

সান্ত্বনাকে সেও দেখল, কিংবা, দেখেও দেখল না…।

অনেক দূরে ঘড়ঘড় ঝমর ঝমর শব্দ হচ্ছে একটা। চার্নিং মেসিন চলেছে। সান্ত্বনা এগলো। মাটি থেকে ক্রমশ ওই ওপরে উঠে গেছে চার-পাঁচতলা সমান

উঁচু কন্‌ভেয়ার। আগাগোড়া এক হাত প্রমাণ চওড়া পুরু চামড়ার বেল্ট ফিট করা। অনবরত ঘুরছে। এ মাথা থেকে বেল্ট-এর ওপর পাথরকুঁচি ঠেলে দাও। সড়সড় করে ওপরে চলল। ওপরে ঘূর্ণ্যমান এক বিশাল ইস্পাতের চৌবাচ্ছায় কংক্রীট মিক্‌শ্চার তৈরির ব্যবস্থা। চার্নিং হয়ে গেলে সেটা ক্রেনে করে ঢেলে নিয়ে এসো অতিকায় বাল্‌তির আকারের লোহার 'বাকেট'-এ। এদিক থেকে দেখলে মনে হয়, বেল্টের ওপর দিয়ে মাটি থেকে পাঁচতলা উঁচু একসারি পাথর-কুঁচির অবিরাম শোভাযাত্রা চলেছে। মইয়ের মত একটা খাড়া সিঁড়ি দিয়ে সেখানে ওঠা যায়, কিন্তু একটু পা ফসকালেই সব শেষ। আর ওঠা যায় ক্রেনের সঙ্গে 'কেজ্' ফিট করে। কর্মচারীবা সচরাচর কেজ্-এ করেই ওঠে। সান্ত্বনার ভিতরটা উসখুস করে সেখানে উঠে সব দেখার আগ্রহে। ওই মইয়ের মত খাড়া সিঁড়ি বেয়েই অনায়াসে উঠতে পারে সে। লোকজন হাঁ হা করে উঠবে তাহলে। কিন্তু সুযোগ সুবিধে পেলে ওখানে একদিন উঠবেই ও। ঠিক উঠবে।

নমস্কার।

এত কাছে, সান্ত্বনা চমকে উঠল প্রায়। নীল চশমা, হীরের আংটি, খাকী ট্রাউজার, সিল্কের বুশ শার্ট।

ঘোষ-চাকলাদারের রণবীর ঘোষ।

প্রত্যভিবাদন। প্রথম সাক্ষাতের সেই আড়ষ্ট সঙ্কোচ ভোলে নি সান্ত্বনা। যেমন ওর বুদ্ধি। আজ তো মুখের দিকে এক নজর চেয়েই বুঝেছে কম করে বছর চল্লিশ বয়স হবে এই ভদ্রলোকের। হেসে বাক্যালাপ শুরু করে দিল সান্ত্বনা।—এদিকটায় বুঝি আপনার কাজকর্ম ?

হ্যাঁ, আজ একেবারে আমার রাজত্বে এসে পড়েছেন।

আগেও এসেছি। উঁচু সেই ঘরের মত এলিভেটারের দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা ওখানটায় ওঠা যায় না ?

কেন যাবে না, ওই তো উঠছে ওরা। আপনাকে কেজ্-এ করে এক-দিন তুলব'খন।···আপনি আমার গোডাউনও দেখেন নি বোধ হয় ?

না তো, কোথায় সেটা ?

মাইল দুই হবে এখান থেকে। জিপে যেতে হবে, চলুন একদিন—মস্ত মস্ত সিমেণ্ট আর বালুর পাহাড় দেখতে পাবেন।

সান্ত্বনা সাগ্রহে রাজী। কবে নিয়ে যাবেন ?

যেদিন খুশি, আজই চলুন না।

দু'দশ পা এগিয়েছে। মনে মনে সান্ত্বনা জল্পনা করে নিচ্ছে আজ যাওয়া চলে

কিনা। কাছেই একটা এবড়োখেবড়ো নিচু জায়গার ওপর চোখ পড়ল। আরো এগোল খানিকটা। ছোট একটা পাম্প বসিয়ে জল ছেঁচছে জনা-দুই লোক। আর ঝুড়িতে পাথরের নুড়ি বোঝাই করে করে দূরে ফেলে দিয়ে আসছে পনের বিশটি মেয়ে। এদের কারোরই বয়স বেশি নয়। এখানে চাঁদমণিকেও দেখা গেল।

পাশ থেকে রণবীর ঘোষ জানালো, কাটাকুটিতে জল উঠছে, ওখান থেকে পাথর না সরালে হাত-পা ভাঙ্গার ভয় আছে বলে মেয়েগুলোকে এ কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কানে গেল না সান্ত্বনার। ঝুড়ি হাতে চাঁদমণি নিষ্পলক চেয়ে আছে এদিকেই। তার কালো চোখে যেন সাদা আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে।

তদারকরত কুলিবাবু তাড়া দিল, দাড়িন পড়লি কেনে, গপাগপ তুলে লে।

চাঁদমণি ঝাঁজিয়ে উঠল তাকেই, ধমকাইছিস কিসের লেগে, হাকোপাকো (মুহূর্ত) বিরাম লিব নাই?

এক পাও নড়ল না। জ্বলন্ত দুই চোখ এদিকেই নিক্ষিপ্ত হ'ল আবার। চলতে চলতে পিছন ফিরে তাকালো সান্ত্বনা। চাঁদমণি দাঁড়িয়েই আছে। সান্ত্বনা অবাক। কাল কি দেখেছিল আজ কি দেখছে! কাল বরং রাগতে পারত। উল্টে হাসির বন্যায় নাকানি-চোবানি খাইয়েছে ওকে। কিন্তু আজ কি হ'ল—?

যাবেন নাকি আজ গোডাউন দেখতে?

অ্যাঁ! আত্মস্থ হয়ে সান্ত্বনা তাকালো তার দিকে। অভ্যস্ত অন্ধকারে হঠাৎ একটা জোরালো আলো জ্বলে উঠলে যেমন হয়, চোখে চোখ পড়তে তেমনি একটা ধাক্কা খেল সান্ত্বনা।

নীল চশমাটা রণবীর ঘোষের হাতে। চেয়ে আছে। চেয়েই ছিল। সান্ত্বনা লক্ষ্য করে নি এতক্ষণ। চাউনি নয়, অজ্ঞাত একটা নগ্নতার স্পর্শ লাগল যেন ওর চোখে মুখে সর্বাংগে। দৃষ্টি নয়, লেহন।

না আজ না, আর একদিন যাব'খন। সবলে সেই পিচ্ছিল দৃষ্টিরজ্জু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিল সান্ত্বনা। পাশাপাশি ব্যবধান বাড়ল।

আজ কাজ আছে বুঝি?

বাবার শরীর খারাপ—বাড়ি যেতে হবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছিলাম বটে তিনি অসুস্থ। অন্তরঙ্গ দুশ্চিন্তা রণবীর ঘোষের, তিনি সেরে ওঠেন নি এখনো?

উঠেছেন—

আচ্ছা, আজ থাকি তাহলে, তাড়া কি! চলুন, আমরাও ওদিকেই কাজ

আছে একটু।

দৃষ্টি বিনিময় ঘটল আবারও। ঘটবে জেনেও না তাকিয়ে পারল না সান্ত্বনা। অসহায় বোধ করছে কেমন। দিন দুপুর। এত বড় মড়াইয়ে এত লোক কাজ করছে। তবু—। পুরুষের চোখে কামনার দাহ এ বয়স পর্যন্ত একেবারে দেখে নি এমন নয়। কিন্তু এ সেরকম নয়। অস্বস্তিকর সিক্ত অনুভূতি একটা। না তাকিয়েও তার চাউনিটা যেন উপলব্ধি করছে সান্ত্বনা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে ওকে। খুটিয়ে আস্বাদন করার মত। যেটুকু বস্ত্র গায়ে জড়িয়েছে এ দৃষ্টির সামনে সেটুকু যেন যথেষ্ট নয়।

বাঁচা গেল।

ওই অদূরে পাগল সর্দার দাঁড়িয়ে। একলা নয়, দলের সঙ্গে। সান্ত্বনাকে দেখেছে। দেখে হাতের কাজ থামিয়ে এদিকে চেয়ে আছে। অবশ ভাবটা নিমেষে কেটে গেল সান্ত্বনার।

আপনি যান, আমি একটু পরে যাব।

হন হন করে একেবারে সর্দারের কাছে গিয়ে থামল সে। হাঁফ ধরে গেছে। ভিতরে ভিতরে ঘেমেও গেছে।

কিন্তু সর্দারের দিকে চেয়ে বিব্রত বোধ করছে আবার। নিরক্ষর বৃদ্ধের এক-জোড়া সন্ধানী প্রাজ্ঞ চোখ বারকতক যেন শিথিল ভাবে বিচরণ করে ফিরল ওর মুখের ওপর। তারপর, অদূরে রণবীর ঘোষ যেখানে দাঁড়িয়ে এখনো, সেইদিকে। তার নীল চশমা চেখে উঠেছে।

সান্ত্বনা বিমূঢ় আবারও। দৃষ্টি নয়, অকস্মাৎ যেন ছোট দুটো কয়লার টুকরো ধক্‌ধকিয়ে উঠেছে পাগল সর্দারের চোখের কোটরে। ধীরেসুস্থে আবার চলতে শুরু করেছে রণবীর ঘোষ। পাগল সর্দার চেয়েই আছে।

ফিরে তাকালো খানিক বাদে। ঠাণ্ডা হয়েছে। স্নেহসিক্তও যেন। সামনের ফাঁকা জায়গাটা দেখিয়ে বলল, টুকচি বসে লিই—।

দু'জনেই এসে বসল মাটির ওপর। সর্দার জিজ্ঞাসা করল, উবাসীরবাবুর শরীল আরাম হ'চ্ছে?

সান্ত্বনা ঘাড় নাড়ল, হয়েছে।

তু ইদিকে কোথা যেয়েছিলি?

কোথাও না, এমনি ঘুরছিলাম।

একটু থেমে সর্দার জিজ্ঞাসা করল, উ কন্‌টাটর বাবুর সঙ্‌তে?

চকিতে একবার তার দিকে তাকিয়ে সান্ত্বনা জবাব দিল, না, ওখানে

দেখা হ'ল।

তু আমার থানে ছুট্‌টে আসলি কিসের লেগে, উ কি বুলল বট্‌টে ?

আবার তাকালো সান্ত্বনা।—ছুটে আবার কোথায় এলাম ? তোমাকে দেখেই তো এলাম। কি ভেবে পরের প্রশ্নটার জবাব দিল।—উনি বলছিলেন আমাকে একদিন তাঁর গোডাউন দেখাতে নিয়ে যাবেন।

চুপচাপ কিছুক্ষণ।—তু যাস না দিদিয়া, আমি একটো দিন তুকে সেটো দেখিয়ে লিয়ে আসব ··।

যাবে না তো বটেই। কিন্তু সান্ত্বনা উন্মুখ আরো কিছু শোনার জন্য।

রেখে ঢেকে কথা বলতে জানে না ওরা। নিজে থেকেই সর্দার জানালো অনেক কথা।—খুব 'ভদ্দ মুনিষ' নয় ওই বাবুটি, 'চি-লোকের' মান মর্যাদা রাখতে জানে না—ফাঁক পেলেই সোমত্ত মেয়েগুলোকে বিগড়ে দেয়—এই নিয়ে খুব গণ্ডগোলও পাকিয়ে উঠেছিল একবার, ইত্যাদি—।

সান্ত্বনার লজ্জা গেছে। উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল, ওর নামে মুরুব্বীদের কাছে নালিশ করো না কেন তোমরা ?

পাগল সর্দার সখেদে জানায়, তাও করা হয়েছিল, কিন্তু মুরুব্বীদের কাছে ও অন্যায় অন্যায় নয়, বড় সাহেব শুধু কাজই বোঝে, মেয়েদের দাম বোঝে না।

বড় সাহেব অর্থাৎ চিফ ইঞ্জিনিয়ার। সর্দারের ক্ষোভ সান্ত্বনাকে স্পর্শ করল যেন। গা-ঝাড়া দিয়ে সর্দার তার বক্তব্যটুকুই ফিরে বলল আবার।—উনি সঙ্‌তে তু যাস না দিদিয়া, বোঝলি ?

মুখে ফুটে সান্ত্বনা বলতে পারল না কিছু। কিন্তু মাথা নেড়ে সায় দিল তৎক্ষণাৎ। বুঝেছে, যাবে না—।

মডাইয়ের গহ্বর থেকে ওপরে পা দিয়েই সান্ত্বনা আড়ষ্ট হয়ে গেল আবারও। জায়গাটা এমন নয় যে কাউকে পরিহার করে চলতে চাইলেই চলা যায়। পাঁচটা পথ নেই আনাগোনা চলাফেরার।

অদূরে রণবীর ঘোষ দাঁড়িয়ে কথা বলছে কার সঙ্গে।

সান্ত্বনা ধরে নিল লোকটা ইচ্ছে করে দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষা করছে। এতেই কাজ হ'ল। আড়ষ্টতা গেল। দ্বিতীয় পথ নেই যখন, পাশ কাটাতে হবে। ভয়টা কিসের।

এবারও সহাস্যেই আপ্যায়ন করল রণবীর ঘোষ। —এই ফিরছেন নাকি ?

হ্যাঁ-না সান্ত্বনা কিছুই বলল না।

আমিও আটকে গেলাম, চলুন। এক মিনিট, এঁর সঙ্গে আপনার আলাপ হয় নি, আমার পার্টনার দ্বিজেন চাকলাদার।

সান্ত্বনা দেখল। চিনল। জিপের সেই দ্বিতীয় লোকটি, যে তাকে সামনের আসন ছেড়ে দিয়ে পিছনে গিয়ে বসেছিল। কিন্তু এদের কারো সঙ্গেই আর আলাপ করার জন্য ব্যগ্র নয় সে। প্রতি-নমস্কারে হাত তুলল কি তুলল না।

পড়ন্ত রোদে রণবীর ঘোষের নীল চশমা বুক-পকেট আশ্রয় করেছে। কলমের ক্লিপের মত তার একটা ডাঁটি পকেটের বাইরে ঝুলছে। ওভাবে তখন হঠাৎ ওই সর্দার লোকটার কাছে চলে যাওয়ায় বা এখানকার এই নির্বাক পরিবর্তনে কিছু উপলব্ধি করেছে কিনা সে-ই জানে। চোখের সেই নগ্ন দৃষ্টি গেছে। বেশ হাসিখুশি মেজাজেই সঙ্গ নিয়ে বলল, বাবার শরীর খারাপ, তাড়াতাড়ি বাড়ি যাবেন বলেছিলেন তখন—এই তাড়াতাড়ি?

সান্ত্বনা নিরুত্তর। কিছু বলতে পারলে বলত। একটু হাসতে পারলে হাসত অন্তত। কিন্তু কিছুই পারল না। ওদিকে দ্বিজেন চাকলাদারও নীরব। রণবীর ঘোষ বলল আবার, চলুন, ওই সামনেই জিপ রয়েছে।

সামনেই মানে বাঁকের মুখে ভুতুবাবুর দোকানের সামনেই।

মনে মনে আবারও যেন বাঁচল সান্ত্বনা। ভয় না হোক অস্বস্তি যাবে কোথায়! নারী-চেতনার অস্বস্তি! এভাবে ও চেতনার মুখোমুখি আর বড় হয় নি কখনো। কিন্তু জবাব না দিলে নয় এবার। বেশ সহজ ভাবেই বলল, আমার যেতে ঢের দেরি এখনো, আপনারা যান।

রণবীর ঘোষ একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল ওকে। দু'চার মুহূর্তের বিশ্লেষণী দৃষ্টি।—এখানে আবার কোথায় যাবেন?

কাজ আছে। মনে মনে নিজেই বিস্মিত হ'ল সান্ত্বনা। হাসতেও পারল যতটুকু হাসা দরকার।

দোকানের বাইরে দাঁড়িয়েছিল ভুতুবাবু। তার স্থির চোখ দু'টো আরো বেশি গোল দেখাচ্ছে। চেয়েছিল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে। এদের সঙ্গে দেখবে সান্ত্বনাকে ভাবে নি যেন। আরো কাছাকাছি হতে এদেরও চোখে চোখ পড়ল বোধ হয়। তাড়াতাড়ি আড়ালে চলে গেল ভুতুবাবু।

তারা জিপের দিকে এগোতে সান্ত্বনা ঘুরে দাঁড়াল। রণবীর ঘোষও থেমে গেল। ও, এইখানে আপনার কাজ বুঝি?

ঘাড় নেড়ে সান্ত্বনা রাস্তা পার হয়ে ভুতুবাবুর দোকানের দিকে চলল। খুব

নিশ্চিন্ত নয় এখনো। ভুতুবাবুর দোকান সকলেরই জন্য খোলা। আড়াল হলেও ভুতুবাবু লক্ষ্য করছিল ঠিকই। থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়াল।—মা-লক্ষ্মী! আসুন, আসুন—

ভিতরের দিকে কোণের একটা বেঞ্চ-এ ধুপ করে বসে পড়ল সান্ত্বনা।—কই, চা দিতে বলুন!

বিলক্ষণ, বিলক্ষণ! সাবান দিয়ে তাড়াতাড়ি ভুতুবাবু নিজেই একটা গেলাস পরিষ্কার করতে বসে গেল।

আড়চোখে সান্ত্বনা দূরে শালগাছের নিচে জিপটাকে দেখছে। উৎকর্ণ।—স্টার্ট শোনা গেল। জিপ চড়াই ভেঙে চলল।

নিশ্চিন্ত। ফিরে দেখে চা তৈরি শেষ ভুতুবাবুর। হেসে বলল, পয়সা নেই কিন্তু সঙ্গে, কাল এনে দেব।

পানখাওয়া পুরু কালো জিভ বার করে মাথা ঝাঁকালো ভুতুবাবু। সান্ত্বনার কথাগুলি ঝেঁকেই কান থেকে বার করে দিল যেন। চায়ের গেলাস তার সামনে রেখে বলল, আপনাদের চাট্টি খেয়ে-পরেই বেঁচে আছি মা-লক্ষ্মী, তা'বলে এ রকম বললে ভুতু ছেড়ে ভূতেও লজ্জা পাবে—।

নরেনবাবু শুনলে বলতো 'ঘুঘু'। কিন্তু এর মুখে মা-লক্ষ্মীটুকু শুনতে বেশ লাগে। আজ এই মুহূর্তে তো রীতিমত আপন জন মনে হচ্ছিল সান্ত্বনার। চায়ের প্রয়োজন ফুরোলেও গেলাসটা সাগ্রহেই টেনে নিল।

দ্বিধা কাটিয়ে ভুতুবাবুই প্রশ্ন করল প্রথম।—এনাদের সঙ্গে বুঝি আলাপ-পরিচয় আছে মা-লক্ষ্মীর?

কাদের সঙ্গে? চায়ের রূপ নিরীক্ষণ করছে সান্ত্বনা।

এই ঘোষবাবু আর চাকলাদারবাবুর কথা বলছিলাম, একসঙ্গে আসছিলেন মনে হ'ল—

একটু-আধটু। দু'চার চুমুকে গলা ভিজল। আপনিও চেনেন বুঝি ওঁদের?

বিলক্ষণ! ভুতু আর কা'কে না চেনে এখানে? আর ওঁদের তো—থেমে গেল—তা বেশ লোক, লাখো লাখো টাকা কামাচ্ছেন, খরচেও অকেপণ—বিশেষ করে ওই ঘোষবাবুটি যাকে বলে দিলদার মানুষ।

শুনলে নরেনবাবু যা বলত ভেবে এখন একটু খটকা লাগছে। দূর থেকে ওই দু'জনের সঙ্গে ওকে দেখে লোকটার সেই নিষ্পলক বিস্ময় ভোলে নি সান্ত্বনা। তার আড়াল হওয়াটুকুও নয়। চা নিঃশেষ হ'ল। যে প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলার কথা সেদিকেই ঝুঁকল সান্ত্বনা। উনুনের ছাই খুঁচিয়ে আঁচ তোলার মতই

ফস্ করে ভুতুবাবুকেও একপ্রস্থ খুঁচিয়ে দিল যেন।—কিন্তু আপনাদের পাগল সর্দারের মুখে তো শুনলাম ওই ঘোষবাবুটি মোটেই ভালো লোক নন!

নড়েচড়ে কিছুটা টান হয়ে বসল গোলগাল ভুতুবাবু। আল্‌গা স্তুতির ছাই কিছু ঝরেও পড়ল নিজের অগোচরে। গলা নামিয়ে সাগ্রহে বলল, বলেছে বুঝি? কবে? আজ? তার পরেও আপনি—ব্যাপারটা কি জানেন, অঢেল পয়সাওলা লোকের একটু-আধটু যেমন ইয়ে—

কি বলবে আর কি বলবে না ঠিক না পেয়ে হাঁসফাঁস করে থেমেই গেল। থেমে গিয়ে মনে হ'ল, যেটুকু বলেছে বলা উচিত হয় নি। মেয়েটাকে বেশ হাসিমুখে এদের সঙ্গে আসতে দেখেছিল—কোন্ কথা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় ঠিক কি! গলা চড়িয়ে দিল।—তা ও ব্যাটারা তো বলবেই, নিজের ঘর সামলাতে পারিস না, যত দোষ বাইরের লোকের! নিন্দে করিস, দুধের মেয়ে রেখে সেই কোন্ যুগে তোর নিজের বউ পালায় নি ঘর ছেড়ে? আর তোর মেয়েটাই বা কি. একসঙ্গে দশটা লোকের মুণ্ডু চট্‌কে বেড়াচ্ছে—সেবারে বাপের হাতে হাড়ভাঙা পিটুনি খেয়ে ঢিট হয়েছে, নইলে ওই বাহাদুর জমাদারটার সঙ্গেই তো প্রায়, যাক্‌গে—

পাগল সর্দারের জীবনে গভীর অঘটন কিছু আঁচ করেছিল সান্ত্বনা। কিন্তু বাহাদুর সংশ্লিষ্ট চাঁদমণির প্রসঙ্গটা প্রচণ্ড বিস্ময়। স্থান কাল ভুলে হাঁ করে চেয়ে রইল ভুতুবাবুর মুখের দিকে। লজ্জা বা সঙ্কোচের অবকাশও নেই।

ভুতুবাবু বলে গেল, ওদের পূর্বপুরুষেরা হাঁসের লোভে পায়রার লোভে খেলনাপাতির লোভে ঘর বাড়ি বিকিয়েছে জাত কে জাত—সেপাই বেয়ার পাহারাওয়ালার সঙ্গে আজতক তিন-তিনটে মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে এই দেড় বছরের মধ্যেই। সেই মেয়েগুলো ঠিক ওদের জাতের নয় অবশ্য, কতই তো আছে এখানে—রঙচঙে শাড়ি আর ঠুনকো গয়না পেলে দু'চারখানা, অমনি চলল ঘর-বাড়ি ছেড়ে। আর পেত্যেক বারই পেথমে দোষ চাপাবে বাবুদের ঘাড়ে—যেন ওই কত্তেই আছে বাবুরা! গেল বার এই নিয়ে গোল পাকিয়ে উঠতে বড় সাহেব কশে ধমকে দিয়েছে সক্কলকে—সমঝে চলতে না পারলে মেয়েদের ঘরে আটকে রেখে দাও গে যাও, কাজ করতে হবে না—বড় সাহেবের কাছে ও সব মেয়েটেয়ের কোন খাতির নেই, বুঝলেন?

তড়বড় করে এতগুলো কথা বলেও ভুতুবাবু একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারত না বোধ হয়। সান্ত্বনার নির্বাক মুখের ওপর দুই গোল চক্ষু সংবদ্ধ হ'ল আবার—এই তুমি কারো নিন্দের মধ্যে নেই, বুঝলেন? নিজেরা সামলে-সুমলে থাক না যে ভাবে খুশি, কে তোদের বারণ করেছে—মিথ্যে নিন্দে কত্তে যাস কেন—যা

বলব হক্ কথা বলব, নিন্দে কেন করব, কি বলেন মা-লক্ষ্মী ? এই এতগুলো কথা হ'ল, একটা নিন্দের কথা কারো নামে বলেছি—আপনিই বলুন ?

এত কথার সার কথাটা এতক্ষণে স্পষ্ট হ'ল। সান্ত্বনা মাথা নেড়ে নীরবে আশ্বাস দিল তাকে, নিন্দে কারো করা হয় নি বটে। কিন্তু ভালও লাগছে না আর। উঠে পড়ল। নিশ্চিন্তে এবার বাড়ি ফেরা যাবে বোধ হয়।

চড়াইয়ের মাঝামাঝি এসে পাহাড়ের ধার ঘেঁষে অতল মডাইয়েব দিকে চেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। দূরে দূরে ওই মানুষেরা কাজ করছে। আর ওদের মেয়েরা। এত উঁচু থেকে মেয়ে-পুরুষের তফাত বোঝা যায় না খুব। পাগল সর্দারের ক্ষোভটুকু সান্ত্বনার মন থেকে মোছে নি তখনো। ভূতুবাবুর মুখে বড় সাহেবের অনুশাসনের কথা শুনে বরং বেড়েছে আরো। নিবিড় মমতায় সেই দূরের দিকে দৃষ্টি পড়ে রইল।—ওই মানুষদের রীতি আলাদা। নারী-পুরুষ এক সঙ্গে কাজ করে। ঘরেবাইরে, পাশাপাশি, কাছাকাছি। ওদের এই আনন্দ, এই বিনিময়টুকু বিশেষ করে স্পর্শ করে তাকে। লোভের বিষ ছড়িয়ে কলুষিত করা যেমন জঘন্য অপরাধ, নিস্পৃহ অনুশাসনের ভ্রূকুটিতে তাকে ব্যাহত করাও তার থেকে কম নিষ্ঠুরতা নয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্তত সেই রকমই মনে হ'ল সান্ত্বনার।

—ছয়—

ছুটির দিন নয়। তবু মস্ত একটা মাছ এনে হাজির নরেন চৌধুরী। এই বেখাপ্পা জায়গায় টাটকা মাছ কমই জোটে। রেফ্রিজারেটারের কল্যাণে এক-বারের চালান পাঁচ-সাত দিন চালায় এখানকার মাছের কারবারী। তাই সামনা-সামনি লোভনীয় কিছু পেয়ে গেলে ছুটির দিন হোক আর যেদিন হোক নরেন চৌধুরীর পক্ষে লোভ সামলানো দায়।

নতুন নয়। এ রকম আরো হয়েছে। সান্ত্বনা খুব একপ্রস্থ বকাঝকা করে দাওয়ায় বসে সেই মাছ কোটা প্রায় শেষ করে এনেছে। অবনীবাবু সকালের আপিসে বেরুবার উদ্যোগ করছিলেন। তাঁর সঙ্গে আপিস সংক্রান্ত কিছু দরকারী কথাবার্তা সেরে ফিরে এসে নরেন বলল, যাক্, তোমার পিতৃদেবকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ইস্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া গেল, এখন বাবা নিশ্চিন্দি!

আপনার ইস্কুল নেই ?

হতাশ নেত্রে তার দিকে চেয়ে থেকে নরেন বলল, এট্ ট্যু ব্রুটাস! তোমার বাবাকে বলে দিলাম একটু বাদে যাব—এই মাছ রেখে এক্ষুনি যাই কি করে

বলো!

আ-হা, তা তো বটেই। চুপটি করে এবার ওই মোড়ায় বসে থাকুন, আমায় কাজ করতে দিন, নয়তো আপনার মাছ আবার জলে গিয়ে সাঁতার কাটবে।

হৃষ্টচিত্তে মোড়ায় আসন পরিগ্রহ করল নরেন চৌধুরী।—বেশ। কিন্তু আমি তা হলে মুখ বুজে বসে এখন কি করব?

কান কুড়কুড় করুন।

মস্ত এক সমস্যার সমাধান হ'ল যেন। পকেটে হাত ঢুকিয়ে নরেন হাতীর দাঁতের কানকাঠি বার করল। তারপর সন্তর্পণে সেটা কর্ণপটহে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে গোটাকতক সেই অদ্ভুত শব্দ বার করল গলা দিয়ে। হাসতে হাসতে সান্ত্বনা বঁটির ওপরেই পড়ে আর কি! কি বিচ্ছিরি স্বভাব, মা গো!

এই! এই মেয়ে! কেটে এক্ষুনি রক্তগঙ্গা হবে যে! থাক্ বাবা, এই আমি রেখে দিচ্ছি কানকাঠি। সাধে কি সবাই ছেলেমানুষ বলে!

ছদ্ম-কোপে সান্ত্বনা তাকালো তার দিকে, কে বলে?

ওই ওরা—

কারা?

ওই ড্যাম কলোনীতে যারা কাজ করে, যারা মাটি কাটে, যারা ইট চুন সুরকি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে তারা—তাদের সঙ্গেই বেশি ভাব কিনা তোমার।

মিথ্যেবাদী! আবার মাছ কাটায় মন দিল সান্ত্বনা।

নরেন দেখছে।—সেদিনের মত দৈ-মাছ হবে তো?

হুঁ।

আর মাছের পোলাও?

হবে।

আর মাছের চপ?

হবে হবে হবে—বাবা রে বাবা, একেবারে পেটুকরাম গোস্বামী! নামকরণের ফুর্তিতে নিজেই হেসে উঠল খিলখিল করে।

হাসির ধার দিয়েও গেল না নরেন। গম্ভীর মুখে প্রস্তাব করল, একটা ছুতোনাতায় আজ তাহলে আপিসটা কামাই করে দিই, কি বলো?

তা হলে কিচ্ছু হবে না। সেবারের মত ঠিক একটায় গাছতলায় বসে লাঞ্চ খাবেন।

কিন্তু নরেন চৌধুরীর এই অবসর বিনোদনের আনন্দে ছেদ পড়ল একটু পরেই।

কড়া নাড়ার শব্দ হ'ল বাইরে।

সান্ত্বনা উঠে দেখতে গেল।

ভৃত্যশ্রেণীর একজন লোক দাঁড়িয়ে। সান্ত্বনা চেনে তাকে। অনেকদিন তার পিছনে পিছনে অথবা আগে আগে টিফিন ক্যারিয়ারে করে মনিবের খাবার নিয়ে নামতে দেখেছে। লোকটার ভাবভঙ্গী চালচলনে একটা গুরুগম্ভীর আত্ম-মর্যাদার ভাব দেখে ডেকে আলাপ করে নি কখনো। সকৌতুকে নিরীক্ষণ করেছে শুধু। বড় সাহেব অর্থাৎ চিফ ইঞ্জিনিয়ারের খাস চাকর নিধুরাম। নরেনের মুখে ওর গল্প শুনেছে সান্ত্বনা। বহুকাল ধরে আছে এবং প্রভুর হাবভাব চালচলন সযত্নে অনুশীলন করে আসছে।

নরেনবাবু এখানে আছেন দিদিমণি ?

সান্ত্বনা ঘাড় নাড়ল।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল নিধুরাম।—সায়েবের চিরকুট নিয়ে আমি তামাম বাজ্যি উঁয়াকে খুঁজতেছি। একবার ডেকে দেন।

সান্ত্বনা হাত বাড়াল, আমায় দাও, আমি দিচ্ছি।

ফিরে এসে সেটা নরেনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এই নিন আপনার।

কে দিলে ?

ভগীরথবাবুর চাকর নিধু।

কিছু না বুঝেই নরেন চিরকুটটা নিয়ে পড়ল। বড় করে একটা নিরুপায় দীর্ঘ-শ্বাস ফেলতে গিয়ে থেমে গেল। বিস্মিত নেত্রে তাকালো, ভগীরথবাবু মানে ?

নিরীহ মুখে ফিরে তাকাল সান্ত্বনা। নরেন চৌধুরী হা হা করে হেসে উঠল।—তোমার সাহস তো কম নয়! বিলেত জার্মান ফেরত চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে সেদিন ওই কাণ্ড করলে, আজ আবার তাকে বলছ ভগীরথবাবু!

সেদিনও বলেছিলাম। সান্ত্বনা হেসে ফেলল, আমার কি দোষ, আমি কি গুনে জানব উনি বড় সাহেব—কোট-প্যাণ্টের যা ছিরি, ওর থেকে আপনাকেই অনেক বড় সাহেব মনে হয়।

ঠাট্টা হচ্ছে! কিন্তু সেদিনের কথাবার্তায় তো মনে হ'ল বড় সাহেব ওই রকম বলেই বেশি পছন্দ তোমার।

সান্ত্বনাও ছাড়বার পাত্রী নয়। স্বীকার করে নিল, পছন্দই তো। সুন্দরীর জন্য ওঁকেই রাখব ভাবছি, ঐ ছোঁড়াটা বেজায় ফাঁকি দেয়। হাত অবশ্য কাঁচা, তা হলেও গায়ে জোর-টোর আছে, পারবে'খন।

যাকে নিয়ে এই হাসি-ঠাট্টা, তার চিরকুটের তাগিদটুকু তা বলে ভোলা চলে

না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নরেন চৌধুরীকে উঠতে হ'ল।—যাই বাবা এক্ষুনি হয়তো আবার দ্বিতীয় দফা পেয়াদা এসে হাজির হবে।

সান্ত্বনা হালকা নিঃশ্বাস ফেলল একটা। এই মানুষটির আচরণে এতটুকু ব্যতিক্রম দেখে নি কখনো। ভালো লাগতো। এখনো লাগে। কিন্তু কোথায় যেন তফাত একটু। এতক্ষণ তার এই বসে থাকাটা শুধু মাছের আকর্ষণে কি না আগে একবারও মনে হ'ত না। কিন্তু এখন হয়। তফাত এখানেই। সব-প্রথম মাসি ওকে সমঝে দিয়ে গেছে। তারপর চাঁদমণি আর হোপুনের নিভৃত-বিনোদনের ছাপটা চেষ্টা করেও তাড়াতে পারে নি মন থেকে। আর নিজের সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি ওকে সচেতন করেছে মড়াইয়ের বুকে কণ্ট্রাক্টর রণবীর ঘোষের সেই নগ্ন দৃষ্টিলেহন। সব মিলিয়ে সান্ত্বনার ভিতরে ভিতরে পরিবর্তন হয়েছে একটু। এই পরিবর্তনের উপলব্ধিটুকুই অস্বস্তির কারণ।

একটা বাজার কিছুক্ষণ আগে সান্ত্বনা দুই হাতে দুই টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কাঁধেও একটা থলে ঝুলছে। মেন কোয়ার্টারস্ ছাড়িয়ে একটু নেমে আসতেই হঠাৎ চোখে পড়ল অদূরে টিফিন ক্যারিয়ার হাতে আর একটি লোকও হেলে দুলে চলেছে। নিধুরাম।—ডাকল, ও নিধু, বাবুর খাবার নিয়ে যাচ্ছ ?

ডাক শুনে নিধুরাম দাঁড়িয়ে পড়ল। সান্ত্বনা কাছে আসতে একগাল হেসে জবাব দিল, হ্যাঁ গো দিদিমণি, তুমিও খাবার নিয়ে যাচ্ছ ?

যেন একই কাজ দু'জনার। খুশি মুখে সান্ত্বনা বলল, হ্যাঁ, বাবার আর নরেনবাবুর। ভালোই হল, চলো তোমার সঙ্গে যাই।

অত বড় বড় দুটো টিফিন-কার নিয়ে তোমার কষ্ট হচ্ছে না ? একটা বরং আমায় দাও—

সান্ত্বনা জবাব দিল, কিচ্ছু কষ্ট হচ্ছে না, নামার সময় ভারী হলেও টের পাওয়া যায় না।

দু পা এগিয়ে জিজ্ঞাসা করল, বাবুর রান্না তুমিই কর বুঝি ?

নিধু সগর্বে জবাব দিল, শুধু রান্না ! সব কাজেই এই নিধুরাম—নিধু ছাড়া বাবু অচল।

কি ভাবল সান্ত্বনা ! নিছক মেয়েলী কৌতূহল। আগেও হয়েছে। কিন্তু আগে সুযোগ মেলেনি। পথের ধারে একটা পাথরের ওপর বসে পড়ে বলল, এখানে বসি দু মিনিট, একেবারে অত হাঁটতে পারিনে। আচ্ছা দেখি নিধু কি রাঁধলে তুমি—।

জবাবের প্রতীক্ষা না করে হাত থেকে টিফিন ক্যারিয়ার টেনে নিল।

ক্যারিয়ারের হ্যাণ্ডেলে একটা তোয়ালে জড়ানো। খুলে যা দেখল, সান্ত্বনার চক্ষু স্থির।

ভাত যে ঠাণ্ডা কড়কড়ে হয়ে আছে নিধু!

বাবুর ওই রকমই খাওয়া অব্যেস, আমি গরম ভাত ছাড়া খেতে পারিনে।

বাটি তুলে সান্ত্বনা দেখছে। এক বাটিতে একটু তরকারি, পরের বাটিতে একটু মাছ। দেখে মুখে কুঞ্চন-রেখা পড়ল গোটাকতক। নিধু বলল, তলার বাটিতে বিলিতি বেগুনের চাটনিও আছে।

এই দিয়ে খাবেন তোমার বাবু?

আত্মপ্রত্যয়ে মাথা দুলিয়ে হাস্যবদন নিধুরাম বলল, হ্যাঁ, একেবারে তৃপ্ত হয়ে খাবেন। আমার বাবু বড় ভালো গো দিদিমণি—যা রেঁধে দিই মুখটি বুজে খেয়ে নেন।

খাসা! সান্ত্বনা হঠাৎ রেগেই গেল যেন। কিন্তু নিধুর কাছে সেটা প্রকাশ পেল না। বাটিগুলো আবার গুছিয়ে টিফিন ক্যারিয়ার বন্ধ করল সান্ত্বনা। এক মুহূর্ত ভেবে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, ওই শালতলা থেকে দুটো পাতা কুড়িয়ে আনো তো, হাতে লেগে গেছে।

নিধু বলল, এই তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেল না।

আঃ, যা বলছি শোন না, ওই তো কত পাতা পড়ে আছে।

থতমত খেয়ে নিধু তাড়াতাড়ি পাতা আনতে গেল। ফিরে এসে দেখে দু হাতে দুই টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, থাকগে দরকার নেই, মুছে নিয়েছি।

পাতা ফেলে তোয়ালে জড়ানো টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে নিধুরামও অগ্রসর হ'ল। কিন্তু সান্ত্বনা থামল পরক্ষণেই।—তুমি যাও নিধু, আমার একটা জিনিস আনতে ভুল হয়ে গেছে, চট করে একবার বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি।

হন হন করে সে ফিরে চলল আবার।

হতভম্বের মত নিধুরাম দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। খেয়াল করলে তফাত কিছু খেয়াল হবারই কথা। কিন্তু এই মর্মগ্রাহী যোগাযোগ এবং নারী-চরিত্রের দুর্জ্ঞেয়তার কথা ভাবতে ভাবতেই নিধু গন্তব্যপথে অবতরণ করতে লাগল।

আর, সেটুকু যথাযথ উপলব্ধি করল যখন, দুই চক্ষু স্থির একেবারে।

আপিস ঘরে বসেই মধ্যাহ্নের আহারপর্ব সমাধা করে থাকে বাদল গাঙ্গুলি। টিফিন ক্যারিয়ার থেকে একে একে আহার্য সামগ্রী নামাচ্ছে আর অবাক হচ্ছে। আর ততোধিক বিস্ফারিত হয়ে উঠছে অদূরে দণ্ডায়মান নিধুরাম।

কি রে, করেছিস কি এসব—এ আবার তুই কবে রাঁধতে শিখলি ?

টেবিলের ওপর তোয়ালের পাশে টিফিন ক্যারিয়ারের হ্যাণ্ডেলের দিকে তাকালো নিধুরাম। অবাক বিস্ময়ে দেখল তোয়ালেটা তাদের বটে, কিন্তু টিফিন ক্যারিয়ারটা তাদের নয়। আহাররত মনিবের দিকে তাকালো। কি বলতে গিয়েও ভোজ্য পদার্থের দিকে চেয়ে রসনা সিক্ত হয়ে ওঠায় আর বলা হ'ল না। চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল শুধু।

খেতে খেতে বাদল গাঙ্গুলি বলল, 'এমন যদি রাঁধতে পারিস হাঁদারাম, বারোমাস ওই একঘেয়ে ছাইভস্ম খাওয়াস কেন শুনি ?

ঢোঁক গিলে নিধুরাম হাসতে চেষ্টা করল শুধু। চোখের দৃষ্টি মাছ আর পোলাওয়ের ওপরেই আটকে আছে। বাবুর খাওয়ার নমুনা দেখে কিছু মাত্র আশা আছে বলে মনে হ'ল না। বাটির শেষ মাছের টুকরোটোও প্লেটে নামিয়ে নিয়েছে···।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করুণ নেত্রে আহার পর্যবেক্ষণ করতে লাগল নিধুরাম।

ওদিকে বাড়ি ফিরে আবার টিফিন ক্যারিয়ার ভরে নিয়ে আসতে আসতে ভাবছে সান্ত্বনা। কাজটা ভালো হ'ল না। ভদ্রলোক জানবেই। জানুক, কিন্তু ওই দিয়ে খায় কি করে! তবু ভালো হ'ল না কাজটা। কি ভাববে কে জানে। হয়তো হাসবে মনে মনে আর মজা করে খাবে। মেয়েদের ওপরে লোকটার বিষম অবজ্ঞা শুনেছে। একে একে তিনজনের মুখে শুনেছে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের স্ত্রী মিসেস চ্যাটার্জির চায়ের আমন্ত্রণ প্রসঙ্গে নরেনবাবু বলেছিল প্রথম। তারপর সেদিন মড়াইয়ে বসে পাগল সর্দার সখেদে বলেছিল। বলেছিল, বড়সাহেব শুধু কাজই বোঝে, মেয়েদের দাম বোঝে না। আর ভুতুবাবুও সেদিন বড়সাহেবের অনুশাসন প্রসঙ্গে প্রকারান্তরে সেই কথারই সমর্থন করেছে।

ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হয়েই ছিল সান্ত্বনা। আজ বিরক্তি বাড়ল আরো। যা খুশি থাক, যেমন খুশি থাক, ওর তাতে কি! কোন খোশামোদ তোষামোদের ধার ধারে না। কিন্তু লোকটা তাই ভাবছে হয়তো···।

বাবার নির্দিষ্ট শিলাসনে খাবার রেখে সান্ত্বনা বলল, নাও বাবা, তুমি বসে যাও, আমার একটু দেরি হয়ে গেল আসতে, নরেনবাবুকে আমি খুঁজে বার করে নিচ্ছি।

খিদের মুখে অবনীবাবু আর দ্বিরুক্তি করলেন না। দ্বিতীয় টিফিন ক্যারিয়ার

নিয়ে সান্ত্বনা নরেনের আপিস ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে কেউ নেই। বেরিয়ে এলো। দালানের পিছনের গাছতলায় নরেন ধ্যানী বুদ্ধের মত বসে আছে চুপচাপ। সান্ত্বনা হেসে ফেলল।—কি ঘুমুচ্ছিলেন নাকি ?

বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে নরেন জবাব দিল, খেতে দেবার লোভ দেখিয়ে এ ভাবে শাস্তি দিতে বোধ হয় মেয়েরাই পারে।

সত্যি বড় দেরি হয়ে গেল। পরিপাটি করে আহার্য গুছিয়ে দিল তার সামনে। নিন্, এবারে শুরু করুন।

নরেন বলল, আগে দেরি হ'ল কেন তাই শুনি ?

নিজে দিব্যি করে খেয়ে দেয়ে ঘুমুচ্ছিলাম বলে। আরম্ভ করুন নয় তো সব আবার টিফিন ক্যারিয়ারে তুলে নোব এক্ষুনি।

ত্রস্তে আহারে মন দিল নরেন চৌধুরী। গো-গ্রাসে। সান্ত্বনা হাসতে লাগল।

মড়াইয়ের অন্য ধারটা দেখা যায় এখানে বসেও। লোকজন তেমন নজরে আসে না। যন্ত্রপাতি বা গঠন-সমারোহ কিছু কিছু চোখে পড়ে। একটা দুটো করে কন্‌ক্রিটের ব্লক উঠছে প্রায় পাতাল-গর্ভ থেকে। এরকম বহু ব্লক একসঙ্গে জুড়ে দিলে তবে মড়াইকে বরাবরকার মত প্রাচীন অবরোধে দ্বিখণ্ডিত করা সম্পূর্ণ হবে। সান্ত্বনার মনে পড়ল কি। সেদিন ব্যাপারটা ঠিক মত বুঝতে পারে নি। বলল, আচ্ছা, ওই ব্লকের নিচে যে লোহার ঘরের মত কি একটা তৈরি হচ্ছে, ওটা কী ?

দাঁড়াও বাপু, এখন তোমার কথার জবাব দিতে গেলে আমার খাওয়া পণ্ড।

আঃ বলুন না কি ওটা—লোহার ঘরের মধ্যে একরাশ লোহালক্কড় দরজা-চাকা হ্যাণ্ডেল-ম্যাণ্ডেল—কি হচ্ছে ওখানে ?

অটোমেটিক প্রেসার গেট হচ্ছে। বুঝলে ?

সান্ত্বনা ঘাড় নাড়ল, না। কি হবে ওতে ?

বরাবর জলের নিচে থাকবে, জল বাড়লে তার প্রেসারে আপনি যন্ত্রপাতি চলবে, আর কমলে আপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

সান্ত্বনা উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করল, তারপর ?

তারপর পোলাওয়ের সঙ্গে কালিয়া মিশিয়ে তাতে চপ ভেঙে একেবারে উদরে চালান। আচ্ছা আমাকে এখন বকাচ্ছ কেন, দেখছ না ব্যস্ত আছি।

কিন্তু সান্ত্বনার মন তখন অন্য রাজ্যে ধাওয়া করেছে। সাগ্রহে বলল, চলুন তাহলে ওর ভিতরে একদিন গিয়ে ঘুরে আসি।

কেন ?

আপনি তো বলছেন, বরাবর ওটা জলের নিচে থাকবে। কেউ জানতেও

পারবে না ওখানে এ রকম একটা জিনিস আছে, আর সান্ত্বনা বলে একটা মেয়ে সেখানে ঘোরাঘুরি করত—বেশ মজা না ?

বড় রকমের একটা গরাস মুখে তুলে নরেন বলল, হুঁঃ! তোমার তো সবেতেই মজা !

বাস্তবে ফিরে এলো সান্ত্বনা। তেমনি জবাব দিল, না তা কেন, যত মজা আপনার ওই পোলাও-কালিয়ার মধ্যে।

ওর এ ধরনের আগ্রহের কারণ কিছু কিছু জেনেছে নরেন চৌধুরী। কিছু একটা জিজ্ঞাসা করার জন্যই মুখ তুলল এবার। কিন্তু সান্ত্বনা কেমন যেন বিব্রত হয়ে উঠেছে হঠাৎ। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে ফিরে তাকালো। পায়ে পায়ে এদিকে আসছে চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি। কাছে আসতে নরেন হেসে বলল।—আবার তুমি এসে গেলে, নিরিবিলিতে খাচ্ছিলাম চাট্টি !

মৃদু হেসে বাদল গাঙ্গুলি দু'জনকেই নিরীক্ষণ করল একবার। পরে সান্ত্বনার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, অষ্টপ্রহর জলকীর্তন শোনেন বলছিলেন সেদিন—এঁর কাছে শোনেন ?

সান্ত্বনা জবাব দিল না। এক গাল মুখে নিয়েই নরেন চৌধুরী দুচোখ কপালে তুলে বলল, আমি জলকীর্তন করি ! ওর কাছে !···আর জন্মে ও-ই বরং চাতক পাখি ছিল, জল আসবে শুনেই মনে মনে অষ্টপ্রহর সাঁতার কাটছে তাতে।

সান্ত্বনা বড় রকমের একটা ভেংচি কাটল তাকে।—হ্যাঁ কাটছে সাঁতার, আপনাকে বলেছে।

বাদল গাঙ্গুলি সকৌতুকে চেয়ে রইল। সশব্দে হেসে উঠল নরেন চৌধুরী। পরে বলল, বোসো না, দাঁড়িয়ে কেন, দেখ কি খাচ্ছি, এ রাজ্যে এ রকম জোটে না সচরাচর, সান্ত্বনা আর একটা ডিশ—

শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল সান্ত্বনা। অনেক দেরি হয়ে গেল, বাবা অপেক্ষা করছে, আমি—আমি চলি, খাওয়া হয়ে গেলে ওগুলো বেয়ারা দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন।

যাবার জন্য পা বাড়াল।

বাদল গাঙ্গুলি জিজ্ঞাসা করল, ওই···ও ভালো আছে ?

সান্ত্বনা থামল।—কে ?

ওই কি যেন ওর নাম—আপনার সুন্দরী ?

বিব্রত হোক আর যাই হোক, উষ্ণতার আঁচটুকু যায় নি। তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, হ্যাঁ ভালো আছে, আপনার খোঁজ করছিল।

দ্রুত প্রস্থান করল। ঝাঁজ মিটেছে একটু। বড়সাহেব হোক আর যাই হোক,

খাবার পাঠাক আর যাই করুক, ও কেয়ার করে না কাউকে—সেটা বুঝবে।

এরকম কথা চিফ ইঞ্জিনিয়ার শুনতে অভ্যস্ত নয়। বিস্মিত নেত্রে চেয়ে রইল যতক্ষণ দেখা গেল।

মনে মনে বিব্রত একটু নরেনও হয়েছে। হেসে বলল, কিছু মনে করো না হে, ওর চালচলন কথাবার্তা সব ওই রকম।...তোমাকে দেখার আগে তো একেবারে ভগবান গোছের একজন ঠাওরেছিল।

তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাদল গাঙ্গুলি হালকা জবাব দিল, আর দেখার পরে গোপাল ভেবে গোক টানিয়ে ছেড়ে দিল।

নরেন সশব্দে হেসে উঠল।—না হে, ভয়ানক লজ্জা পেয়েছে সেদিন, সে যদি দেখতে...

সেদিন না হোক, আজ লজ্জার বহর স্বচক্ষেই দেখল বটে। সে কথা বলেই টিপ্পনী কাটতে যাচ্ছিল আবারও। কিন্তু তার আগেই ছড়ানো আহার্যসামগ্রীর দিকে চোখ আটকে গেল। সেই মাছের পোলাও আর কালিয়া, সেই মাছের ফ্রাই আর চপ।

অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল সে।

কি হ'ল? নরেন বুঝে উঠছে না।

কিছু না, খাও তুমি। আত্মস্থ হয়ে নিজের আপিস ঘরের দিকে পা বাড়ালো আবার।

বাবার কাছে যাবার কোন তাড়া নেই সান্ত্বনার। তার টিফিন ক্যারিয়ারও বেয়ারাই নিয়ে যাবে। মেজাজ এখন প্রসন্ন একটু। ভুতুবাবুর দোকানের উদ্দেশে চলল। যাবে ঠিকই করেছিল। সেদিনের চায়ের পয়সা ক'টা দেওয়া হয় নি।

কিন্তু এসে দ্বিগুণ বিস্ময় আর দ্বিগুণ বিপন্ন অবস্থা।

এক কোণে, বাইরে থেকে দেখাও যায় না এমনি এক কোণের বেঞ্চিতে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি বসে চা খাচ্ছে আর হেসে গল্প করছে একটি মেয়ে আর একটি পুরুষ। মেয়েটিকে চেনে সান্ত্বনা। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের মেয়ে ঝরনা। আর লোকটিকেও যেন দেখেছে কোথায়...। টেবিলের ওপরেই ছোট একটা স্যুটকেস।

ভুতুবাবু তার ক্যাশবাক্সের সামনে বসে নিরাসক্ত মুখে একটা পুরানো কাগজ নাড়াচাড়া করছে। তার চোখ-কান অন্যত্র, অর্থাৎ সেই কোণের দিকে। হঠাৎ সান্ত্বনাকে দেখে উৎফুল্ল মুখে বলে উঠল, এই যে, আসুন মা-লক্ষ্মী, আসুন!

কোণের দু'জনের কলগুঞ্জনে ছেদ পড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে তারা তাকালো এদিকে। ঝরনা মেয়েটি নিজের অজ্ঞাতেই যেন সঙ্গীর কাছ থেকে সুশোভন ব্যবধানে সরে বসল একটু। এদিকে মা-লক্ষ্মী রাঙিয়ে উঠেছে।

বসুন মা-লক্ষ্মী, চা দিই? সানন্দে ভাবছে ভুতুবাবু, একটুখানি আব্রু দিয়ে আলাদা ক্যাবিন এবারে একটা না করলেই নয়।

সান্ত্বনা অস্ফুট আপত্তি জানিয়ে বলল, না এখন চা নয়। পয়সা ক'টা বাড়িয়ে দিল, সেদিনের সেই···

আঁতকে উঠে হাত গুটিয়ে নিল ভুতুবাবু। কিন্তু কিছু বলার আগেই কাঠের বাক্সের ডালার ফুটো দিয়ে পয়সা ক'টা তাড়াতাড়ি ফেলে দিল সান্ত্বনা। তারপর যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই বাধা পড়ল আবার।

চললেন যে? আমায় চিনতে পারলেন না? ঝরনা বলল।

বিব্রতমুখে ঘাড় নাড়ল সান্ত্বনা, চিনতে পেরেছে।

তাহলে পালাচ্ছেন যে বড়? আমরা বুঝি কেউ নই? উঠে এসে একেবারে হাত ধরে বেঞ্চির ওপর বসিয়ে দিল তাকে। সঙ্গীর উদ্দেশে বলল, আমাদের এখানে একাধারে গিরিকন্যা আর মড়াইকন্যা আছেন একজন, তোমাকে বলেছিলাম না? এই ইনি—সাইনোশিওর অফ দি স্পট—লক্ষণীয় নক্ষত্রবিশেষ—আর ইনি এই···আমার একজন বন্ধু, কলকাতায় থাকেন, এখন ফিরে চলেছেন। কই ভুতুবাবু, এঁকে চা দিলেন না?

আর এক পেয়ালা চা নিয়ে হাজির হ'ল ভুতুবাবু।

সোনালী চশমার পুরু লেন্সএর ওধারে ঝিকিমিকি হাসি এবং আর একজনের নীরব কৌতূহলের মধ্যে পড়ে সান্ত্বনা যেন হাবুডুবু খেতে লাগল। বিনিময়ে নমস্কারও করতে পারল না। কিন্তু তবু বন্ধুটিকে যেন চিনেছে সান্ত্বনা। ওদের অগোচরে মেন কোয়াটারস্‌এ ঝরনার সঙ্গেই দেখেছিল আর একদিন। ভেবেছিল, আত্মীয়পরিজন কেউ হবে। প্রথম দিনের প্রথম দর্শনে ভালো লেগেছিল ঝরনাকে। কিন্তু আজ ভালো লাগল না তেমন। একটা অবিশ্বাসের কারণ দেখলে যেমন লাগে তেমনি লাগল।

ঝরনা জিজ্ঞাসা করল, ওপরে যাচ্ছেন তো? চলুন একসঙ্গে যাই। সঙ্গীর দিকে তাকালো, তোমার গাড়ির সময় হয়ে গেল বোধ হয়?

হ্যাঁ, এইবার উঠব। হাতঘড়ি দেখা এবং জবাব।

তিনজনেই উঠল একটু বাদে। স্যুটকেস হাতে বন্ধু বিদায় নিল। ওরা দু'জন চড়াইয়ের পথ ধরল।

রয়ে সয়ে উঠলে বড় জোর আধঘণ্টা লাগে সান্ত্বনার মেন কোয়ার্টারস পর্যন্ত উঠতে। প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগল সেখানে। কিন্তু এই একঘণ্টা সান্ত্বনার এক জীবনের বিস্ময় যেন। মেয়েটার মাথায় গোলমাল আছে কিনা তাও সন্দেহ হচ্ছিল মাঝে মাঝে। ঝরনাই কথা বলে গেল। অনর্গল কথা। যে সব কথা একদিনের আলাপে কেউ বলে না, তেমন ধরনের কথাও। আর অজস্র হাসি। সান্ত্বনা বোবা সারাক্ষণ।

—সান্ত্বনাদের বাড়ি একদিন সে যাবে অনেকদিন ভেবেছে। সেই প্রথম দেখার পর থেকেই। হয়ে ওঠে নি।—কি করে হবে? ও বাবা! মায়ের যা ছাঁটাই বাছাই! তা এবার একদিন ঠিক যাবে। এখানে যে বাড়িতেই যায়, মেয়েরা, মানে মহিলারা সবাই বলে সান্ত্বনার কথা। বলে মানে টিপ্পনী কাটে। হিংসা, সোজা হিংসা—বুঝলেন না, অ্যারিস্টোক্র্যাট কি না ওরা—ওমা, আপনি আপনি করে বলছে কেন সে সান্ত্বনাকে। বয়স কত? যতই হোক, সাতাশ তো নয়। ওর সাতাশ—মা অবশ্য···যাকগে, আর আপনি বলবে না। ঝরনা কলকাতায় কবে যাবে? কেন? এম-এ ক্লাস!···ও, মা বলেছিল বুঝি সেই প্রথম দিন—হ্যাঁ, এম-এ পড়ে বৈ কি, পাঁচ বছর ধরেই পড়ছে। কবে যে শেষ হবে পড়া কে জানে! না, হোস্টেলে থাকে না। দাদার কাছে থাকে। দাদা বৌদি ঠিক মায়ের মনের মত হয়েছে। অ্যারিস্টোক্র্যাট হয়েছে। কি মজা জানো—ওই জন্যেই আবার বৌদির ওপর মা মনে মনে একটু ইয়ে—নিজের বোনদের মধ্যে মায়েরই মনমত কিছু হ'ল না কিনা—বাবা তো এতদিনে ঘষে মেজে মোটে অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ অফিসার—বোনেদের ওঁরা সব মস্ত মস্ত দিকপাল এক একজন। না, এখন সে চট করে যাচ্ছে না, মা যেতে দিলে তো! নতুন নতুন কত হোমরাচোমরা লোকের সঙ্গে বলে আলাপ পরিচয় হচ্ছে এখানে। নরেন চৌধুরী লোকটি বেশ—আলাপ হয়েছে, দিব্বি হাসিখুশি আর তোমার প্রশংসায় তো পঞ্চমুখ। কিন্তু ওই গোমড়ামুখো চিফ ইঞ্জিনিয়ারটিকে দেখলে গায়ে জ্বর আসে, রসকস-শূন্য নিরেট একেবারে, প্রথম দিন পার্টিতে ওকে এনটারটেন করতে গিয়ে মায়েরই হিমশিম অবস্থা, আমার মজা লাগছিল বেশ। আচ্ছা, এই যে লোকটা গেল, গাড়ি পাবে তো? আর একটু আগে উঠলেই পারত—মাস্টারী বুদ্ধি আর কত হবে—মা বলে, মাথায় সাদা দ্রব্য থাকলে কেউ আর প্রাইভেট কলেজে ছেলে পড়ায় না—কিন্তু লোকটা ভালো, বুঝলে—মা বলে বোকা, কিন্তু আসলে ভালো বলেই একটু বোকা-বোকা দেখায় আর কি!

সারাক্ষণ সান্ত্বনা স্থান কাল বিস্মৃত হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়েই

উপরে উঠে এলো। নিজে বোধহয় দশটা কথাও বলে নি, কিন্তু ঝরনা থামতে মনে হ'ল ও নিজেই যেন হাঁপিয়ে গেছে বেশি। মেন কোয়ার্টারসএ পৌঁছেই হাসতে হাসতে বিদায় নিল ঝরনা। কিন্তু সোনালী চশমার ওধারে তার চকচকে দুই চোখে শুধু হাসিই চিকচিক করছিল কিনা তাও যেন বুঝে উঠছিল না সান্ত্বনা।

বাড়ি ফিরে বাদল গাঙ্গুলি সামনে নিধুকে দেখেই জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁ রে, আমার দুপুরের খাবার আজ কোথা থেকে এসেছে ?

ফাঁপরে পড়লো নিধুরাম। বলত তখনই। কিন্তু সেই আহার্যসামগ্রী দেখে জিব নেড়ে কথা বলা শক্ত হয়ে পড়েছিল বলেই বলা হয়ে ওঠে নি। কোন প্রকারে জবাব দিল, আঁজ্ঞে ··বাড়ি থেকেই তো এসেছিল, পথের মধ্যে ওই···ওভারসিয়ার-দিদিমণি কি রেঁধেছি দেখতে চাইলে···তারপর কেমন করে কি হয়ে গেল !

প্রচ্ছন্ন হাসির আভাস বাদল গাঙ্গুলির মুখে।—যা পালা, আর শোন্, এখন কিছু খাব না।

দুপুরের খাওয়াটা বেশি হয়ে গেছে। কাপড়-জামা বদলে হাতমুখ ধুয়ে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিল।

ক্লান্ত লাগছে। রাজ্যের অবসাদ। কাজের মধ্যে ডুবে থাকে সারাক্ষণ, কিন্তু আজ কিছু ভালো লাগছিল না। অন্যদিনের থেকে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছে ঘরের আলো নিবিয়ে আরাম-কেদারায় গা ছেড়ে দিয়েও আরাম কিছু পাচ্ছে না।

কাজে ডুবে থাক আর যাই করুক, বিস্মৃতির কবরের তলায় সব কিছুর নির্বাসন অত সহজ নয়, আজ সেটাই আবার নতুন করে উপলব্ধি করছিল বোধ হয়। হাল ছেড়ে দিল বাদল গাঙ্গুলি।···আসুক ওরা। আসুক ব্যথার দূতেরা। আসুক খুশির দূতেরা। ভিড় করে আসুক নিভৃত অতল থেকে ব্যর্থতার যত বোঝা আর যত কিছু···।

এবারে যেন সহজ হ'ল একটু। টানধরা স্নায়ুগুলি শিথিল হ'ল অনেকটা। ওভার-সিয়ারের ওই মেয়েটার আজকের এই খাবার বদলে পাঠানো থেকে সেই আর একদিনের আর এক মেয়ের টিফিন ক্যারিয়ার পাঠানো মনে পড়ছে। এক নয়। এক রকমও নয়। বরং একেবারে উল্টো। তবু মনে পড়ছে। আজ ছিল পূর্ণতার বিস্ময়। সেদিন ছিল শূন্যতার বিস্ময়।···সেদিন সেও ভালো লেগেছিল বাদল গাঙ্গুলির। কিন্তু সেদিনের সেই ভালো লাগাটুকুও বুকের ভি টনটনিয়ে উঠছে যেন। ওর নতুন দিনের সেই ভরা-প্রাচুর্য অমনি এক শূন্যতার দেউলে উজাড় করে দিয়ে বসে আছে আজও, সেই ব্যথাটাই যেন নতুন করে জাগিয়ে দিল একজন

সামান্য ওভারসিয়ারের এক অতি সাধারণ মেয়ের ভরা টিফিন ক্যারিয়ার।

…ঠিক একটার সময় সেদিন মোটর-হর্ন বেজে উঠেছিল নেশান বিলডার্স লিমিটেডের দোরগোড়ায়।

উঁচু-নিচু আপিসসুদ্ধ লোক চিনত এই মোটর-হর্ন। তারা বলত শ্যামের বাঁশি। সাত সুরে মেশানো মার্কামারা হর্ন। কিন্তু একটার সময় কেউ শুনতে অভ্যস্ত নয় এ হর্ন। ওটা বেজে উঠত কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায়। ঘড়ির দিকে না চেয়েও অন্য কর্মচারীরা বুঝতে পারত, পাঁচটা বাজল। জানত, এইবার পড়ি মরি করে ছুটবে একজন। যত কাজ থাক, আর যত ফাইলই জমে উঠুক। সত্যি তাই। বাদল গাঙ্গুলি তখন কলের মানুষ নয় আজকের মত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হয়তো শেষ ফাইলের কাজ শেষ করে নিত সেই মুহুর্মুহু হর্নের তাগিদে। নয়তো ঠেলে একপাশে সরিয়ে রাখত পরের দিনের জন্য। তারপর একে ঠেলে, ওকে ধাক্কা দিয়ে তরতর করে নেমে আসত সিঁড়ি বেয়ে।

এরই মধ্যে তাক বুঝে একমাত্র নরেন চৌধুরীই এসে পথ রোধ করে দাঁড়াত মাঝে মাঝে। শ্যামের বাঁশি কথাটা তারই মস্তিষ্কজাত। গলা ছেড়েই একদিন বলে উঠেছিল, শ্যামের বাঁশি শুনে গোপিনীকুলই আকুল হ'ত, লোক হাসালে তুমি!

তাকে ঠেলে দিয়ে বাদল গাঙ্গুলি জবাব দিয়েছিল, কলিতে সব উল্টো বন্ধু, সব উল্টো—

তবু সে পথ আগলালে থামতে হত। নরেন কখনো বলত, এ ফাইলের কাজ শেষ করে দিয়ে যাও, নয় তো খেসারত দিতে হবে।

কি খেসারত?

আমিও যাব সঙ্গে।

বাদল গাঙ্গুলি কখনো হিড়হিড় করে তাকে সুদ্ধ টেনে নামাতো সিঁড়ি দিয়ে। কখনো আবার এক ধাক্কায় তাকে ফিরে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে একাই ছুটত। একগাল হেসে মোটরাসনার সামনে এসে দাঁড়াত। কে বলবে বাদল গাঙ্গুলি একজন ক্লাস ওয়ান ইঞ্জিনিয়ার, আর কে বলবে ও ঝকঝকে তকতকে মোটর গাড়ি এক দ্রুতগতির যান্ত্রিক সরঞ্জাম মাত্র। ওই মোটর গাড়িতে নীলাকে গা এলিয়ে বসে থাকতে দেখলে কাব্যের রোমাঞ্চ জাগত ক্লাস ওয়ান ইঞ্জিনিয়ারের মনোযন্ত্রের মধ্যিখানে।

যতক্ষণ না নেমে আসে, থেকে থেকে ততক্ষণই হর্ন বাজে। দেরি হলে ছদ্মকোপে নীলা ঝাঁজিয়ে উঠত, কানে তুলো গুঁজে বসে থাকো নাকি, একধার থেকে হর্ন বাজাচ্ছি!

দরজা খুলে ধুপ করে তার পাশে বসে পড়ে জবাব দিত, শুনেছি, সব ক'টাই শুনেছি—তোমার ওই মিষ্টি হর্ন শুধু আমার নয়, আপিসসুদ্ধ লোকেরই কানের ভিতর দিয়ে একেবারে মরমে গিয়ে বেঁধে, কিন্তু সখি, কাজ বড় বিষম গরল।

তবে নাবো, কাজই কর গে যাও!

কখনো আবার কোনো জবাব না দিয়ে সেই ভরা দিনের খোলা রাস্তায় মোটরের ভিতর হঠাৎ একেবারে তার প্রগল্‌ভ সান্নিধ্যে ঝুঁকে আসত বাদল গাঙ্গুলি।

—এই! স্টিয়ারিং ছেড়ে যথাসম্ভব দরজার দিকে সরে বসত নীলা।—রাস্তার মধ্যে ইয়ারকি করতে হবে না। রাগ দেখাত সত্যি, কিন্তু ঠোঁটের হাসিটুকু একেবারে গোপন থাকত না। গাড়িতে স্টার্ট দিত তারপর। কমল-কলি হাতে স্টিয়ারিং ধরে গাড়ি চালাত···বাদল গাঙ্গুলি দেখত চেয়ে চেয়ে। গাড়িটা যেন ওর দাসানুদাস।

কখনো পার্টিতে যেত, কখনো নাচগান বাজনার আসরে, কখনো ক্লাবে বা থিয়েটার-বায়স্কোপে। আবার কখনো কোথাও না—শুধু পাশাপাশি যাওয়াটাই উপলক্ষ।

রোজ, প্রত্যহ।

কিন্তু দিনেদুপুরে বেলা একটায় সেদিন ওই মোটরের হর্ন কেন?

দোতলার বিশাল হলেরই একধারে সারি সারি চেম্বার পদস্থ অফিসারদের। ওরই একটা থেকে স্প্রিং-আঁটা দরজা ঠেলে এক্ষুনি একজন বেরিয়ে এসে হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়ির দিকে ধাওয়া করবে এবার, সেটাই প্রত্যাশিত ছিল হলের কর্মমগ্ন কর্মচারীদের। কিন্তু কেউ এলো না। যার উদ্দেশে হর্ন, তার চেম্বার থেকে বেয়ারার উদ্দেশে প্যা-ক্ করে একটা শব্দ হ'ল শুধু।

বাদল গাঙ্গুলি জানত এ সময়ে এই হর্ন বাজবে, কিন্তু বাজলেও ব্যস্ত হওয়ার মত কিছু নয়। বেয়ারা ছুটে আসতে তাকে বলল, দেখো, ওই নিচের গাড়িতে আমার খাবার এসেছে, নিয়ে এসো।

বেয়ারা প্রস্থান করল।

দুপুরে সেদিন লাঞ্চের নেমন্তন্ন ছিল নীলার ওখানে। প্রায়ই থাকে। কিন্তু সম্প্রতি কাজে ব্যস্ত খুব। একবার উঠলে তো আর অল্প সময়ে হবে না। তাই বলে দিয়েছিল তার খাবার আপিসে পাঠিয়ে দিতে।

কেন, তোমার আসতে কি? নীলার বিরস প্রশ্ন।

বেজায় চাপ কাজের, তোমার বাবাই বিষম তেতে আছেন, ছুটি মিলবে না।

নেশান বিলডার্স লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার বিপুল বাড়রী। নাম-ডাকের ছড়াছড়ি। সরকারী বেসরকারী এক্সপার্ট কমিটিতে বিশেষজ্ঞ হিসাবে ডাক পড়ে যখন তখন। নীলার বাবা। বাদল গাঙ্গুলির ভাবী শ্বশুর। হলে কি হবে, কাজের সময় কোন সম্পর্কের ধার ধারেন না। একটু এদিক-ওদিক হলে ছাড়ন-ছোড়ন নেই। নেই বলেই ধাপে ধাপে এত অল্প সময়ে অতটা উঠতে পেরেছিল বাদল গাঙ্গুলি। কারণ, এদিক-ওদিক বড় হ'ত না তার কাজ। হলেও ভালর জন্যেই হয়েছে। অনেকবার সেটা বুকটান করেই প্রমাণ করে এসেছে সে।

ভুরু কুঁচকে নীলা চেয়ে ছিল তার দিকে। অর্থাৎ, চালাকি পেয়েছ? হাত ধরেই টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল পাশের ঘরে।—বাবা, কাল ও লাঞ্চে আসতে পারবে না বলেছে, এত কাজ তুমি নাকি ছুটি দেবে না—খাবার আপিসে পাঠিয়ে দিতে হবে।

পাইপ মুখে বিপুল বাড়রী হেসেছিলেন। বাদল গাঙ্গুলির পদমর্যাদায় দু ঘণ্টা ছুটি দেওয়া-না-দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু কাজের চাপটা মিথ্যে নয়। আর শ্রীমান কাজ ছেড়ে একবার বেরুলে খেয়েদেয়ে সুবোধ ছেলেটির মত আবার আপিস করবে সে আশাও রাখেন না। বলেছেন, কাজটা আগে না তোর খাওয়া আগে? তুই তো তোর বন্ধুদের কম্প্যানী পাচ্ছিসই—ওর খাবারটা পাঠিয়েই দিস।

পছন্দ হয় নি। নীলারও না, নীলার মায়েরও না। মিসেস বাড়রী বলেছেন, কতক্ষণই বা লাগবে—তোমার কাজ একেবারে উল্টে যাবে ওটুকুতে!

ওল্টাবে কি না সে তো ও-ই ভালো জানে। কাজ আছে যখন বলছে নিশ্চয়ই কাজ আছে—ওটা তো আপিস একটা না কি! বিপুলবাবুর সাফ জবাব।

—থাক বাবা থাক, আপিসেই পাঠাব'খন সব খাবার। ফিরে যেতে যেতে রাগ করে নীলা বলেছে, আমারও যেমন—তোমার কাছে এসেছি বলতে।

দরজা ঠেলে অতিকায় টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে বেয়ারার আবির্ভাব। টেবিল থেকে ফাইল সরিয়ে গ্লাস ডিস সাজালো সে। তারপর টিফিন ক্যারিয়ায় খুলে একেবারে হাঁ। প্রথম বাটিতে কিছু নেই—শুধু এক লাইন লেখা কাগজ একটা। বেয়ারার সামনেই অপ্রস্তুতের একশেষ সে। নীলা বড় বড় করে লিখেছে,- খাওয়ার ইচ্ছে থাকে তো পত্রপাঠ চলে এসো। ওদিকে দ্বিতীয় বাটিটাও খুলে ফেলেছে বেয়ারা। তাতেও স্লিপ একটা। বাদল গাঙ্গুলি ইশারায় বেয়ারাকে বলল চলে যেতে। সুপ-ফ্রাই'টা বাটিতেই ওই এক-টুকরো করে কাগজ। লাঞ্চের মেনু কি, কারা কারা অপেক্ষা করছে, কতক্ষণের মধ্যে না গেলে মেনুটা শুধু

মুখেই শুনতে হবে, ইত্যাদি।

টিফিন ক্যারিয়ার দেখেই খিদেটা বেশ চাড়িয়ে উঠেছিল।···হাসিও পেয়েছে, আবার রাগও হয়েছে। রাগ হয়েছে বেয়ারার সামনে অপ্রস্তুত হয়েছে বলে। বোতাম টিপে তাকে ডাকল আবার। নির্দেশমত সে টিফিন ক্যারিয়ার ইত্যাদি গুছিয়ে নিয়ে চলে গেল।

কিন্তু জব্দ বাদল গাঙ্গুলিও করতে জানে। কাজ মাথায় উঠল। বসে আছে, অপেক্ষা করছে। টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে নিল।

কি এলে না?—ওধার থেকে।

এধার থেকে।—এক্ষুনি যাবো, একেবারে মুখ তুলতে পারছি না। তোমর অপেক্ষা কোরো না।

না, ওরা তোমার জন্যে বসে আছে।

সেই জন্যেই তো আরো যাবো না। আমার জন্যে তুমি একা বসে থাকবে।

চালাকি করতে হবে না, এসো শীগ্‌গির!

যাচ্ছি, তোমরা শুরু করো। হাতের কাজটুকু সেরে না গেলে তোমার বাবাই চাকরি খতম করে দেবেন। অপেক্ষা কোরো না কিন্তু, হ্যাঁ—ঠিক যাবো।

ঠিকই গিয়েছিল। ঠিক পাঁচটায় আপিস থেকে বেরিয়েছে। তার পর যেতে যতক্ষণ লাগে।

নীলা চটেছিল। তার থেকে বেশি চটেছিলেন নীলার মা। কেন জানি স্বামী বা মেয়ের মত ওকে অতটা সুচক্ষে দেখতে পারেননি মহিলা। যেভাবে জামাইকে হাতের মুঠোয় পেতে চেয়েছিলেন, সেভাবে ঠিক পাওয়া যাবে কি না তেমন একটা সংশয় ছিল বলেই বোধ হয়। এত বড বাড়ি, দুটি ছেলে, একটি মেয়ে। ছেলেদের তো ইস্কুলের বয়স পেরোয় নি। বিয়ের পর জামাই অনায়াসে এখানেই থাকতে পারে। এখন থেকেই থাকতে পারে। সে মনোভাব অনেকবারই ব্যক্ত করেছেন তিনি। কিন্তু গেঁয়ো মা-ই বেশি হ'ল ওর। আর যে ছিরি ওর বাড়ির! মেয়ের সেখানে গিয়ে থাকার সম্ভাবনার কথা ভাবতেও শিউরে ওঠেন।

বিকেল পাঁচটা না বাজতে মেয়ে সেজেগুজে সাত-তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে যায় কোথায় জানেন। বিরক্ত হন। মেয়ের বাবার উদ্দেশে অনেকদিন বলেছেন, যেমন তুমি তেমনি তোমার মেয়ে, দু'জনেই তোমরা দিনকে দিন ওকে বাড়িয়ে তুলছ। ঘড়িতে চারটে বাজলেই মেয়ের আর তর সয় না, ছুটবে গাড়ি নিয়ে। কেন, গ্যাট হয়ে বসে থাক, ও আপনি আসবে'খন সুড়সুড় করে।

আড়াল থেকে নীলাও শোনে। বিপুল বাড়রীর মেজাজ ভাল না থাকলে

জবাব দেন না। ভালো থাকলে বলেন, তা ওদের বিয়েটা দিয়ে দাও না, মিছি-মিছি দেরি করে লাভ কী ?

থামো বাপু তুমি, হেসে খেলে দু'দিন বেড়াচ্ছে মেয়েটা বেড়াক, তার পরে আছেই বিয়ে, বিয়ে পালাচ্ছে নাকি ?

ভদ্রলোক ঠাট্টা করেন, কিন্তু তোমার মেয়ে যে পালাচ্ছে!

এসব খবর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নীলাই আবার যথাস্থানে জানিয়েছে। মায়ের এ অনুযোগ অভিযোগ ওদের দু'জনের কাছেই হাসির ব্যাপার।

বিপুল বাড়রী সেদিন বাড়ি ফেরা মাত্র মহিলা অগ্নিমূর্তিতে ভাবী জামাইয়ের লাঞ্চে না আসার দাম্ভিকতাটাই বড় করে বিস্তার করতে বসলেন।—মেয়েটা সেই থেকে প্রায় না খেয়ে মন খারাপ করে আছে। বলেছিলাম না, যেভাবে চেয়েছিলাম ঠিক সেভাবে পোষ মানে নি ও, আর মানবেও না কক্ষনো!

বিপুলবাবু বললেন, কিন্তু ওর তো খাবারটা আপিসে পাঠিয়ে দেবার কথা ছিল।

কেন, ও আসবে না কেন ? টেলিফোনে বলল আসবে, তার পরেও এলো না কেন ?

আসামী আসার পর তার কাছেও মেয়ের ধকলটাই ফেনিয়ে তুললেন মিসেস বাড়রী। টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার না পাঠাবার ব্যাপারে তাঁরও পরোক্ষ সায় ছিল বলেই রাগ চাপতে পারছিলেন না।

কিন্তু মেয়ের সঙ্গে আপসটা ওর সহজেই হয়ে গেল। কারণ কাজটা আর যাই হোক ভালো হয় নি খুব, সেটা নীলা উপলব্ধি করেছিল।

দুপুরের খাওয়াটা বেশ ভালো ভাবে উশুল করে নিয়ে ওরা বেড়াতে বেরিয়েছিল তারপর। গাড়ি চালাতে চালাতে মায়ের মেজাজ কতখানি বিগড়েছে নীলা তারই ফিরিস্তি দিচ্ছিল একটা।

সে থামলে বাদল জিজ্ঞাসা করল, আর কি বললেন তোমার মা ?

আর বললেন, ছেলেটা এখনো ঠিক পোষ মানে নি।

তোমাদের টমি কুকুরের মত ?

তোমার যা বুনো স্বভাব, ওতে কুলোবে না, আরো শক্ত শেকল দরকার। সন্ধ্যার সময় একটা নিরিবিলি পথ ধরে নীলা গাড়ি চালাচ্ছিল। স্টিয়ারিং থেকে হাত তোলার উপায় নেই। আচমকা অধরস্পর্শে গাড়ির টাল সামলানো দায় হয়েছিল প্রায়। ছদ্ম কোপে ঝাঁজিয়ে উঠেছিল শুধু, অ্যাকসিডেন্ট হলে তখন

জবাবে আবার এবং তেমনি আচমকা।

ভালো হবে না বলছি, এক্ষুনি দোব কিন্তু ষ্টিয়ারিং ছেড়ে!

বাদল গাঙ্গুলি হেসেছে, বলেছে, একে বুনো স্বভাব, তায় ছাড়া আছি—আমার কি দোষ!

কিন্তু মধ্যাহ্নের এই আহার-প্রসঙ্গ বাড়িতে ওর নিজের মায়ের কাছে প্রকাশ হয়ে যেতে একেবারে অন্যরকম দাঁড়াল ব্যাপারটা। রাত্রিতে খাবে না শুনে মা খবর করতে এসেছিলেন, সেই দুপুরে নেমন্তন্ন খেয়েছিস এখনো খিদে পায় নি?

মায়ের কাছে হাসতে হাসতে সবিস্তারে জ্ঞাপন করেছিল দুপুরের মজার ব্যাপারটা। ওকে জব্দ করতে গিয়ে উল্টে নিজেরাই কেমন জব্দ হয়েছে সেই কথা।

কিন্তু মা এর মধ্যে মজা কিছু দেখলেন না, আর জব্দ হওয়া বা করার আনন্দও কিছুমাত্র উপভোগ করলেন বলে মনে হ'ল না। শোনা মাত্র মুখ যেন সাদা হয়ে গিয়েছিল মায়ের। বলে ফেলেছিলেন, খালি টিফিন ক্যারিয়ার পাঠিয়ে তারা তোকে সমস্ত দিন না খাইয়ে রাখলে!

সামলে নেবার জন্য ছেলে তারপরে অনেক কথাই হয়তো বলেছিল। কিন্তু মা তার একবর্ণও শুনেছেন বলে মনে হয় নি। আর একটি কথাও না বলে নিঃশব্দে প্রস্থান করেছিলেন তিনি।

মনে মনে মায়ের ওপর সেদিন একটু বিরক্তও হয়েছিল। মায়ের চোখের সামনে ওর সমস্ত ভিতরসুদ্ধু এমনি খোলাখুলি ধরা পড়ে যায় বলেই বোধ হয়। মায়ের ধারণা মিথ্যে নয় খুব। কিন্তু যোগ্যতা তো তারও আছে। নেশান বিলডার্সএর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বিপুল বাড়রী হাজার গণ্ডা লোক চরান, ওর মত তো আর পাঁচজনকে বেছে নেন নি তিনি। যোগ্যতা না থাকলে, বরাবর স্কলারশিপ না পেলে, ওর মত গরীবের ছেলের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াটাই স্বপ্ন। অবশ্য পড়ার মধ্যে মা অনেকখানি। ছেলেবেলা থেকে মায়ের সবল ইচ্ছাশক্তি যেন ঘিরে থাকত ওকে। চাকরিতে ঢুকে ও চট করেই নাম করেছিল। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বিপুল বাড়রী কোম্পানী থেকে ওকে ট্রেনিংএর জন্য বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এ রকম একটি ছেলেকে বড় হবার সুযোগ দেওয়াও সহজ। আর সুযোগ দিয়ে কিনে রাখাও সহজ। বিপুল বাড়রীর স্বার্থ সেদিনও অবিদিত ছিল না বাদল গাঙ্গুলির। নীলাকে কাছাকাছি পাওয়ার পর থেকে সে স্বার্থের পাকে পাকে জড়িয়ে যেতে আপত্তিও ছিল না তার। গরীবের ছেলে এত বড় ভাগ্যের সম্ভাবনা আগে ভাবে নি। কিন্তু ওর অস্থিমজ্জার আর একদিকে মিশে আছে বাপের দেওয়া আত্মবোধ। বিপুল বাড়রীর স্বার্থে নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছে, কিন্তু দীন হয়ে থাকতে চায় নি তাঁদের। অনেক সময় সেটা নিজেই

সে বরদাস্ত করতে পারত না। কিন্তু এ ব্যাপারে মায়ের দুশ্চিন্তা বা ইঙ্গিত-কটাক্ষও খুব ভালো লাগত না তা বলে।

…কিন্তু সব শেষে একদিন সব কিছুর সেই কল্পান্তক অবসান।

আলো-নেবানো ঘরের নিভৃতে বসে থাকতে থাকতে বাদল গাঙ্গুলির হঠাৎ মনে হ'ল ঘরের বাতাস যেন কমে যাচ্ছে। একটা অব্যক্ত শূন্যতা চেপে বসছে ক্রমশ। ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সামনের টেবিলে নীলার ফোটো আছে একখানা। অনেকদিন ধরেই আছে। রাখার কোন অর্থ হয় না। তবু রেখেছে।

সামনে এসে দাঁড়াল। দু'হাতে তুলে নিল ফোটোখানা। আরো অনেক ছিল। সব নির্মূল করেছে। এটাও করত—।

—হ্যাঁ রে, এত বুঝিস আর এটুকু বুঝিস নে, জ্বর হলে গায়ে জল ঢেলে গা ঠাণ্ডা করা যায়?

সচকিতে ঘুরে দাঁড়াল বাদল গাঙ্গুলি। ঘরের মধ্যে, শূন্য ঘরের মধ্যে, তার খুব কাছে, একেবারে কাছে, কোথায় বুঝি মা এসে দাঁড়িয়েছেন! তার মা! তার মায়ের কথা! সেই সবশেষে সব শেষ করার জন্যই ও যখন ফোটো ছিঁড়ছিল একে একে—ওর মা বলেছিলেন। সেই কথাগুলি আজ আবার নিবিড় স্পর্শ হয়ে কানের ভিতরে, বুকের ভিতরে পৌঁছুল হঠাৎ। অব্যক্ত যাতনায় শূন্য ঘরের মধ্যে একমাত্র সেই মাকেই যেন খুঁজে বেড়ালো মড়াইয়ের চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি। মা, মাগো!

কে? হাতের ফোটো রেখে দিল। নিভৃত রোমন্থনে ছেদ পড়ে গেল।

আমি নিধু, রাত্তিরের খাবার।

ঘরের আলো জেলে দিল বাদল গাঙ্গুলি। ঘড়ি দেখল। ছোট টেবিলে খাবার রেখে অপেক্ষা করতে লাগল নিধু। আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে পারম্পর্যহীন নিস্পৃহতার আবরণ নেমে এসেছে ভিতরে বাইরে।

চেয়ার টেনে আহারে বসল কলের মানুষ চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি।

—সাত—

সান্ত্বনা দু'চারবার অনুরোধ করতে নরেন রাজী হয়ে গেল।

ইতস্তত করেছিল প্রথম। কিন্তু আনন্দ জিনিসটাও ফেলনীয় কম নয়। চাকরির বাইরেও শুকনো পদমর্যাদার শিকলে আটকা পড়ে থাকবে এ নরেন নয় নরেন চৌধুরীর।

বাদনা উৎসবে নেমন্তন্ন করে গেছে পাগল সর্দার।

সান্ত্বনা শুনেছে সে এক মস্ত পব।

বারো মাসে তেরো ছেড়ে তেত্রিশ পার্বণের অজস্রতাই ছিল একদিন ওদেব। সেদিন গেছে। পৌষে ধান কাটার উপলক্ষও আর নেই বড়। মেয়ে-পুরুষের প্রধান জীবিকা এখন চাকরি। ক্ষুধার দায়ে পেশা বিকিয়েছে। সে পেশার লাগাম অন্যের হাতে। তবু দুই একটা উৎসবে লাগাম ছেঁড়ে ওদের। বাদনা উৎসবে বেশ ভালো করেই ছেঁড়ে। উপর্যুপরি পাঁচটা দিন একটি সাঁওতাল নারী-পুরুষকেও আব মড়াইয়ের ধারে কাছে দেখা যাবে না।

ওদের এই ক'টা দিনেব অনুপস্থিতি মড়াইয়ের কর্মকর্তাদেরও মেনে নিতে হয়। বিভিন্ন জাতের সহস্র সহস্র কুলিকামিনের মধ্যে মাত্র ক'টা দিনের জন্য এই একদলেব অনুপস্থিতি লক্ষণীয় নয় এমন কিছু। উৎসবের ব্যাপারটা নরেন চৌধুরী কিছু কিছু জানে। গতবার আভাস পেয়েছে। সান্ত্বনা দেখে নি কখনো। শুনেছে। শোনার পরেও আর চুপচাপ ঘরে বসে থাকে কি করে।

যেতে হবে ওদের বাড়ির পেছন দিক দিয়ে পাহাড়ী রাস্তা ধরে নিচে নেমে, গোটা দুই গ্রাম ছাড়িয়ে শালমহুয়ার বন পেরিয়ে তারপর।

অদ্ভুত ভালো লাগছে সান্ত্বনার। এ পথে আর আসেনি কখনো। মহুয়া বনে রসে টইটম্বুর মহুয়া ফলের মিষ্ট মাতাল আতপ আতপ গন্ধে কি একটা সাড়া জাগছে যেন চেতনার তলায় তলায়। আসন্ন বসন্ত বাতাসে শালপিয়ালের ঝর-ঝরানি যেন গানের মতই কানে বাজছে। নরেন এটা সেটা টিপ্পনী কাটছে মাঝে মাঝে। এ পরিবেশে নীরবতাও প্রায় স্পর্শবাহিনী। তাই কথা বলতে হচ্ছে ওকে। নইলে চুপচাপ ওই যৌবন-প্রাচুর্যের দিকে চেয়ে থাকা বেশি লোভনীয়।

কিছুটা পথ বাকি তখনো। দূর থেকে ঢোল মাদলের শব্দ কানে আসছে। সামনের বাঁকে একজন লোক দাঁড়িয়ে। অবাঙ্গালী। সেপাই বা দারোয়ানের কাজটাজ করে বোধহয়। নরেন চৌধুরী মন্তব্য করল, ব্যাটা এখানেও এসে জুটেছে আবার!

কে ও—সান্ত্বনা ফিরে তাকালো।

জবাব দেওয়া হ'ল না। কাছাকাছি এসে পড়েছে। লোকটা আগে দেখে নি ওদের। দেখে বেশ বিব্রত হয়েছে বোঝা গেল। তাড়াতাড়ি আনত অভিবাদন জ্ঞাপন করল নরেন চৌধুরীর উদ্দেশে।

কেয়া [illegible]হুর, দেখ্‌নে আয়া? নরেনের হিন্দী।

জবাবে লোকটা লজ্জায় ঠোঁট দুটো একবার নাড়ল শুধু। তারা পাশ কাটিয়ে

এগিয়ে গেল। নামটা শোনা-শোনা লাগছে সান্ত্বনার। নরেনকে মুখ টিপে হাসতে দেখে আবার জিজ্ঞাসা করল, কে লোকটা বলুন না ?

যাকে দেখবে তাকেই চিনে রাখতে হবে তোমার ?

সান্ত্বনা লজ্জা পেয়ে বলল, তবে হাসছেন কেন ?

অল্প থেমে নরেন জবাব দিল, একটুখানি কাব্যকথা মনে পড়ে গেল, ওই ফুলের লোভে লোভে কারা সব আসে···সেই কথা। ওর নাম বাহাদুর, জমাদার—একেবারে বাহাদুর জমাদার। হেসে উঠল।

···জমাদার···বাহাদুর—

কার মুখে শুনেছিল ? কোথায় শুনেছিল ? মনে পড়তে একেবারে ঘুরে দাঁড়াল সান্ত্বনা। কিন্তু দেখা গেল না। লোকটা আড়াল নিয়েছে। ভুতুবাবুর মুখে শুনেছিল এ নাম। পাগল সর্দারের মেয়ে চাঁদমণির সঙ্গে জড়িয়ে ভুতুবাবু বলেছিল কিছু। বলে নি, বলতে যাচ্ছিল···।

কি হ'ল ?

অপ্রতিভ মুখে সান্ত্বনা এগলো আবার।—কিছু না, এই লোকটা ভয়ানক পাজী শুনেছি।

আর একটু বিব্রত করার উদ্দেশ্যেই নরেন লোকটাকে সমর্থন করে বলল, ওর দোষ কি ? ফুলের লোভে লোভে ওই কারা সব না এলে ফুলের জীবনই ব্যর্থ শুনেছি।

যা-ন্, আপনাকে আর কাব্য করতে হবে না। বলল বটে, কিন্তু হেসেই ফেলল সেও। দিনকতক আগেও পাগল সর্দারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার। কথায় কথায় সান্ত্বনা মেয়ের বিয়ের কথা তুলেছিল। সর্দারের কথা শুনে বেজায় হেসেছিল সেদিন। মনে পড়তে জোরেই হেসে উঠল এবার।

সর্দারের ওই মেয়েটার সঙ্গে হোপুনের বাপলা হবে শিগ্‌গির জানেন ? বাপলা বুঝলেন না ? বিয়ে—।

বুঝলাম, তা তোমার এত হাসি কেন ? তোমাকেও নেমন্তন্ন করবে ?

করবেই তো। হাসছি ওই সর্দারের কথা শুনে। ঠিক করেছে এই চৈত্র মাসে বিয়ে দেবে ওদের—কিন্তু ওদের কিছু বলে নি এখনো—ঠিক করেছে শুধু। চৈত্র মাস শিবরাত্রি পার হলে দিয়েই দেবে বিয়েটা—শিব হল বাবা—আগে বাবার বিয়ে না হলে ছেলেমেয়ের বিয়ে হবে কি করে। সে রকম নিয়ম নেই ওদের। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে লাগল সান্ত্বনা।

নরেনের সমস্যা মন্দ নয়। হাসবে, না হাসি দেখবে···।

সুরে বাঁধা জমাট আসর নয় কিছু। সুরে আর বেসুরে, গানে আর গর্জনে, তালে আর তাণ্ডবে একটা একাকার ব্যাপার। আবালবৃদ্ধবনিতার উৎসব। মাঝি পারাণিক জগমাঝি, জগপারাণিক নায়েক প্রভৃতি গণ্যমান্যদের সমাবেশ। ছেলেমেয়েদের হৈ-হুল্লোড়ে তারা সরাসরি যোগ দিচ্ছে না বটে, কিন্তু চোখে-মুখে তাদেরও প্রশ্রয়ের আভাস। জোয়ানেরা অনেকে কালিঝুলি মেখে সং সেজেছে। অনেকে আবার ময়ূরের পেখম পরেছে বা মাথায় চূড়ো বেঁধেছে। বাসন্তী রংএ শাড়ি ছুপিয়েছে মেয়েরা, কপালে টিপ পরেছে, কালো চুলে গুঁজেছে মহুয়া ফুল।

মন্ত্র পড়ে নায়েক অর্থাৎ পুরোহিত। বলে, ওগো পীঠস্থানের ঠাকুর, ওগো 'জাহের এরা', তোমাকে প্রণাম। তোমার নামে আজ আমরা ছোট বড় সকলে এসে মিলেছি। 'জাহের এরা' আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিও। তোমায় প্রণাম বাবাঠাকুর, আমাদের ব্যারাম পীড়া দুঃখজ্বালা সব দূর কোরো, প্রাচীনকালের মত ধনে-ধান্যে সমৃদ্ধ কোরো আমাদের 'জাহের এরা', আমাদের আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু-স্বজন ছোট বড় সকলের মঙ্গল হোক, আমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ নাশ-বিনাশ যেন সৃষ্ট না হয় ঠাকুর, নেচে গেয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে যেন আমরা থাকতে পারি। ওগো বাবাঠাকুর, ওগো 'জাহের এরা', প্রণাম তোমাকে।

মাঝি সকলকে আশীর্বাদ করে বলে, ঝগড়াঝাঁটি কোরো না, লোভলালচ কোরো না, পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি ভাই-বোনেরা মিলে ফুর্তি করো।

এই ফুর্তির আমেজ লাগে ছেলেবুড়ো সকলের মনে। মুরগী উৎসব হয়। সাদা রঙের আর বাদামী রঙের। সুকয়া পোলাও রান্না হয়। আর নাচ আর গান, গান আর নাচ। ঢাক বাজে মাদল বাজে নাগরা বাজে, মোষের শিঙের বাঁশি ফোঁকা হয়। একটা শব্দতরঙ্গের উত্তাল আনন্দের আরতি হতে থাকে দেহের প্রতি রন্ধ্রে।

সান্ত্বনা এবং নরেন চৌধুরীর পদার্পণে সব থেকে খুশি পাগল সর্দার। এমনিতে অতিথিবৎসল ওরা। তার ওপর দিদিয়া এসেছে, সাহেব এসেছে। আনন্দ ধরে না। কিন্তু আর সকলের ওদের দিকে তাকাবার অবকাশ নেই খুব। নিজেদের নিয়ে নিজেরাই বিহ্বল।

বিহ্বল সান্ত্বনাও। ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে প্রচুর হেসেছে। কিন্তু এই মত্ত আনন্দের ছোঁয়ায় উজাড় করে দেবার একটা ইশারাও আছে যেন। অস্বস্তি লাগে। দেহের রক্তে সব বিলানো নাচনের ছোঁয়া। থেকে থেকে মুখ রাঙিয়ে উঠছে, চোখে ঘোর লাগছে কিসের। বাতাসে মহুয়ার গন্ধ ভেসে আসছে এক একবার।

এখানে চাঁদমণিও আছে, গোপনও আছে। এত লোকের মধ্যে দুজনকে

বিচ্ছিন্ন করে দেখার জায়গা নয় বলেই সান্ত্বনা বিশেষ করে দেখার সুযোগ পাচ্ছে ওদের। মত্ত মাতাল খুশির নেশায় যেন ঢলে ঢলে পড়ছিল মেয়েটা।

কিন্তু খানিক বাদেই কি হ'ল যেন। ফিরে ফিরে তাকায় সান্ত্বনার দিকে। সান্ত্বনার হাসির সঙ্গে ওর হাসি আর মেলে না তেমন। এই মেয়েটার প্রতি বরাবর একটা প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ সান্ত্বনার। ভেবেছিল চাঁদমণি কাছে আসবে, কথা বলবে, আর হাসবে। যেমন করে কথা বলে ও, আর যেমন করে হাসে।

কিন্তু সান্ত্বনার হাসি দেখে ওর হাসি কমে এলো আস্তে আস্তে। আড়ে আড়ে দেখে, চলনে চাউনিতে একটা সর্পিল কাঠিন্য দেখা দেয় কেমন। হোপুনের কাছে এসে কানে কানে বলে কি। হোপুন ওদের দিকে ফিরে তাকায় একবার। ওর চাউনিটাও দুর্বোধ্য মনে হয় সান্ত্বনার।

নরেন তাড়া দিল, এইবার পালাই চলো, একটু বাদেই মদ গিলতে বসবে সব।

সভয়ে উঠে দাঁড়াল সান্ত্বনা। এতক্ষণে মনে হ'ল, ওদের এত ফুর্তির উৎসটা খুব যেন স্বাভাবিক নয়। মদ খেয়েই বোধ হয় আসরে নেমেছে সব। আসর শেষ হলে আবারও খাবে। পাগল সর্দার এলো। জিজ্ঞাসা করল, আখুনি যাবি তুরা ?

সান্ত্বনা ঘাড় নাড়ল।

সর্দার বলল, কাল আসিস দিদিয়া, কাল ডাংরা লিয়ে জোর লাচ হবে।

সান্ত্বনা জবাব দিল না। দূর থেকে চাঁদমণি চেয়ে চেয়ে দেখছে ওকে। হোপুনও। ওদের মুখভাব খুব যেন সদয় নয়। মনে মনে অবাক হ'ল সান্ত্বনা। ...কিন্তু দু'চার মুহূর্তের জন্যে শুধু। তার পরেই ভুলে গেল ওদের কথা। বিস্মৃতিরই আসর এটা। অনেকটা আচ্ছন্নের মতই নরেনের পাশে পাশে চলতে লাগল সে।

...ভাবছে। ভাবতে চেষ্টা করছে। এ ভদ্রলোকই বা এমন চুপচাপ কেন। হালকা হাসি-ঠাট্টা কিছু করতে পারলে এ ভাবটা কাটে হয়তো। কিন্তু মুখ তুলে চাইতেও পারছে না। কি যেন হচ্ছে ভিতরে ভিতরে।

হঠাৎ সচকিত হ'ল সান্ত্বনা। সম্ভবত নরেন চৌধুরীও। অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ ঘটল আর একজনের সঙ্গে। একজন নয়, দুজনের সঙ্গে। শাল মহুয়া পেরিয়ে দুজনেই থমকে গেল অদূরের জিপ গাড়িটা দেখে। ঘোষ-চাকলাদারের জিপ। শুকনো মড়াইএর ধারে পাশাপাশি বিচরণ করছে রণবীর ঘোষ আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের মেয়ে ঝরনা চ্যাটার্জি।

ওদের দেখে হর্ষোৎফুল্ল মুখে এগিয়ে এলো দুজনেই। রণবীর ঘোষ বলল,

উৎসব দেখতে গিয়েছিলেন নাকি ? ওয়াণ্ডারফুল, না ?

নরেন কিছু জবাব দেবার আগেই ঝরনা বলে উঠল, এ মা, দেখব বলে এতদূর এলাম, আর দেখা হ'ল না! অনুযোগ করল রণবীর ঘোষকেই, আপনার জন্যেই তো, কেন নিয়ে গেলেন না ?

নরেন বলল, জিপ রয়েছে সঙ্গে, এখনো যেতে পারেন।

ঝরনা সাগ্রহে তাকালো তার সঙ্গীর দিকে, চলুন যাই তাহলে। এগোতে গিয়েও সান্ত্বনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল, কি গো মেয়ে, আমাকে যেন চিনতেই পারছ না—তোমার মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে না উৎসব দেখে এলে!

চশমার ওধারে চোখ দুটো তার হেসে উঠল। ও ধরা পড়ে নি, সান্ত্বনাই ধরা পড়ে গেছে যেন।

নরেন বলল, ওদের ওই আসুরিক আনন্দ দেখে সান্ত্বনার মাথা ধরে গেছে। আপনারা যাবেন তো যান তাড়াতাড়ি—সন্ধ্যে হয়ে গেলে আর কি দেখবেন, বসো সান্ত্বনা—আচ্ছা, নমস্কার।

এগিয়ে চলল আবার। পাহাড়ী রাস্তা। উঠতে লাগল। এই মেয়েটার সঙ্গে এই লোকটার এই অন্তরঙ্গতা সান্ত্বনা কিছুতেই যেন বরদাস্ত করতে পারছে না। দিও মেয়েটা কেমন খুব বুঝেছে। সেদিন ওর সঙ্গে সেই পাহাড়ে উঠতে উঠতেই বুঝেছিল। আজ আরো বেশি বুঝল।

ওদের এখন ওখানে যেতে বললেন যে ?

নরেন ফিরে তাকালো তার দিকে। হাসল একটু। সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, বললেও ওরা যাবে না, গেলে আগেই যেত।

এতটা হাঁটার পর চড়াইয়ে ওঠাটা কষ্টকর বেশ। তবু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সান্ত্বনা বাড়ি যেতে পারলে বাঁচে এখন। মন বললে, আসা উচিত হয় নি। মন জানলে আসত না। কিন্তু ভিতর থেকে আর একটা অনুভূতি যেন দ্বিগুণ বিব্রত করে তুলছে তাকে। এই অস্বস্তিকর অনুভূতিটা অনাকাঙ্ক্ষিত নয় খুব।··· বেদনাদায়ক, কিন্তু অবাঞ্ছিত নয় যেন।

এইখানে বসা যাক একটু। নরেন একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল।

চকিত দৃষ্টিনিক্ষেপ করল সান্ত্বনা। বসতে চায় না, তবু বসতে হ'ল। আপত্তি করতে গেলেই এই লোকটার চোখে আরো যেন ধরা পড়ে যাবে ও। কিন্তু ওকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না, নিজেকেও না।

কি হ'ল বলো দেখি তোমার, অমন চুপ মেরে গেলে কেন ? নরেন চৌধুরী ঘুরে বসল তার দিকে।

বড় পাথরটাও খুব বড় মনে হচ্ছে না সান্ত্বনার। বলল, ওদের ওই অত ঢাকঢোল শুনে মাথাটা সত্যি ঝিম ঝিম করছে কেমন।

বাড়ি যাবে ?

সান্ত্বনা উঠে দাঁড়াল তৎক্ষণাৎ, হ্যাঁ চলুন, বাবা হয়তো ভাবছে।

বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে অবনীবাবু উল্টো কথা বললেন। এরই মধ্যে ফিরে এলে যে তোমরা, ভালো লাগল না বুঝি ?

মায়ের কোলে বসে শিশু যেমন জাহির করে নিজেকে, বাড়ি ফিরে সান্ত্বনাও সেই চেষ্টাই করল প্রায়। হেসে বলে উঠল, ভালো আবার লাগবে না, খুব ভালো লাগল, লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি, নরেনবাবুকে ধরে রাখাই দায়।

হাসতে হাসতে ভিতরে চলে এলো। স্বতোৎসারিত নয়, ভিতরে আসার সঙ্গে সঙ্গে হাসি মিলিয়ে গেল।

রাত্রি।

ঘুম নেই সান্ত্বনার চোখে। এপাশ ওপাশ করছে খালি। আর যাবে না কক্ষনো। জীবনে আর ও-মুখো হবে না। অবশ লাগছে, ক্লান্ত লাগছে। অস্বস্তি একটা। কোথায় যেন। কিসের যেন। চোখের সামনে, কানের পরদায়, আর মনের অতলে কি সব আনাগোনা করছে। এলোমেলো দেখা, টুকরো টুকরো কথা, আর আবোল-তাবোল অনুভূতি। মাসতুত বোনের চপল ইঙ্গিত আর মাসিমার কথা। পাহাড়ের নির্জনে চাঁদমণি আর হোপুন আর চাঁদমণির হাসি। মড়াইয়ে রণবীর ঘোষ আর রণবীর ঘোষের সেই ক্লেদাক্ত চাউনি। সর্দারের কথা আর ভুতুবাবুর কথা আর বাহাদুর জমাদার। সর্দারের উৎসব আর ওই মেয়ে পুরুষদের নাচন মাতন আর মহুয়ার গন্ধ। ঝরনা আর ঝরনার সেই বন্ধু আর ঝরনা আর রণবীর ঘোষ। আর ও নিজে আর নরেনবাবু আর সেই পাথরে বসা আর সেই ভয় আর সেই···

আর সেই কি ?

অন্ধকারে অধর দংশন করে নিজেকেই যেন চোখ রাঙালো সান্ত্বনা।

আর সেই যাতনা···আর সেই ভয়-মেশানো প্রত্যাশা।

না, আর সে যাবে না, কক্ষনো যাবে না। কোন দিন না।

পরদিন ঘুম ভাঙলো খুব সকালে। হালকা লাগছে, ভালো লাগছে। আর একটু নতুনও লাগছে যেন। রাতের সেই অবসাদের বোঝা ভোলে নি। কিন্তু আজ আর সেটা তেমন সঙ্কোচের কারণ বলে মনে হচ্ছে না। তা বলে আজ

আর যাবে না কোথাও। আজ কেন, কোন দিনই যাবে না। যাক, কিন্তু ভালো লাগছে।

বেলা গড়িয়ে গেল। বেয়ারার হাতে বাবার খাবারটা পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সেলাই নিয়ে বসল একটা।

…কিন্তু এখন আবার তেমন ভালো লাগছে না। পাগল সর্দার বলেছিল ডাংরা, অর্থাৎ গোরু নিয়ে নাচ হবে আজ। গোরু নিয়ে নাচ! সে আবার কি? কতই জানে ওরা। যাই হোক, কিছুতেই আজ আর ও পথ মাড়াচ্ছে না সে।

কিন্তু ক্রমশ কেমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে লাগল। থেকে থেকে মন টানছে কোথায়।

কোথায়?

সেই শাল মহুয়ার বন পেরিয়ে, সেই দুটো গ্রাম ছাড়িয়ে সেই নাচ আর সেই আনন্দ আর সেই বিস্মৃতি-ঘন মহুয়ার গন্ধ। নেশাগ্রস্তের নেশা ছাড়ার পণ না ভাঙা পর্যন্তই যত বিড়ম্বনা। সান্ত্বনারও সেই অবস্থা প্রায়। কেন, যাবে না-ই বা কেন? কোথায় বাধা? কিসের বাধা? অন্যায় তো কিছু করছে না, তবে—?

এই তবের সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণের একটা জমাটবাঁধা প্রতিরোধ সঙ্কল্পবিচ্যুতির এক পলকা হাওয়ায় উড়ে গেল। দিনের আলোয় যাবে আর দিনের আলোয় ফিরে আসবে।

শান্তি আর মুক্তি।

বৃদ্ধ মাতব্বরেরা তখনো আসেনি। পুরুষ ও মেয়েরা পৃথক পৃথক রঙ্গরসে মেতে আছে। পুরুষেরা নিজেদের মধ্যে একজনকে মরা সাজিয়ে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। মেয়েরা গান গাইছে:

বনেরো গুড়ুরি, কি খাঁয়ে আছে বেচারি।
শিকারী তো আছে বেনা বুদা আহড়্।
শিকারী তো বেনা বুদা আহড়ে,
গুড়ুরি তো চরি চরি বেড়ায়।

বনের গুড়গুড়ে পাখি বেচারী কি খেয়েই বা আছে! গুড়গুড়ে পাখি তো খুব চরে চরে বেড়ায়, এদিকে শিকারী তো বেনাঝোপের আড়ালে।

কিন্তু ওদের মধ্যে আসল গুড়গুড়ে পাখিটিকে দেখতে পেল না সান্ত্বনা। পুরুষের মধ্যে লোপুন আছে। বসে বসে ঝিমুচ্ছে যেন। হুঁকো হাতে জগমাঝি এসে মাঝে মাঝে ঘুরে যাচ্ছে। এ ক'টা দিন বিষম দায়িত্ব তার। কোনও

ছেলেমেয়েদের মধ্যে গর্হিত কিছু ঘটলে সে দায় তার।

আসর আজও জমল খুব। কিন্তু কালকের মত লাগল না সান্ত্বনার। আজকের ব্যাপারটা যেমন আসুরিক তেমনি স্থূল। খুঁটি পুঁতে গোরু বাঁধা হয়েছে ক'টা। তাদের তেল-সিঁদুর দেওয়া হয়েছে। ঘন্টি ইত্যাদি দিয়ে সাজানো হয়েছে বেশ করে। তারপরে হৈ-হুল্লোড়! হঠাৎ এক একবার মাদল নাগরা ভেঁপু বেজে ওঠে, ভয় পেয়ে লাফিয়ে ওঠে গোরুগুলি। তার দ্বিগুণ লাফায় ওরা। মাতব্বরেরা দেখে আর হাসে। গোরু যত ভয় পায়, যত লাফায়, ওদের ততো ফুর্তি। গতকাল থেকে মদ খেয়ে সব অন্যরকম হয়ে আছে, যা করছে তাতেই আনন্দ।

চাঁদমণি কখন এসেছে খেয়াল করে নি। চোখে চোখ পড়তে আজ আরও বেশি অবাক হ'ল সান্ত্বনা। এই আনন্দ মাতামাতির সঙ্গে তার তেমন যোগ নেই যেন। কালকের থেকে আজ আরো বেশি রুষ্ট মনে হচ্ছে তাকে। সান্ত্বনা ভাবল উঠে গিয়ে কথাবার্তা বলবে ওর সঙ্গে। কিন্তু রকমসকম দেখে ভরসা পেল না। শুধু হোপুন নয়, আরো দু'পাঁচ জনের কানে কানে বলছে কি। আর তারা ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে ওকে। সে দৃষ্টিতে আর যাই থাক, হৃদ্যতা আছে বলে মনে হ'ল না সান্ত্বনার।

সুবিধে পেলে সর্দারকে হয়তো জিজ্ঞাসা করত কি ব্যাপার। কিন্তু বুড়ো একধার থেকে হুঁকো টানছে আর ঝিমুচ্ছে। এবার আর একটা আনন্দপর্ব দেখে সান্ত্বনা হেসে উঠল খুব। গান আর নাচের ভেতর দিয়ে পুরুষ আর মেয়েরা পরস্পরের নিন্দাবাদে মেতে উঠেছে খুব। সান্ত্বনা ঘাবড়ে গিয়েছিল প্রথম, ঝগড়াঝাঁটি শুরু করে দেবে নাকি রে বাবা! কিন্তু না। পুরুষেরা হাত ধরে নাচতে রাজী নয় মেয়েদের সঙ্গে, বলে তোদের হাত ভাঙা। আর মেয়েরাও পা মিলিয়ে নাচতে রাজী নয় পুরুষদের সঙ্গে, বলে তোদের পা গোদা। তারপর হাসির হাট এবং নাচ। ওদের এই আপসের রঙ্গ দেখে সান্ত্বনাও হেসে সারা।

কিন্তু হাসি থেমে গেল আবার চাঁদমণির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই। তার চোখে খুশির লেশমাত্র নেই কোথাও। দর্শকদেরও অনেকেই নাচ ছেড়ে বার বার নিরীক্ষণ করছে তাকে।

কিন্তু এ নিয়ে আর ভাববারও সময় পেল না। বেলা পড়ে এসেছে। বাড়ি পৌঁছুতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। আজ আর সঙ্গে কেউ নেই। চিন্তিত মুখে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল সে। হুঁকো হাতে পাগল সর্দার কাছে আসতে বলল, যাই সর্দার, ভয়ানক দেরি হয়ে গেল, একা একা যাব।

ঘুমঘুম চোখেও সর্দার ওর দুশ্চিন্তাটুকু উপলব্ধি করল যেন। কি ভেবে ঘুরে

দাঁড়িয়ে হোপুনকে ইশারায় ডাকল কাছে। দিদিয়াকে বাড়ি পৌঁছে দিতে বলল সে।

না না না, কিছু দরকার নেই। ব্যস্ত হয়ে উঠল সান্ত্বনা, এই তো, কতক্ষণ আর লাগবে যেতে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল।

কিছুদূর এসে পিছন ফিরে তাকাতেই দেখে, অলস মন্থর গতিতে হোপুন আসছে পিছনে পিছনে। সান্ত্বনা দাঁড়িয়ে পড়ল। বিরক্তও হল মনে মনে। হোপুন কাছে আসতে বলল, আমার সঙ্গে আসতে হবে না, তুমি ফিরে যাও, আমি একলা খুব যেতে পারব।

ঠাণ্ডা নিষ্প্রাণ চোখে হোপুন চেয়ে রইল শুধু।

সান্ত্বনা জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করল আবার। অনেকটা দূরে এসে পিছনে ফিরে তাকালো আর একবার। আর মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

হোপুন ফিরে যায় নি। তেমনি নির্বিকার পদক্ষেপেই অনুসরণ করছে তাকে।

না থেমে সান্ত্বনা দ্রুত চলতে লাগল আবার। কি মতলব লোকটার? চিন্তিত হ'ল এবারে। পর পর দু'দিনই কেমন কেমন লেগেছে। চাঁদমণির কানে কানে কথা বলা আর এদের চাউনি। দু'দিন ধরে সমান মদ টেনে চলেছে মনে পড়তে বেশ ভয়ও ধরল। রেগে গেল পাগল সর্দারের ওপর। কি দরকার ছিল সর্দারী করে ওকে সঙ্গে যেতে বলার।

বেশ জোরেই পা চালিয়েছে সান্ত্বনা। শাল মহুয়ার বন পেরোলে অনেকটা নিশ্চিন্ত। ওধারে দু'পাঁচজন লোকজনের যাতায়াত আছে।

কিন্তু এই নিশ্চিন্ত জায়গায় এসেই পা যেন একেবারে স্থাণুর মত আটকে গেল মাটির সঙ্গে। পাহাড়ী চড়াইয়ের ধারে রণবীর ঘোষের সেই জিপ। সঙ্গে সঙ্গিনী নেই আজ। জিপে ঠেস দিয়ে একলাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছে। সামনের দিকে চেয়ে আছে, এখনো দেখে নি ওকে।

ত্রিশঙ্কুর অবস্থা।

ভয়ে ভয়ে পিছন ফিরে তাকালো সান্ত্বনা। যথাপূর্ব হোপুন আসছে ঠিকই। নিজের অজান্তে দু'চার পা পিছিয়েই গেল। হোপুন কাছে এসে দাঁড়াল। সান্ত্বনা প্রায় অসহায় দৃষ্টিতেই তাকালো ওর দিকে। হোপুন দেখল ওকে; দেখল দূরের জিপটাকেও। কিন্তু কিছু উপলব্ধি করেছে কি করে নি, মুখের দিকে চেয়ে বোঝা গেল না কিছুই। পাশাপাশি এগিয়ে চলল তারা।

নীল চমশা নেই। খুশিতে একবার ঝকঝকিয়ে উঠেছিল বুঝি রণবীর ঘোষের মুখ। কিন্তু সান্ত্বনার মনে হ'ল পরক্ষণেই যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল হঠাৎ।

কি, আজও এসেছিলেন নাকি?

সান্ত্বনা ঘাড় নাড়ল শুধু। জিপে করে বাড়ি পৌঁছে দেবার আহ্বান প্রত্যাখ্যানের জন্য প্রস্তুত হয়েছে সে। ঘোষ বলল, আপনার আগ্রহ তো খুব! আমি এখানটায় প্রায়ই আসি বেড়াতে। নিরিবিলিতে বেশ লাগে।

ওই পর্যন্তই। জিপে পৌঁছে দেবার আমন্ত্রণ এলো না। সান্ত্বনা মনে মনে অবাকই হ'ল একটু।

চড়াই। আর এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল না সান্ত্বনা। হোপুনের পাশেপাশে চলতে লাগল। আড়চোখে ওকে দেখলও বারকতক। ইচ্ছে হ'ল, যা হোক কিছু কথা বলে ওর সঙ্গে। ইচ্ছে হ'ল, চাঁদমণির সঙ্গে এই চৈত্রমাসেই ওর যে বিয়ে দেবার কথা ভাবছে পাগল সর্দার, সেই সুসমাচারটা জানিয়ে দেয়। কিন্তু একটা কথাও বলা সম্ভব হ'ল না।...সঙ্গে আসছে বটে, কিন্তু ঠিক যেন জ্যান্তমানুষ নয়।

ভয় গেছে। পাহাড়ের মাথায় উঠে এসেছে তারা। আর মিনিট পনেরও লাগবে না বাড়ি পৌঁছুতে। সান্ত্বনা দাঁড়াল। খুব মিষ্টি করে বলল, এবারে তুমি ফিরে যাও হোপুন, এখন আমি ঠিক যেতে পারব।

ঠাণ্ডা দুই চোখ তুলে হোপুন তাকালো ওর দিকে। মাথা নেড়ে বলল, সর্দার তুকে ঘরতক্ এথে আসতে বুলেছে।

ওর সুবিধে-অসুবিধের কথা ভেবে সঙ্গে আসছে না সে, আসছে সর্দার বলেছে বলে। চুপচাপ পথ চলা আবার। সান্ত্বনার আনন্দ হচ্ছে একটু। চাঁদমণি যে জন্যেই ওর ওপর চটুক, আর দলের লোকের কানে কানে যাই গুজগুজ করুক, ওর জোরটা কোথায় সেটা এরা বেশ ভালো করেই জানে।

একেবারে বাড়ির দোরগোড়া পর্যন্ত ওকে পৌঁছে দিয়ে তেমনি মন্থর পদক্ষেপে আবার ফিরে চলল হোপুন।

পরদিন আর নয়। আর যাওয়ার সম্ভাবনাটা সান্ত্বনা চিন্তা থেকে বাতিল করে দিল।

কিন্তু তার পরদিন আবার...।

ভোরের আলোয় ঘুমন্ত পাখির ডানা যেমন উসখুস করে ওঠে, তেমনি এক বাঁধনছেঁড়া মুক্তির ছোঁয়ায় ওর এই একদিনের অবকাশ-আচ্ছন্ন মনের তলায় তলায় একটা টান পড়তে লাগল। মনের জোরও বেড়েছে। বিগত একদিনের আচরণে রণবীর ঘোষও তুচ্ছ হয়ে গেছে ওর কাছে।

গত দিনের থেকে আজ আবার অন্যরকম লাগছে সান্ত্বনার। প্রায় প্রথম দিনের মতই। নরেনবাবু পাশে থাকার অস্বস্তিও নেই। হাতের ফাঁকে হাত

গুঁজে নাচছে একদল মেয়ে-পুরুষ। নাচছে না, নিজেদের একেবারে সমর্পণ করে দিচ্ছে যেন। অন্য একদিকে গোল হয়ে বসে একদল মেয়ে গান ধরেছে। ভাত মাংস পরিবেশন করা নিয়ে যেন সমস্যায় পড়েছে তারা :

থোড়া থোড়া মুরগী শূকর
বহু বহু কুটুম
ভাত কিম্বা ঝোল
আমি বাবা না পারি বাটতে।

কিন্তু সান্ত্বনা আসার মাত্র ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে লাগল কেমন। আসর ঝিমিয়ে পড়তে লাগল। সান্ত্বনা প্রথমে ভাবলে, চারদিন ধরে ক্রমাগত মদ খেয়ে খেয়ে ওদের এই অবস্থা বোধ হয়।

কিন্তু না।

আজ আর শুধু চাঁদমণি নয়। শুধু হোপুন বা আর পাঁচ সাত জন নয়। ওই নারী-পুরুষেরা আজ এক প্রতিকূল স্তব্ধতায় বার বার নিরীক্ষণ করছে তাকে। আগে খেয়াল করে নি সান্ত্বনা। শুধু চাঁদমণিকেই দেখেছিল। তার রাগ-বিরাগের ধার ধারে না, সেটা বোঝাবার জন্যে আর ফিরেও তাকায় নি। রোজ কাঁহাতক ভাল লাগে। একটা দিন না আসার দরুন চোখ-কান-মন দিয়ে ওই নাচগানে বুঝি মেতে উঠেছিল সান্ত্বনা। একটু বেশিই হাসছিল বোধ হয় আজ। কিন্তু হঠাৎ একসময় মনে হ'ল যারা নাচছে আর যারা গাইছে তাদের সঙ্গে খুব যেন একটা যোগ নেই বাকি নারী-পুরুষদের। থেকে থেকে যেন একটা শিথিল ছেদ পড়ছে। হ্যাঁ, ওকেই দেখছে ওরা। মাতব্বরেরা অনেকে। নিজেদের মধ্যে কি ফিস ফিস করছে মাঝে মাঝে। ওদের চার দিনের মদ খাওয়া ঘোলাটে চোখে প্রীতির আমেজ নেই।

সান্ত্বনা অবাক! প্রথমে সঙ্কোচ, তারপর অস্বস্তি, তারপর ভয়-ভয় একটু। নাচ গান করছে যারা, সাড়া না পেয়ে তারাও ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে এদিকে। ক্রমেই অন্যরকম লাগছে। ওদের মুখের ভাব কঠিন হচ্ছে ক্রমশ। একটা অজানা আশঙ্কায় সান্ত্বনা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগল সকলের দিকে।

এরা এমন করছে কেন?

এ ভাবে দেখছে কি?

চাঁদমণি কোণের এক দিকে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন শাণ দেওয়া অস্ত্র একখানা।

হোপুনের চোখ দুটোও তার মুখের ওপর সংবদ্ধ—আরো মরা, আরো নিষ্প্রাণ।

এমন কি জগমাঝির চাউনিও অনুকূল নয়। অন্তত সেইরকম মনে হল সান্ত্বনার।

ভয়ে বিস্ময়ে হকচকিয়ে গেল একবার। তারপরেই ওর ব্যাকুল দুই চোখ বিশেষ করে খুঁজে বেড়ালো কাকে।

সর্দার কই···পাগল সর্দার ·· !

পাগল সর্দারও তাকেই দেখছিল।

দৃষ্টি বিনিময় হাত আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে তার পাসে বসল। সশঙ্ক ভীরু চোখে সান্ত্বনা তাকালো তার দিকে।

সামনের নারী-পুরুষের দিকে একটা তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পাগল সর্দার হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠল যেন—বেঁজায় বুল আকানাথ ? চেৎ হোয় এনা ? এনেঃ ই মে ! সেরিং সেরিং মে—!

বেজায় নেশা হয়েছে বুঝি ? হ'ল কি সব ? নাচ্ না ! গান কর্ না !

যেটুকুও নাচগান হচ্ছিল থেমে গেল।

সর্দার সান্ত্বনাকে বলল, চল দিদিয়া, তুকে ঘর পানে ছেড়ে আসি।

যন্ত্রচালিতের মতো উঠে দাঁড়ালো সান্ত্বনা। অজ্ঞাতসারে চাঁদমণির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হ'ল আবারও। হিংস্র ধারালো মূর্তি, পারলে সান্ত্বনার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক্ষুনি।

অনেকটা পথ এসে পাগল সর্দারই কথা বলল প্রথম। তু উদের মাজ্জনা করে লে দিদিয়া। আতভর হাঁড়িয়া খেয়ে উদের মাথার ঠিক লাই।

কাতর আবেদন কথাগুলির মধ্যে। সান্ত্বনা আস্তে আস্তে মুখ তুলে তাকালো। মদ পাগল সর্দারও কিছু কম খায় নি। শুধু এ জন্যেই নয়। কারণ আছে কিছু। কথা বলতে গিয়ে ঠোঁট কেঁপে গেল সান্ত্বনাব। বলল, কিন্তু ওরা সবাই আমার ওপর রেগে গেল কেন ? আমি কি করেছি ?

বারকতক ঘাড় নাড়ল সর্দার। পরে বলল, তু কিছু করিস লাই, তু ওজ এসে খুব হাসিস, উ-সব ভাবল উদের লিয়ে তু 'সিরোগ' (ঠাট্টা) করতে লেগেছিস। ভদ্দনোক সিরো। করলে পেচণ্ড রপমান হয়।

সান্ত্বনা হতভম্ব।—কিন্তু আমি তো একটুও ঠাট্টা করে হাসি নি সর্দার।

সর্দার বারকতক মাথা নাড়ল আবারও। অর্থাৎ, সেটা সে খুব ভালো করেই জানে। বলল, দিদিয়া যেন কিছু মনে না করে, দিদিয়া যেন 'আগ' না করে, নেশা টুটে যাক, ও ওদের সবকটাকে দেখে নেবে, সবকটাকে টেনে এনে দিদিয়ার পায়ের কাছে গড়াগড়ি করাবে।

চুপচাপ চলতে লাগল তারপর। কিন্তু ভিতরটা চুপ করে নেই সান্ত্বনার।

কেন ? কেন ওরা এমন করল আজ ?

চাঁদমণি সকলকে উসকে দিয়েছে, উত্তেজিত করেছে তাই।

কিন্তু কেন ?

কেন মড়াইয়ে চাঁদমণি সেদিন কাজ থামিয়ে অমন জ্বলন্ত চোখে ভস্ম করতে চেয়েছিল তাকে ? কেন এখানেও এমন হীন মিথ্যে কৌশলে এই নেশাগ্রস্ত নারী পুরুষদের তার বিরুদ্ধে বিষিয়ে ছিল চাঁদমণি ? প্রত্যেক দিনই সান্ত্বনা স্বচক্ষে দেখেছে সেটা, উপলব্ধি করেছে। কিন্তু কেন ? কেন ?

বলবে নাকি পাগল সর্দারকে, সকলকে টেনে আনতে হবে না, নিজের মেয়েকে শুধু জিজ্ঞাসা করে দেখো, তার কাছ থেকে কৈফিয়ৎ নাও।

কিন্তু বললে এর জের অনেক দূর গড়াবে। কিছুই বলল না। বলতে পারল না। নিঃশব্দে বাড়ি পৌছলো। নিঃশব্দে বিদায় দিল পাগল সর্দারকে। সচরাচর যা হয় না, তাই হয়ে গেল তারপর, রাগে দুঃখে অপমানে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

আর কোনদিন ওদের সংস্রবে যাবে না, আর কোনদিন কাছে টানতে চাইবে না ওদের।

কিন্তু পরের ক'টা দিনের মধ্যে এই ছোট পরিসরে আচমকা যেন ভূমিকম্প হয়ে গেল একটা। এরকম বিপর্যয় এখানকার বাসিন্দারা হয়তো আর দেখে নি কখনো। মানুষ ছেড়ে মড়াই ঘেরা শুকনো পাহাড়টা পর্যন্ত যেন নাড়া খেল একপ্রস্থ।

সান্ত্বনা জানত না কিছুই। গত দশ পনের দিন বাড়ি থেকেও বেরোয় নি বড়। সেদিনের সে অপমান তখনো ভোলে নি। খবরটা দিল ওর গোরুর জন্য বহাল আছে যে ছোকরা সে। জানালো, পাহাড়ের নিচে দোকানের রাস্তায় শ'য়ে শ'য়ে লোক জমছে আর ডাল ফেরাচ্ছে।

সান্ত্বনা অবাক।—ডাল ফেরাচ্ছে কি রে !

হিঁ গো দিদিয়া, পাগল সর্দারের 'বিটলা' হবে। উকে মেরে কেটে মাটির নিচে পুঁতে ফেলাবে এক্কেবারে।

শুনে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো দাঁড়িয়ে রইল সান্ত্বনা। বুঝল না কিছু, কিন্তু বিষম কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে পাগল সর্দারের—এটাই বুঝল শুধু। ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেন ? কেন রে ?

ছোকরাটা ততক্ষণে আরো কিছু জানার উত্তেজনায় এটুকু খবর নিয়েই আবার ছুটেছে। বিমূঢ় ভাবটা কাটতেই অস্থিরচিত্তে ঘরবার করতে লাগল

সান্ত্বনা। বাবাও নেই, সকালে নিচে নেমে গেছে, একটা খবর করারও উপায় নেই।

স্থির থাকতে না পেরে ঘরের শিকল তুলে দিয়ে পায়ে পায়ে মেনকোয়ার্টারস্-এর পথে চলে এলো। কিন্তু সেখান থেকেও বোঝা যাচ্ছে না কিছু। প্রায় নিচে নেমে আসার পর থমকে দাঁড়ালো। ভুতুবাবুর দোকান ছাড়িয়ে আরো অনেক দূরে অনেক লোকজনের একটা জটলা দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু তার থেকে বেশি দেখা যাচ্ছে তাদের হাতে হাতে পাতা সমেত ছোট ছোট শালের ডালগুলো। ভেতরটা কাঠ হয়ে আসছে সান্ত্বনার।

দুই-একজনকে জিজ্ঞাসা করল কি ব্যাপার। তারাও ব্যাপার দেখতেই চলেছে। বলল শুধু, বিটলা হবে পাগল সর্দারের।

কেন হবে?

বা রে—ওর মেয়েটা যে ঘর ছেড়ে বেজাতের সঙ্গে পালিয়েছে!

তাই ডাল ফেরাচ্ছে ওরা, গাঁয়ে গাঁয়ে খবর পাঠাচ্ছে।

সান্ত্বনা স্তম্ভিত।

আস্তে আস্তে ভুতুবাবুর দোকানের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ব্যতিব্যস্ত এখন ভুতুবাবুও। দোকানের সামনে বিভিন্ন জাতের দর্শক। নারী পুরুষদের ভিড়। রাস্তার ওপরেই চা ইত্যাদি সরবরাহ করতে হচ্ছে তাদের। তফাতে দাঁড়িয়ে ইশারায় সান্ত্বনা একজনকে বলল, ভুতুবাবুকে ডেকে দিতে।

ব্যস্তসমস্ত ভাবে ভুতুবাবু এসেই বলল, দেখুন কাণ্ড মা-লক্ষ্মী, ওই সর্দারটাকে একেবারে শেষ করে ছাড়বে সব—ওদের বিটলা বড় সাংঘাতিক ব্যাপার।

ভুতুবাবুর কথা থেকে ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝল সান্ত্বনা। বুঝে শরীরের রক্ত আরো জল হয়ে গেল। বিটলা অর্থাৎ সমাজচ্যুতি। তেমন বড় রকম কিছু না ঘটলে বিটলা সচরাচর হয় না আজকাল। কিন্তু বড় রকমেরই ব্যাপার এটা। খোদ মাঝির ছেলের বউ হবে বলে বাগদত্তা হয়ে আছে, সে পালিয়েছে বেজাতের সঙ্গে—সোজা কথা নাকি? ওই সর্দারের জন্যই এরকমটা হয়েছে, নইলে হোপুন তো আজ দু'বছর ধরে হাঁ করে বসে আছে চাঁদমণিকে বিয়ে করার জন্যে। সর্দারই ইচ্ছে করে দেয় নি বিয়ে। মাঝি-মাতব্বরদের বরাবরই বেজায় রাগ সর্দারের ওপর—ছেলেটার জন্যেই করতে পারছিল না কিছু—এবারে ছেলেই বিগড়েছে সব থেকে বেশি—কাজেই এখন পোয়া-বারো, আগের রাগও সুদে আসলে ঝালিয়ে নেবে সব। শ'য়ে শ'য়ে লোক দল বেঁধে যাবে, বাড়িঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দেবে, উঠোন কুপিয়ে ঝাঁটাবাঁশ পুঁতবে। আর সর্দার?

সর্দারকে আর পাবে কোথায়? বিটলা যার হয়, সে কি বাড়িতে বসে থাকে?

তাকে পালাতেই হয় কোথাও না কোথাও। নইলে একেবারে ছালচামড়া ছাড়িয়ে তাকে সুদ্ধ পুঁতে ফেলে দেবে না! কেউ আটকাতে পারবে না, কেউ আসতেই সাহস করবে না এ সব ব্যাপারে। পাগল সর্দার নিশ্চয় এতক্ষণে সরে গেছে কোথাও। মিটিং করে বিচার না হওয়া পর্যন্ত তাকে কেউ আটকাচ্ছে না। পরে ফিরে আসতে পারে আবার। তখন প্রাণে আর কেউ মারবে না বটে, কিন্তু সমাজ তার কাছে একেবারে বন্ধ।

নিস্পন্দের মতই সান্ত্বনা ফিরে এলো। কিন্তু বাড়ি এসে ছটফটানি চতুর্গুণ বাড়ল। কি করবে এখন? কি করা যায়? কি করার আছে? ছোকরা চাকরটা এসেছে দেখে তৎক্ষণাৎ তাকে পাঠাল বাবাকে সংবাদ দিতে। তিনি ওপরেই যেন খেতে আসেন আজ, আর খুব তাড়াতাড়ি আসেন যেন। কি ভেবে ডাকল তাকে আবার। আর শোন্, নরেনবাবুকে খবর দিবি একটা, বলবি ট্রাকে করে এক্ষুনি যেন একবার আসেন, বিশেষ দরকার।

পাগল সর্দার বিপন্ন। এতবড় বিপদ বোধ করি কারো হয় না কখনো। কিন্তু থেকে থেকে এই অপরিসীম দুশ্চিন্তার মধ্যেও মনের তলায় আর এক প্রশ্ন উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। ভুতুবাবুর সঙ্গে কথা বলার সময়েও মনে হয়েছিল, কিন্তু মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারে নি। পাগল সর্দার বিপন্ন কারণ তার ওই দজ্জাল পাজি মেয়েটা ঘর ছেড়ে চলে গেছে কারো সঙ্গে…।

…কার সঙ্গে?

এই মেয়ের দ্বারা সবই সম্ভব। তবু এতটা কল্পনাতীত। চালচলন যেমনই হোক, ওই হোপুন লোকটার প্রতি অন্তত…যাকগে, গেল কার সঙ্গে?

অবনীবাবুই বাড়ি ফিরলেন আগে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তিনিও। ট্রাক এবং লোকজন দিয়ে নরেনকে পাগল সর্দারের খোঁজ করতে পাঠিয়েছেন। বাড়িতে পাওয়া যায় নি তাকে। পেলে অন্তত বিশ তিরিশ মাইল দূরে কোথাও রেখে আসতে হবে।

অধীর প্রতীক্ষা আবার। অবনীবাবু ফিরে আপিসে বেরুবার আগেই নরেন এলো।

সর্দারের দেখা মেলেনি। ব্যাকুল হয়ে সান্ত্বনা জিজ্ঞাসা করল, কি হবে তাহলে?

কি আবার হবে, মার খেয়ে মরার জন্যে ও এখানে বসে আছে নাকি, নিশ্চয় গেছে কোথাও।

যথাসময়ে আবার আপিস করতে বেরিয়ে গেল তারা। সান্ত্বনার মন মানছে না। যদিই সর্দারকে ওরা ধরে ফেলে! যদিই খুঁজে বার করে! হিংস্র প্রতিশোধ নিতে এবার সবার আগে এগিয়ে আসবে মাঝির ছেলে হোপুন। যতবার মনে

হয় সেকথা, ততবারই কণ্টকিত হয়ে ওঠে। একটা অব্যর্থতার বর্ম আঁটা হোপুনের চোখে-মুখে চালচলনে। লোকটা সহায় হলে ভয় নেই, শত্রু হলেও রক্ষা নেই।

ডু ডু ডুম্! ডু ডু ডুম্! ডু ডু ডুম্!

আঁতকে উঠল সান্ত্বনা। দুপুর গড়ায় নি তখনো। নাগরা বাজানোর শব্দ আর কোলাহল একটা। বাইরের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল সে। এই পথেও পাহাড় ডিঙিয়ে দলে দলে লোক চলেছে পাগল সর্দারের ঘর বাড়ি উচ্ছেদ করতে। সমস্ত শরীর ঝিম ঝিম করে উঠল সান্ত্বনার। বসে পড়ল সেখানেই।

সন্ধ্যের আগেই নরেন চৌধুরী এলো আবার। কিন্তু সান্ত্বনা তখন কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহসও হারিয়ে ফেলেছে প্রায়।

নরেন বলল, পাগল সর্দার যায় নি কোথাও, সে বাড়িতেই ছিল।

অ্যাঁ—! অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল সান্ত্বনা।

ভেবো না কিছু, সে ভালো আছে।

এইটুকুই নয় শুধু। বিস্ময়ে অভিভূত হবার মতই শোনার ছিল আরো কিছু।

লাঠিসোটা কোদাল শাবল নিয়ে প্রায় হাজার লোক নাকি গিয়েছিল পাগল সর্দারের ভিটে-মাটি নির্মূল করতে। সকলের আগে ছিল গাঁয়ের মাঝি হোপুনের বাবা আর অন্য মাতব্বরেরা। তাদের ইঙ্গিত মাত্রে নিষ্ঠুর উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত সকলে।

কিন্তু মাঝি মাতব্বরদের পিছনে পটে-আঁকা ছবির মতই দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল সকলকে।

পাগল সর্দারের ভিটে আগলে পাষাণ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে একজন। হাতে তীরধনুক, পিঠে তীরের বোঝা।

হোপুন।

আদিম হিংসায় আজ সকালেও যে হোপুন তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে পাগল সর্দারকে। মড়াইয়ের সমস্ত ইট পাথর উপড়ে ফেলে যে খুঁজে বার করতে চেয়েছে ওই বাপ-মেয়েকে। যে ছেলের এত বড় প্রতিহিংসা ঠিক তত বড় করে চরিতার্থ করার জন্যই বিটলার আয়োজন মাঝির।

দূরের জনস্রোত দেখেই পাষাণ-মূর্তি হোপুনের হাতের ধনুক বেঁকে গেছে গোল হয়ে, ছিলায় পড়েছে নির্মম টান। ওই একটা তীর এক উদ্যত বাজের মত সহসা এক সহস্রের গতিরোধ করে দিল যেন।

বিমূঢ়, বিভ্রান্ত সকলে।

বাপের উদ্দেশে একবার মাত্র হুঙ্কার শোনা গেছে ছেলের।—ওদের ফিরে

যেতে বলো, হোপুন বেঁচে থাকতে একটা লোকও যেন তার তীরের আওতায় না আসে। সর্দার এখানেই আছে, যায় নি কোথাও, কিন্তু তাকে মারতে হলে দু'জনকেই মারতে হবে, আর অনেককে মরতে হবে। তাদের যেতে বলো। ওদের বলে দাও, বিটলা হবে না।

মাঝি কি করবে? কি হ'ল, কেন হ'ল, ভাবার সময়ও নেই। ছেলের হিংসা মেটাতে এসে ছেলেকেই মারবে সকলের আগে? পাগল সর্দারও পালায় নি, মরবার জন্য বসে আছে প্রস্তুত হয়ে, এও এক অভিনব খবর! শুধু মাঝি নয়, বিভ্রান্ত সকলেই।

মাঝি ঘুরে দাঁড়াল।

মাতব্বরেরাও।

বোবা পুতুলের মতো সেই সংস্কারাচ্ছন্ন সহস্রের উদ্দেশে মাঝি বলল, চলো ভাই, বিটলা হোক মারাংবুরুর ইচ্ছে নয়। পরে শুনব, পরে ভাবব।

অনুক্ষণ ছবিটা যেন চোখের সামনে ভেসেছে সান্ত্বনার। পর পর তিন দিন অধীর আগ্রহ নিয়ে মড়াইয়ে এসেছে তার পর, কিন্তু সর্দারের দেখা পায় নি! হোপুনকে দেখেছে। তেমনি উঠছে হাতের কোদাল, তেমনি নামছে।·· কিন্তু ঠিক তেমনি নয়। আঘাতে আঘাতে ঝরে পড়ছে যেন অন্তস্তলের পুঞ্জীভূত যত ক্ষোভ। সাহস করে কাছে যেতে পারে নি সান্ত্বনা।

কার সঙ্গে ঘর ছেড়েছে আর এই মানুষটাকে ছেড়েছে চাঁদমণি, সেও আর অজানা নয় কারো। মড়াই থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছে আরো একজন। বাহাদুর জমাদার। এ খবর শুনে কেন জানি সান্ত্বনার উত্তেজনা কমেছে অনেকখানি।

আরো দিন দুই পরে পাগল সর্দারের বাড়ি গিয়েছিল সান্ত্বনা।

···মানুষটা পাথর হয়ে গেছে।

বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে যেন একাকার হয়ে গেছে সান্ত্বনার। বলতে পারলে বলত, সর্দার, চেয়ে দেখো—এখনো তোমার একজন মেয়ে আছে সর্দার!

···একদিন। দু'দিন···।

মুখ ফুটে সর্দার কথা বলেছে তার পর। বলেছে, হোপুন মরদ ছে দিদিয়া, জমছিম বোঙ্গর (সূর্যদেবের) ব্যাটা আছে উঃ···

আরো কয়েকদিন গেছে তার পর।

সর্দার মেয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপনও করে নি একবার। শুধু বলেছে, আগের দিন হলে, ইতিহাসের দিন হলে, রক্তে ভেসে যেত মড়াই। ইতিহাসের যুগে, সিধু কানুর যুগেও প্রথম রক্তের বান ডেকেছিল গোরা সাহেবরা ওদের তিনটে মেয়ে

চুরি করার পরেই।

সান্ত্বনা বলতে গিয়েছিল, তাব মেয়েকে তো চুরি করে নি কেউ, আর কোন ভদ্রলোকেরও কাজ নয় এ। কিন্তু সাদা আগুন সর্দারেব শুকনো চোখে। ভয়ে চুপ করে গেছে সান্ত্বনা।

কিন্তু সর্দারের চোখের ও আগুন নিবতেও দেখেছে আবার।

হোপুনই বাঁচিয়েছে তাকে। আগেও বাঁচিয়েছিলো। কিন্তু আগে সর্দারও বাঁচতে চেয়েছিল। এবারে কোন দরকার ছিল না। তবু বাঁচিয়েছে। মারতে এসেও বাঁচিয়েছে।

পালাতে গিয়েও ফিরে এসেছিল সদার। বিটলার আয়োজন হচ্ছে জেনেও নিঃশব্দে ফিরে এসেছে। এই সংস্কারাচ্ছন্ন উন্মত্ত জনতাই সব নয়, তারও শুভার্থী সংখ্যা আছে কিছু। কিন্তু কাউকে ডাকে নি সে। হোপুন নেবে প্রতিশোধ, ডাকবে কেন কাউকে!

চুপি চুপি একজনকে দিয়ে শুধু হোপুনকেই খবব পাঠিয়েছিল সর্দার।

হোপুন এসেছিল।

নিরস্ত্র আসে নি। অস্ত্র নিয়ে এসেছিল। জিঘাংসা নিয়ে এসেছিল।

সর্দার বললে, এসো হোপুন, আমাকে মারতে চাও তো? সেইজন্যেই ফিরে এসেছি আমি। সেইজন্যেই তোমাকে ডেকেছি।

হোপুন দেখেছে তাকে। সেই খুন-চোখে হাড়-পাঁজরা সরিয়ে সরিয়ে দেখেছে একেবারে। তার পর কথা বলেছে।—চাঁদমণির সঙ্গে এত দিন আমার বিয়ে দাও নি কেন?

দিই নি, তুমি 'ছাড়ই' হতে বলে। ছাড়ই হয়ে আমার মতো চিরকাল জ্বলতে বলে।

আরো বলেছে সর্দার। বলেছে, বিয়ে দেয় নি নিজের মেয়েকে সে চিনত বলে, আর ওই মেয়ের মাকে চিনত বলে—আর ওই মেয়ে কারো ঘরে থাকবে না জানত বলে।

কিন্তু এসব বলো নি কেন কখনো? নিষ্পলক চোখে চেয়ে হোপুন জিজ্ঞাসা করেছিল।

বলে নি চাঁদমণি যেমন মেয়েই হোক নিজের মেয়ে বলে, আর···একদিন শুধরে যেতেও পারে, মনে মনে এই আশা না করে পারত না বলে।

কিন্তু বিয়ে হলে শুধরে যেতেও পারত। চোখ থেকে খুন সরে যাচ্ছে হোপুনের।

পাগল সর্দার জবাব দিয়েছে, হোপুনের বয়সে সেও কম জোয়ান, কম মরদ, কম প্রিয় ছিল না মেয়েদের। কিন্তু তবু চাঁদমণির মা ফুলমণি তাকে ছেড়ে গিয়েছিল। হোপুন তার বুকের পাঁজর। সে পাঁজর সে ভেঙে দিতে চায় নি বলেই অপেক্ষা করছিল আর আশা করছিল।

হোপুন দেখছিল চেয়ে চেয়ে। নির্নিমেষে দেখছিল আর চোখ থেকে খুন সরে যাচ্ছিল।

তার পরে, অনেকক্ষণ পরে, পায়ে পায়ে হোপুন বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে।

আবার ফিরেছে।

ধনুক নিয়ে। আর তীর নিয়ে।

—আট—

মড়াইয়ের চেহারা বদলে যাচ্ছে একটু একটু করে, সেটা বেশ বোঝা যায় এখন। প্রতিরোধের এক-একটা সাদা পাষাণ অঙ্কুর গজাচ্ছে এখানে সেখানে। দিনে দিনে বাড়ছে সেগুলো। শুকনো গৈরিকের মাধুরী বিদীর্ণ করা শ্বেতকায় স্ফীত স্তম্ভগুলো পরস্পরের সঙ্গে এসে মিলবে একদিন, বাতাস চলাচলেরও ফাঁক থাকবে না মাঝে, সেটা এখনো অবশ্য বোঝা যায় না। ওগুলোকে এরা বলে ব্লক। যে যার পৃথক সত্তায় মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে এখন। ওর প্রত্যেকটার পিছনে যে এত জল্পনা-কল্পনা, এত কারিগরি, এত অসংখ্য ছোট বড় প্রয়াস পাষাণবন্দী হয়ে আছে, চোখে দেখেও ঠাহর করা শক্ত।

ঋজু কঠিন এক প্রকাশের তপস্যায় বসেছে মড়াই, তার আভাস সর্বত্র। মড়াইয়ের বুকের এক-একটা অতিকায় গহ্বর যেন অমনি করে নিটোল পাষাণ-প্রাচীরে ভরে ওঠার জন্য উন্মুখ তাগিদ দিচ্ছে নিঃশব্দে। কাজ বাড়ছে। কাজের তাগিদে বাড়ছে। মাশুলও দিতে হচ্ছে এক এক সময় বড় কম নয়। ছোটখাটো অঘটন ঘটে যাচ্ছে মাঝে মাছেই। গোড়ায় গোড়ায় এত হয় নি। কিন্তু এত বড় সৃষ্টির বেদিতে এটুকু অর্ঘ্য না দিলে নয়, এও যেন মেনে নিয়েছে সকলে। দুর্ঘটনা হয়, জীবনেরও অবসান ঘটে দু'টো চারটে। কেন হ'ল বা কার দোষে হ'ল সেটা পরের ব্যাপার, নথিপত্রের ব্যাপার। মড়াইয়ে বোবা শঙ্কার ছায়া নামে কিছুক্ষণের জন্য বা কিছুদিনের জন্য। তার পর আবার কাজ, আবার কাজের তাগিদ। তুমি চাও বা না চাও। এই সৃষ্টির সঙ্গে তোমার সকল গ্রন্থির

অমোঘ বাঁধন পড়ে গেছে একটা।

কিন্তু সেদিনের অঘটনটা অন্য রকমের। যেমন ঘটে সচরাচর, তেমন নয়।

ছোট্ট এক দূষিত ক্ষত যেমন পারে গোটা একটা দেহ বিষিয়ে পঙ্গু করে ফেলতে, চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলির চোখে তেমনি হঠাৎ এক ধ্বংসকীট বুঝি গোচর হ'ল এত বড় সৃষ্টি-সমারোহের মর্মস্থলে। কিন্তু খুব সহজে নির্মূল করার মত ক্ষীণায়ু নয় সেই ধ্বংসকীট। ফলে অনাগত এক কালবৈশাখীর শঙ্কা জাগল অনেকের মনে।

ঘুরে ঘুরে মড়াইয়ের কাজ দেখছিল। আরও জনা-দুই অফিসার ছিলেন সঙ্গে। কথায় কথায় একজন অফিসার খবর দিলেন, অমুক ব্লকএ বড় রকমের একটা ফাটল দেখা গেছে, মাটির নিচে যা আছে আছে—ওপরের এক দিক ভেঙে আবার নতুন করে জুড়তে হবে। মাটির ওপর সামান্যই তোলা হয়েছে, কাজেই অসুবিধে হবে না খুব।

শুনে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের মনে খটকা লাগল কেমন। বলল, চলুন দেখে আসি।

দেখে খটকাটা বাড়ল আরো। আড়াআড়ি ফাটল একটা। অনেক কারণে হতে পারে। পঞ্চাশ-ষাট ফুট চওড়া দেয়ালের সেই ফাটলের দিকটা ভেঙে আবার মেরামত করে নেওয়া কঠিন কিছু নয়। কিন্তু ভিতরটা খুঁতখুঁত করতে লাগল বাদল গাঙ্গুলির। ভাবল কিছুক্ষণ। ল্যাবরেটারী অ্যাসিস্ট্যান্টদের ডেকে পাঠালো।

নির্দেশমত তার পর সিমেন্ট কন্‌ক্রীট তুলে নিয়ে যথাবিধি পরীক্ষা-পর্ব। ফিজিক্যাল টেস্ট কেমিকেল টেস্ট প্রেসার টেস্ট। পরিস্থিতি জটিল হয়ে দাঁড়ালো আরো। মিক্‌শ্চারে সিমেন্টের অংশ নির্দিষ্ট পরিমাণ থেকে অনেক কম। এক ফাঁক খুঁড়তে তিন ফাঁক বেরুলো। কন্‌ক্রীট তৈরী হচ্ছে যেখানে সেখান থেকে সিমেন্টের স্যাম্পল্ এনে নিজে সামনে দাঁড়িয়ে একে একে আবার যাবতীয় পরীক্ষা করালে বাদল গাঙ্গুলি। পাথরগুঁড়ো আর জমাটবাঁধা সিমেন্টও মেশানো তাতে।

মাথাটা ঘুরে উঠল কেমন।

মিক্‌শ্চারে সিমেন্টের পরিমাণ পরীক্ষা করার কথা নিজেদের তরফ থেকেও। মাঝে মাঝে করাও হয়। কিন্তু নিয়ম যাই হোক, এত বড় কাজে হামেশা সম্ভব নয় সেটা। বিশ্বাসের ওপরেই ছেড়ে দিতে হয় বেশির ভাগ। আর এ ধরনের অঘটনও হয় না বড়। বিশেষ করে ঘোষ-চাকলাদারের মত এতদিনের এত বড় ফার্মকে অবিশ্বাস করার কারণ নেই কিছু। সরকারের কাছ থেকেই সিমেন্ট কিনে বরাবর সরকারী কাজ চালিয়ে আসছে তারা।

পায়ে পায়ে মড়াইয়ের দিকে চলল আবার বাদল গাঙ্গুলি। সঙ্গে নরেনকে

ডেকে নিল।

কী ব্যাপার? নিষ্প্রভ মূর্তি দেখে নরেন অবাক।

এসো। ব্লকটার কাছে এসে আঙুল দিয়ে ফাটলটা দেখিয়ে দিল।

ফেটে গেছে? তেমন না ভেবেই নরেন বলল, তা ভালো করে একটু প্লাস্টার করে দিলেই তো হয়।

থামো। নিস্পন্দ-মূর্তি মানুষটা ঝাঁজিয়ে উঠল হঠাৎ। তার পর সংক্ষেপে বলল ব্যাপারটা।

চুপচাপ অনেকক্ষণ। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে সরে যাচ্ছে বাদল গাঙ্গুলির। অস্বাভাবিক জ্বলজ্বল করছে চোখের তারা দুটো। ওই হাঁ-করা ফাটলটা বড় হয়ে হয়ে যেন সমস্ত মড়াই জুড়ে বসছে, আর এত বড় ড্যাম কনস্ট্রাকশন নিঃশেষে মিলিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে।

সব শুনেও ব্যাপারটা অত বড় করে দেখে নি নরেন চৌধুরী। তবু নীরব সেও। এই অসহিষ্ণু বিক্ষোভের হেতু জানে। নিজের হাতে গড়া যে সৃষ্টি-সমারোহ ভেঙে গুঁড়িয়ে খান খান হয়ে গেছে একদিন, মানুষটার ভিতরে সেই ফাটল মিলায় নি আজও। এখানকার এত বড় এই সৃষ্টির কণায় কণায় একদিনের মর্মচ্ছেদী পরাজয়ের নিখুঁত একটা পাল্টা জবাব লিখে রাখতে চায়। এই অমরতার আয়োজন দিয়ে দ্বিগুণ নিটোল করে ভরে তুলতে চায় সেদিনের সেই ব্যর্থতার ফাটলটা। ব্লকের ফাটল দেখে সেই পুরনো স্মৃতিই মুখব্যাদান করে আসছে আবার।

চলো, কি এমন হয়েছে, আপিসে বসে যা হয় ভেবেচিন্তে ঠিক করা যাবে-'খন। হালকা করে দিতে চাইল নরেন চৌধুরী।

কিন্তু আপিসে ফিরেই যে ব্যবস্থা করল চিফ ইঞ্জিনিয়ার তাতে অন্য সকলেই উতলা হয়ে পড়ল বেশি। অফিসার এবং কর্মচারীদের ডাকিয়ে সোজা হুকুম দিল, ঘোষ-চাকলাদারের সিমেন্ট দিয়ে যেখানে যা কাজ হচ্ছে সব বন্ধ করে দিতে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারকে তলব করে পাঠালো তার পর।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, অর্থাৎ ঝরনার বাবা মিঃ চ্যাটার্জী। স্ত্রী টি-পার্টি দিন আর যাই করুন, ভদ্রলোক অনুকূল আশা পোষণ করেন না খুব। ওপর-অলাটিকে মনে মনে বরং সমীহই করেন একটু।

বসুন। শুনেছেন সব?

মিঃ চ্যাটার্জী মাথা নাড়লেন, শুনেছেন।

কি করবেন এখন?

চিন্তিত মুখে ভদ্রলোক ভাবলেন একটু।—কি আর করা যাবে···গ্রাউণ্ড-

ওয়ার্কএর কাজে লাগিয়ে দিতে বলি এ লটের মেটিরিয়াল, আর ঘোষ-চাকলাদারকেও নোটিস দিই একটা, কেন এরকম হ'ল···

কিন্তু না জানতে পারলে ওই দিয়েই আমরা ইরেকশনের কাজ করতাম, তার পরের কথা ভাবুন।

নিরুপায় মিঃ চ্যাটার্জী হাসলেন একটু। বললেন, কিছুকাল বাদে ক্র্যাক্ হ'ত, রিপেয়ারের হাঙ্গামা লেগে থাকত···এরকম অবশ্য হওয়া উচিত নয়, কিন্তু দেখলাম তো অনেক···

চেয়ার ছেড়ে উঠে স্বল্প-পরিসর ঘরের মধ্যেই বারকতক পায়চারি করে নিল চিফ ইঞ্জিনিয়ার। সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াল তার পর।—শুনুন, হেড অফিসে ইন্টিমেশন পাঠান, আর ঘোষ-চাকলাদারকে এক্ষুনি নোটিস দিন মাল তুলে নিয়ে যাক। হেড অফিস থেকে ইনস্ট্রাক্শন এলেই বলে দেবেন, সাত দিনের মধ্যে গো-ডাউন্ও খালি করে দিতে হবে।

ভদ্রলোক মহা ফাঁপরে পড়লেন যেন। নরেন একটা কথাও বলে নি এতক্ষণ। নির্দেশ শুনে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল সেও। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার দুর্ভাবনাটা প্রকাশ না করে পারলেন না শেষ পর্যন্ত।—একেবারে এতটা কি ঠিক হবে?

যা বললাম করে পাঠিয়ে দিন, আমি সই করছি।

চেয়ারে বসে অসহিষ্ণু হাতে একটা ফাইল টেনে নিল সে। আর বাক্যব্যয় না করে সোজা প্রস্থান করলেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার।

নরেন তেমনি চুপচাপ বসে রইল আরো কিছুক্ষণ। হালকা শিস দিল একটু। হাসলও।

বেশ।

সাড়াশব্দ নেই।

বলব কিছু, না সরে পড়ব?

হুঁ। ফাইলে নিবিষ্ট।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার, না বাদল গাঙ্গুলি···কাকে বলি?

খট্ করে বন্ধ হয়ে গেল হাতের ফাইল। সোজা তাকালো মুখের দিকে। খুব স্পষ্ট করে জবাব দিল, চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে।

বিরূপ না হয়ে হাসি মুখেই বলল নরেন, তাহলে আর হ'ল না আপাতত, পরে হবে'খন কথা—

পরদিন গো-ডাউনএ দ্বিজেন চাকলাদারের হাতে পড়ল নোটিসটা।

রণবীর ঘোষ কাছাকাছি গেছে কোথায়। তক্ষুনি লোক পাঠালো তাকে ডেকে নিয়ে আসতে।

এসব ঝামেলা পছন্দ নয় দ্বিজেন চাকলাদারের। লাভ যত বাড়াতে পারবে বাড়াও, সে জন্যে যা করা দরকার করো, কিন্তু গোলযোগে পড়ার সম্ভাবনা আছে এমন কিছু কোরো না। যদিও অর্থে-সামর্থ্যে যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে আজ ঘোষ-চাকলাদার ফার্ম, তাকে অল্পবয়সী এক ইঞ্জিনিয়ারের এরকম চোখরাঙানিকে খুব একটা পরোয়া করে না দ্বিজেন চাকলাদারও। দু-পুরুষের ব্যবসা, সরকারী কাজও কম করল না আজ পর্যন্ত, এখানেও এত বড় কাজ নিয়েছে, বাদল গাঙ্গুলির সুপারিশে নয়, হেড অফিসের দাক্ষিণ্যে। তবু এসব ঝামেলা কে চায়! আর কিছু না হোক দুর্নাম তো একটা। কিন্তু দ্বিজেন চাকলাদারের পক্ষে রণবীর ঘোষকে সামলানো শক্ত। এই সাতসকালেই কোথায় কার পিছনে ঘুরছে ঠিক কি—। ব্যবসায় কুশাগ্র বুদ্ধি, কিন্তু যা হচ্ছে দিন-কে-দিন, ব্যবসা করাবে কাকে দিয়ে।

রণবীর ঘোষ এলো। নোটিস পড়ল। ঠোঁটের ফাঁকে বক্ররেখা।—ও বাবা! একেবারে বাতিল! নোটিসটা ফেরত দিয়ে হাঁটুর ওপর পাইপ ঠুকল বারকতক।—ছেলে-ছোকরার হাতে এত বড় কাজের ভার, ওরা যুধিষ্ঠিরের ভায়রাভাই-ই হয়ে থাকে প্রথম প্রথম। চলো, পিঠ চাপড়ে আসি।

প্রথম যোগাযোগে রণবীর ঘোষের ওপর মনে মনে প্রসন্ন ছিল চিফ ইঞ্জিনিয়ার। তার ঘনিষ্ঠ সংসর্গে আসে নি কখনো। তবু হৃদ্যতা ছিল কিছুটা। সেটা কর্মগত।

মড়াইয়ের কাজে প্রথম দিকের বিঘ্নোত্তরণের সময় রণবীর ঘোষের সহায়তা ছিল কিছু। গোড়ায় গোড়ায় কুলি আমদানির ব্যাপারে সাহায্য করেছে। একটা সময় গেছে যখন একসঙ্গে পঞ্চাশজন কুলির আবির্ভাবও শুভ সূচনা বলে ভাবত। রণবীর ঘোষের কাজের অন্তর্গত নয় সে কাজ। নয় বলেই এই সহযোগিতায় তার কর্মক্ষমতা প্রতিপন্ন হয়েছে।

নিজের স্বার্থের দিক থেকে মানুষকে যাচাই করার এবং খুশি করার নিজস্ব একটা পদ্ধতি আছে রণবীর ঘোষের। প্রথম সংযোগে কর্মকর্তাদের সম্বন্ধে তার সুপটু বিশ্লেষণ। খুশি হতে সকলেই চায়। পরিতোষণের ভক্ত নয় কে? শুধু জেনে নাও, খুশি করার যাদু-নীতিটি কার বেলায় কি?

মড়াইয়ের এই সর্বাধিনায়কটিকে বুঝে নিতে অন্তত সময় লাগে নি একটুও। এজন্য কোনরকম দুরূহ জটিলতার আবরণও ভেদ করতে হয় নি তাকে। সিমেন্টের সঙ্গে বালু মেশানোর মত কাজের সঙ্গে কাজের আড়ম্বরটুকুও নিপুণ সমতায় বেশ

করে মিশিয়ে দিতে পারলে নির্বিঘ্ন আস্থার ভিতটা পাকাপোক্ত হবে এটুকুই বেশ করে বুঝে নিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল রণবীর ঘোষ। কাজের বাইরে এই জন্যেই আর কোনরকম ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের চেষ্টাও করে নি সে। করলে, ভুল হবে জানত। দেখা হয় প্রায়ই, যে যার 'নড্' করে শুধু। আলোচনা উঠলে সপ্রতিভ অথচ সপ্রশংস চোখে কনস্ট্রাকশনের কাজের দিকে চেয়ে চেয়ে বলে, এ চোখ জহুরীর চোখ মিঃ গাঙ্গুলি···এই মরা জায়গায় প্রাণ আসছে সেটা বোঝা যাচ্ছে বেশ।

সেই গোড়া থেকেই তার জহুরীর চোখ বাদল গাঙ্গুলির সামনে এই মরা জায়গায় প্রাণসঞ্চারের সূচনা দেখে আসছে।

ব্যক্তিগত তোষামোদে নয়, এ ধরনের কর্মগত তোষণে চিফ ইঞ্জিনিয়ার তুষ্ট হ'ত বৈকি।

পার্টনারের কাছে সবিদ্রূপে এই পিঠ চাপড়ানোর কথাই বলেছে রণবীর ঘোষ।

সকালের রাউণ্ডে বেরিয়ে বাদল গাঙ্গুলি মড়াই থেকে সরে উপরে উঠে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছু নির্দেশ দিচ্ছিল জনা-দুই কর্মচারীকে। সঙ্গে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার আছেন, নরেন আছে। জিপ থেকে নেমে টক্ টক্ করে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রণবীর ঘোষ।—গুড মর্নিং, স্যার, গুড মর্নিং, ভালো আছেন?

বাদল গাঙ্গুলি ফিরে তাকালো। চোখে চোখ রেখে সামান্য মাথা নাড়াল শুধু। কর্মচারীদের সঙ্গে কথা শেষ করে বলল, আসুন।

ওপর থেকেই একাগ্র নিবিষ্টতায় নিচের কনস্ট্রাক্শনের দিকে চোখ রেখে অগ্রসর হ'ল রণবীর ঘোষ। ঘ্রাণে বাতাস বোঝে। জহুরী আজ মরা-জায়গায় প্রাণসঞ্চারের বিপুল উচ্ছ্বাস মুখে ব্যক্ত না করে চোখেই ফোটালে।

নীরবে আপিসের দিকে চলেছে বাদল গাঙ্গুলি। পিছনে নরেন এবং অ্যাড-মিনিস্ট্রেটিভ অফিসার। রাস্তার পাশে দ্বিজেন চাকলাদার জিপে বসে। ইশারায় তাকে অপেক্ষা করতে বলে রণবীর ঘোষ হাসিমুখে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের পাশে পাশে চলল।

অফিসঘরে সকলে বসল। ঘোষ বাদল গাঙ্গুলির সামনে, মুখোমুখি। দু'চার মুহূর্তের নিঃশব্দ দৃষ্টি বিনিময়।

বলুন—

ঘোষ হাসল।—আপনার নোটিস পেলাম।···আই অ্যাম সারপ্রাইজড্··· বাট্ ইট্স ওয়ানডারফুল···আই মাস্ট্ সে ইট ইজ্ ওয়ানডারফুল। এরকম শক্ত হওয়াই দরকার—

বাদল গাঙ্গুলি চেয়ে আছে। প্রতীক্ষা করছে।

রণবীর ঘোষ আবার বলল, আপনি ঠিকই করেছেন, তবু একটা কথা কি জানেন মিঃ গাঙ্গুলি, সিমেণ্ট তো আমরা নিজে তৈরি করিনে, কিনে নিয়ে আসি মাত্র, কি করে জানব বলুন এই কাণ্ড হয়ে আছে!

এবারে জবাব দিল বাদল গাঙ্গুলি। শান্তমুখে বলল, আপনার তো জহুরীর চোখ—জহুরীর চোখ শুধু খাঁটি চেনে না মিঃ ঘোষ, নকলও চেনে।

ঘোষ থমকে গেল। সজোরে হেসে উঠল তারপর।—ওয়ানডারফুল! ঘাট মানছি আপনার কাছে, কিন্তু এ ভুলটা সত্যি ভুল।

মিক্‌শ্চারে যে প্রোপোরশন সিমেণ্ট মেশাবার কথা, মেশানো হয় নি—

নিশ্চয় হয় নি। শেষ করতে দিল না ঘোষ।—হলে আর আপনি লিখবেন কেন?···কথা হ'ল, আপনাদের যেমন লোক আছে প্রোপোরশন যাচাই করে নেবার জন্য, অথচ দেখা হয়ে ওঠে না সব সময়, তেমনি আমারও নিজের চোখেই দেখার কথা সব, কিন্তু আসলে নির্ভর করতে হয় দশ জনের ওপর। যাক, সেদিকটা ভালো করেই দেখছি এবার আমি।

কর্তৃপক্ষের গলদের কথাটাও পরোক্ষে স্মরণ করিয়ে আরো ভুল করল রণবীর ঘোষ। ধীর কণ্ঠে বলল বাদল গাঙ্গুলি, কিন্তু আপনার সিমেণ্টএ স্টোন ডাস্ট পাওয়া গেছে—জমাট-বাঁধা সিমেণ্টও গ্রাইণ্ড করে মেশানো হয়েছে।

বললাম তো, এ ব্যাপারে আমাদের হাত কোথায়, সরকারের কাছ থেকে যেমন পাই কিনে নিয়ে আসি···

তাহলে তাদের দায় তারা বুঝবে, আপনার আর কি! আমি ও দিয়ে কাজ হতে দেব না।

ব্যাপার কি জানেন, ঘোষের মুখে অমায়িক হাসিটুকু লেগে আছে, এ ভুলের দায় শেষ পর্যন্ত আমাদের কাঁধেই চাপবে, মাল যখন একবার বুঝে নিয়েছি, ঠিক জিনিস পাই নি প্রমাণ করব কি করে! কিন্তু এতদিনের এত বড় ফার্ম আমাদের, তাদের কাছ থেকে খাঁটি নিয়ে আমরা গণ্ডগোল করেছি এ তো আর আপনি বলবেন না···এখন কি করতে পারি তাই বলুন।

ক্রমে ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে। তবু ক্ষুদ্র জবাব দিল, মাল তুলে নিয়ে যান, আর গো-ডাউন খালি করে দিন।

এ কথা শোনার জন্যে আসে নি ঘোষ। সুন্দর হতাশার ভঙ্গি করল একটা। —এ তো মশা মারতে একেবারে কামান—যাক্ গে। দু'চার মুহূর্ত ভেবে একটা সমাধান বার করল যেন, বলল, এ মালটা আপনি না হয় ভিত-টিতএর কাজে

লাগিয়ে দিন, এর পরে আমি দেখছি।

কি আর দেখবেন? অনুচ্চ কঠিন কণ্ঠে বলল বাদল গাঙ্গুলি, আমাদের চরিত্রের ভিতটাও ভেজাল মিশে মিশে এমন হয়েছে যে ওর ওপর আর পাকা কিছু টেকে না। যাক, গণ্ডগোল আরো বাড়ার আগে যা বললাম তাই করুন—এদিকে হেড অফিসকে যা ইনস্ট্রাকশন দেবার আমি দিয়েছি।—

হেড অফিস···! সপ্রতিভ ভাবটুকু আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল ঘোষের মুখ থেকে। বলল, দেখুন মিঃ গাঙ্গুলি, দু'পুরুষের এত বড় ফার্ম আমাদের, লাখ দু'লাখ গেলেও খুব যায় আসে না, কিন্তু এতে গুড-উইলটা যাচ্ছে···সেটা ঠিক···। বুঝতে পারছেন। হেড অফিসের ব্যবস্থা আমি করছি, আপনি শুধু আপনার অর্ডারটা তুলে নিন। একেবারে নিখুঁত আর কোন্ জিনিসটা হয় বলুন?

বাদল গাঙ্গুলি বলল, আপনার ওই দু'পুরুষের গুড-উইলেও খুঁত একটু থাকুক তাহলে। আপনি বলতেন, মরা জায়গায় প্রাণ আসছে—কিন্তু আমি নিখুঁত প্রাণই আনতে চাই, বিকল প্রাণ নয়!

পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল তারা। ঘরের বাকি দু'জন নির্বাক মূর্তির মতো বসে আছে। কন্ট্রাক্টারের চোখে মুখে বিদ্বেষ, বিদ্রূপ, কৌতুক। হাতের পাইপ আস্তে আস্তে টেবিলে ঠুকল দু'চার বার।

আর তাহলে আপাতত কোন কথা নেই?

আপাতত নেই, আর এ সম্বন্ধে পরেও নেই।

পরের কথা ভবিষ্যতের কথা, চেয়ার ছেড়ে উঠে সহাস্যেই বলল ঘোষ, কে আর জোর করে বলতে পারে বলুন, হতেও পারে আবার কথা, বাট্ ইউ আর রিয়েলি ওয়াণ্ডারফুল! ভারী খুশি হলাম।

ঝকঝকে চকচকে এক জোড়া চোখ সকলের মুখের ওপরে বুলিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল ঘর থেকে।

ভেজালকে নিখুঁত করার জন্য ওই সিমেন্টের সঙ্গে একটা অন্তত জ্যান্ত মানুষকে চটকে মিশিয়ে দিতে পারলে দিত।

সন্ধ্যার পর বাদল গাঙ্গুলির কোয়ার্টার থেকেই ফিরছিল নরেন। ভেবেছিল বলবে কিছু। কিছু বোঝাবে। কিন্তু সে চেষ্টা আর করে নি। মাটির কণায় আকর্ষণ, বালুর কণায় বিচ্ছেদ। মাটির আভাস পেলে চেষ্টা করে দেখত।

অবনীবাবুর বাড়ির বাইরের ঘরে পা দিয়েই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এরকম আগুন-গলানো কণ্ঠস্বর আর বড় শোনে নি।

কেটে কুচি কুচি করে ওকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলে না কেন তোমরা? পাষণ্ড

বলছে।

কি বকছিস রে তুই পাগলি আবোল-তাবোল! অবনীবাবু বললেন।

সান্ত্বনা বলতে যাচ্ছিল আবার কি। পায়ের শব্দে থেমে গেল। এ ঘরে এসে নরেন বাপ মেয়ে দু'জনকেই দেখল একবার। পরে সান্ত্বনার উদ্দেশে বলল, কি ব্যাপার, ধান ফেললে যে খই ফোটে! অবনীবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, কাকে কেটে কুচি কুচি করছে?

অবনীবাবু হেসে জবাব দিলেন, কন্‌ট্রাক্টার রণবীর ঘোষকে।

হা হা শব্দে হেসে উঠল নরেনও। ফলে তার ওপরই রেগে গিয়ে ভেঙচি কেটে উঠল সান্ত্বনা, হা হা হা হা—যেন কি একটা মজার কথা হ'ল!

মনে মনে এ সময় এমনি হালকা অবকাশ-বিনোদনই চাইছিল বোধ হয় নরেন। জাঁকিয়ে বসল অবনীবাবুর কাছাকাছি।—বেশ, মজার কথা না হয় নাই হ'ল, ধরা যাক কেটে কুচি কুচি করা হ'ল লোকটাকে, কিন্তু গঙ্গায় ভাসাবে বলছিলে, এখানে গঙ্গা পাবে কোথায়?

বাবার অলক্ষ্যে আবার বড় রকমের একটা ভেঙচি কাটতে যাচ্ছিল সান্ত্বনা, কিন্তু তার আগেই অবনীবাবু বললেন, তুই এবার তোর কাজে যা দেখি, খবর শুনতে দে এদিকের। নরেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হ'ল, বুঝিয়ে বললে তাঁকে?

নাঃ। বলেও লাভ নেই কিছু।

'কিন্তু এ তো ভালো কথা নয়। এত বড প্রতিপত্তিশালী লোক···কত কুলি মজুর পর্যন্ত তার মুখের কথায় ওঠে বসে, কি ফ্যাসাদ যে বাধায়···তা ছাড়া হেড অফিসেও তো তার জোর কম নয়!

যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল সান্ত্বনা। নরেন কিছু বলার আগে সে-ই অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠল, কি যে তুমি বলো বাবা ঠিক নেই, প্রতিপত্তিশালী বলে যা খুশি তাই করবে! আর পাঁচজন নেই? নাকি হেড আপিসের চোখ কানা?

নরেন এবারে নিজের মাথার ওপর এক চক্কর আঙুল ঘুরিয়ে টিপ্পনী কাটল, তোমার এই হেড অফিসের সঙ্গে সে হেড অফিসের কিছু তফাৎ আছে।

সান্ত্বনা চটে গেল।—আর আপনার হেড আপিসের সঙ্গে সে হেড আপিসের পরম মিল আছে!

এক রকম রাগ করেই ঘর ছেড়ে চলে গেল।

নরেনের সঙ্গে সঙ্গে অবনীবাবুও হেসে উঠেছিলেন। কিন্তু হাসি থেমে গেল। ···ভাবছেন কিছু। ভদ্রলোকের এ ধরনের বিস্মৃতি নরেন আগেও দেখেছে।

সেই পুরানো কথাই ভাবছেন ওভারসিয়ার অবনী রায়। ভাবনাটা প্রকাশ

করেই ফেললেন আজ। বললেন, নিজের আগ্রহে বদলী হয়ে এসেছিলাম এখানে···কিন্তু প্রায়ই মনে হয়, কাজটা বোধ হয় ভালো করি নি।

কনট্রাক্টার রণবীর ঘোষের সমস্যা আপাতত সরে গেছে মন থেকে। নরেন চুপচাপ চেয়ে রইল তাঁর দিকে। এই জল নিয়ে বা ড্যাম নিয়ে এত আগ্রহ কেন সান্ত্বনার—এতদিনে অনেকটাই জেনেছে। কিন্তু ভদ্রলোক আজ হঠাৎ এ কথা বললেন কেন বুঝে উঠল না।

এত বড় কাজের মধ্য দিয়ে জীবনের এক ব্যর্থ অপমানকে পেরিয়ে চলছিল বাদল গাঙ্গুলি।

অনেক দিন হয়ে গেল কী!···কিন্তু মাত্র সেদিন যেন।

অল্প সময়ের মধ্যে এক আটতলা ম্যানসন তুলে দেওয়ার কণ্ট্রাক্ট নিয়েছে নেশন বিলডার্স লিমিটেড। এত বড় দায়িত্ব ও কোম্পানী নিতে পারে অবলীলাক্রমে।

সেই প্রথম নিজের হাতে বড় কাজের ভার পেয়েছিল বাদল গাঙ্গুলি। হোক বিলেত জার্মান ফেরত ইঞ্জিনিয়ার, হোক পদস্থ কর্মচারী, হোক ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের ভাবী জামাই—বাসনার ভরা জোয়ারে সেই ওর প্রথম অবগাহন আর প্রথম রোমাঞ্চ···।

প্রাথমিক ব্যবস্থাদি সুসম্পূর্ণ। দিনে পাঁচবার করে গিয়ে 'সাইট' দেখে আসছে। কাজ আরম্ভ করলেই হয় এবার। করতেও হবে।

কিন্তু মনে খট্‌কা বাধল একটা।

ছোট কাঁটার মতো কি যেন একটা খচ খচ করতে লাগল ভিতরে ভিতরে। বিল্ডিংয়ের ডিজাইন করেছেন স্বয়ং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। খাতিরের পার্টি, খাতিরের তাগিদ। পাকা হাতের পাকা ডিজাইন। বলার নেই কারো কিছু। বাদল গাঙ্গুলিরও না। কিন্তু তার দুশ্চিন্তার হেতু অন্য।

সর্বপ্রথম নরেন চৌধুরীর কাছে সন্দেহটা ব্যক্ত করেছিল।—কেমন যেন লাগছে হে, আগে একবার সয়েলটা টেস্ট করে নিতে পারলে হ'ত, ওরকম জমিতে এত বড় কনস্ট্রাকশন যদি না টেকে?

সাড়ম্বরে নিজেই দুই কান চাপা দিয়েছে নরেন।—সর্বনাশ! তুমি না হয় জামাই হতে চলেছ, আমার চাকরিটা খাবে? আমি বাবা এসবের মধ্যে নেই। পরে পরামর্শ দিয়েছে, ঈশ্-বি ফাদার-ইন্-ল'কে বলেই ফেল না চোখকান বুজে।

সেটা পেরে উঠছে না বলেই যত অস্বস্তি। আপিসের দু'চার জন বিশেষজ্ঞের

সঙ্গে আলোচনা করল এ নিয়ে। কিন্তু সুরাহা হ'ল না কিছু, একেবারে নিঃসংশয় হওয়া গেল না।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ওকে ঘরে ডেকে পাঠালেন সেদিন। জিজ্ঞাসা করলেন, সব রেডি তো ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বেশ। রাইট আর্নেস্টলি কাজ আরম্ভ করে দাও, পার্টির জোর তাগিদ, দেখতে দেখতে কাজ শেষ করে দিতে হবে। বাট্ বি ভেরি কেয়ারফুল, কোথাও গলদ না থাকে।

সে ঘাড় নাড়ল। একটু ইতস্তত করে বলেই ফেলল তারপর।—সাইট দেখে এসে আমার একটু খটকা লাগছে···ওরকম জমিতে এত বড় ডিজাইন···আগে সয়েলটা অন্তত একবার টেস্ট করে নিলে হ'ত ··

শুনে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ভুরু কোঁচকালেন প্রথম। ঠোঁটে বাঁকাহাসির মতো দেখা গেল একটু। ওর দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন বার দুই।—অনেক শিখে ফেলেছ বলেই সতের ঝামেলার কথা মনে আসে তোমার, নট্ ব্যাড—।

বক্রোক্তি শুনে দু কান লাল হয়ে গেল। আবারও বলতে যাচ্ছিল কি। ম্যানেজিং ডাইরেক্টার থামিয়ে দিলেন। এ সুর ভিন্ন।

—ওয়েট মাই বয়···কথাটা ডিপার্টমেন্টের আরো কাকে যেন তুমি বলেছ শুনেছি। তা কোম্পানীর একটু বিশ্বাস-টিশ্বাস আছে আমার ওপর, ওই দু চোখের সাদা অভিজ্ঞতায় তোমাদের ওই সব টেস্ট্ই ঠিক ঠিক হয়ে আসছে। তোমার কাজের সুনাম খুব, কিন্তু সেটা টেনে বাড়াতে যেও না, ও আপনি আসবে—নাউ গো অ্যাহেড উইথ ইয়োর জব।

কিন্তু বিপুল বাড়রী সেখানেই থামেন নি। বাড়ি এসে স্ত্রীর কাছেও বলেছেন কথাটা। কিছুদিন হ'ল ভাবী জামাইয়ের ওপর একটু তেতো আছেন মহিলা। বাদলের মা কিছুদিনের জন্য দেশে গেছেন শুনেই সাগ্রহে তাকে এ বাড়ি এসে থাকার অনুরোধ জানিয়েছিলেন তিনি। আশা ওর মা সেটা শুনলে দেশেই থেকে যেতে পারেন বরাবর। কিন্তু ভাবী জামাই প্রস্তাবটা একবার ভেবে দেখে নি পর্যন্ত। মেয়ে বা মেয়ের বাবার কাছে ক্ষোভ চাপা থাকে নি মিসেস বাড়রীর। এভাবে ওকে মাথায় তোলার ফল ভুগতে হবে, সে ভবিষ্যদ্বাণী অনেকবারই করেছেন তার পর।

তাঁকে খুশি করার জন্যেই সেদিনের কড়া শাসনের খবরটা ব্যক্ত করলেন বিপুল বাড়রী। শুনে একেবারে যেন হাঁ হয়ে গেলেন মিসেস বাড়রী। এবং সেই হাঁ

হওয়া বিস্ময়টুকু পঞ্চপল্লবে সাজিয়ে মেয়ের কাছেও প্রকাশ না করে পারলেন না।

সারাক্ষণই মনটা খারাপ হয়ে ছিল বাদল গাঙ্গুলির। এরকম কটূক্তি কখনো শুনতে হয় নি। সেদিন পাঁচটার হর্ন বাজতে নরেন এসে পথরোধ করে দাঁড়াল যখন, তাও ভালো লাগে নি। বরং বিরক্ত হয়েছে। অথচ, অন্যান্য দিনের মতো পড়িমরি করে যে ছুটেছে তাও নয়।

নীলার প্রথম কথাতেই মেজাজ যেন আরো বিগড়ে গেল। চুপচাপ কিছুক্ষণ গাড়ি চালিয়ে নীলা বলল, এরকম অবস্থা কেন মুখের, বাবার কাছে বকুনি খেয়েছ বলে?

বাদল গাঙ্গুলি ঘুরে বসল আস্তে আস্তে। চুপচাপ চেয়ে রইল শুধু।

আবার বলল নীলা, বেশ করেছে বকেছে, বকবে না তো কি! বাবাকে পর্যন্ত রাগাতে সাহস করো তুমি, বাবা ডিজাইন করে দিলেও নিঃসন্দেহ হতে পার না এত গুমোর তোমার—ক'দিনের ইঞ্জিনিয়ার হে তুমি?

খানিক চুপ করে থেকে জবাব দিল, এসব আলোচনা আমার ভালো লাগছে না নীলা।

তা তো লাগবেই না। হাসি আর রাগ মেশানো কটাক্ষ। তেতো কথা কার আর ভালো লাগে! মুখখানা অমনি হাঁড়িপানা করে বসে থাকবে, না যাবে কোথাও?

সব কিছু মন থেকে ঝেড়ে ফেলেই হাঁড়িমুখে হাসি ফুটিয়ে বাদল গাঙ্গুলি ওর দিকে মন দিতে চেষ্টা করেছিল তার পর।

কিন্তু নেশান বিলডার্স-এর ওই আটতলা ম্যানসন আর ওঠে নি।

তার আগেই থামতে হয়েছে।

সমস্ত কোম্পানীর সজাগ দৃষ্টি পড়েছে এদিকে। ছোট বড় সকলের। বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার দলের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরাও মাথা নেড়ে গেছেন। একটা অস্ফুট গুঞ্জন উঠেছে অফিসময়। আটতলা বাড়ির সঙ্কল্প ছ'তলায় শেষ, কে কার মুখ চাপা দেবে। কারো মতে কোম্পানীর গুড-উইলটি গেল এবার, কারো বিস্ময় বাদল গাঙ্গুলি কাঁচা ছেলে নয়—এরকমটা হল কেন! কারো জবাব, ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের ওই প্ল্যান আর ডিজাইনের গোলমাল আছে শুনে রাখো, বিশ লাখ টাকার কনস্ট্রাকশনে কম করে দেড় লাখ টাকা পেয়েছে ডিজাইন করে—অভ্যেস নেই, লোভ করতে গেছে, বেশ হয়েছে।

এই থামার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের স্পন্দন থেমে গেছে যেন বাদল গাঙ্গুলির। ধমনীর রক্ত চলাচল থেমে গেছে। দিনের আলোয় রং ঘুচে গেছে চোখ থেকে।

রাতের নির্জনতা যাতনামুখর। পরিত্যক্ত বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেছে।

বাড়ি নয়, বাড়ির কঙ্কাল। মানুষ নয়, নিষ্প্রাণ মূর্তি।

বোঝাপড়ার ডাক এলো।

কৈফিয়ৎ থাকলে এত বড় বিপর্যয়ও কিছু নয়। বিপুল বাড়রীর কাছে অন্তত নয়। বড় জোর দু'পাঁচ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কোম্পানীকে। কিন্তু ঝড় উঠল এই কৈফিয়ৎ দেওয়া এবং কৈফিয়ৎ নেওয়ার ব্যাপারেই।

সাউণ্ড-প্রুফ ঘর তাঁর। বাইরে থেকে কিছু শোনা গেল না, কিছু বোঝা গেল না।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ফেটে পড়লেন, উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে।—নন্‌সেন্স! রিডিক্‌লাস! প্রিপস্‌টরাস!

বাদল গাঙ্গুলি নীরব, নিশ্চল।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে এত বড় ইঙ্গিত বরদাস্ত করে উঠতে পারছিলেন না বিপুল বাড়রী। পায়চারি করছিলেন ঘরের এমাথা ওমাথা। রাগে সমস্ত মুখ সাদা।—তোমারই ভবিষ্যৎ গড়বার জন্য এত বড় দায়িত্ব দিয়েছিলাম, তার বদলে মুখে একেবারে চুনকালি দিয়েছ তুমি! কোথায় লজ্জিত হবে তা না···। কোথায় না ভুল হতে পারে? প্লিন্‌থ-এ ভুল হতে পারে, কনস্ট্রাকশনে ভুল হতে পারে।···

জ্ঞানত এসবে কোন ভুল হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

জ্ঞানত—জ্ঞানত—জ্ঞান! কতটুকু জ্ঞান তোমার? ক'টা ম্যানসন তুলেছ আজ পর্যন্ত? নাকি একবার ওই বাইরে ঘুরে এসেছ বলেই জ্ঞানের আর বাকি নেই কিছু?

বাদল গাঙ্গুলি উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। কোন মীমাংসা হবার নয় জানাই ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজিং ডাইরেক্টার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন আবার। সিট্ ডাউন প্লীজ অ্যাণ্ড লেট মি থিঙ্ক্।

নিজেও চেয়ারে বসলেন আবার। খানিকক্ষণ দম নিয়ে অপেক্ষাকৃত শান্তমুখে বললেন, এত বড় ক্ষতিপূরণ দিয়ে কোম্পানী তো আর চুপচাপ বসে থাকবে না। বোর্ড বসবে, তোমার কৈফিয়ৎ নেবে, রীতিমত বিচার করবে।···বেশ ভেবেচিন্তে আনফোরসিন রিজন্‌স-এ কিছু একটা গোলযোগ হয়ে গেছে বলে রিপোর্ট দাও।

তার মানে, খুব শান্ত খুব সংযত কণ্ঠে বাদল গাঙ্গুলি বলল, আমারই কোথাও ভুল হয়েছে বলে স্বীকার করে নেব?

টেবিল চাপড়ে বিপুল বাড়রী বলে উঠলেন, হ্যাঁ নেবে নেবে—তোমার

ওপর দায়িত্ব ছিল আর ভুলটা কি স্বীকার করবে বাইরের লোক এসে ? রিপোর্ট দাও, তার পর দেখা যাক—

নিঃশব্দ দৃষ্টি বিনিময়। সমস্ত জড়তা কাটিয়ে বাদল গাঙ্গুলি আবার উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে। স্পষ্ট জবাব দিল, কিন্তু আমি তাতে রাজী নই। বিল্ডিংয়ের পাশের জমি থেকে এখনো সয়েল টেস্ট্ করে নেওয়া যেতে পারে। ওই জমিতে আর ওই ডিজাইনের ফাউণ্ডেশনে এত বড় কনস্ট্রাক্শন দাঁড়ায় কিনা—আমার স্টেটমেণ্ট-এ সেটাই আগে আমি পরীক্ষা করে দেখতে বলব। তাতে কোন গলদ না থাকলে বোর্ডের বিচার আমি মাথা পেতে নেব।

শান্ত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

পাশবদ্ধ দোর্দণ্ডকেশরীর নিরুপায় স্তব্ধতায় ভদ্রলোক স্থির হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। সর্বাঙ্গে গলিত দাহ্য অনুভূতি একটা। অফিসে বসে থাকা সম্ভব হ'ল না আর। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে বাড়ি ছুটলেন ম্যানেজিং ডাইরেক্টার বিপুল বাড়বী।

…পরিত্যক্ত বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়েছিল বাদল গাঙ্গুলি। সামনে যেন ওরই হাড়-পাঁজরাগুলো দেখছিল চেয়ে চেয়ে। সন্ধ্যার ছায়ায় দিনের আলো ধূসর হয়ে হয়ে যেন মিলিয়ে গেল একসময়। ক্লান্ত, মন্থর গতিতে ফিরে চলল।

নিধু দরজা খুলে দিল। কিছু বলতে চাইল বোধ হয়। কিন্তু বলা হ'ল না। ক'দিন ধরেই মনিবের কবরের মত থমথমে মুখ দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে আছে। বাদল গাঙ্গুলি সোজা নিজের ঘরে চলে গেল। থমকে দাঁড়াল তার পর।

নীলা বসে আছে শান্ত মুখে।

ওর ওপর দিয়েও ঝড় গেছে একটা। জানা নেই, কিন্তু অনুমান করা কঠিন হ'ল না। তার আভাসও পেল। নীলাই কথা বলল প্রথম, আশা করো নি দেখছি…

না।…তুমি এ সময়ে ?

নীলা মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক।—আগে তো যে কোন সময়ে আসতুম, এখন তাহলে সময় ধরে আসার মতো কিছু একটা হয়েছে।

জবাব না দিয়ে গায়ের কোটটা খুলে আলনায় রাখল বাদল গাঙ্গুলি। নীলা বিছানার ওপরেই বসে। খানিকটা ব্যবধানে বসল সেও।—বলবে কিছু ?

নীলা তেমনি নিরীক্ষণ করছিল তাকে।—বলব কিছু, কিন্তু শুনতে হয়তো তোমার খুব ভালো লাগবে না।

জোর করেই বাদল গাঙ্গুলি এবারে হাসতে চেষ্টা করল একটু। শয্যায় শরীর ছেড়ে দিল খানিকটা। হালকা জবাব দিল, তার থেকে শুনতে ভালো লাগে এমন কিছুই না হয় বলো।

যা বলার স্পষ্ট বলবে বলেই এসেছে নীলা। আর জানেও স্পষ্ট বলতে। কিন্তু তবু বলার আগে খুব ভালো করে দেখে নিতে চায় যেন।—বাবার বিরুদ্ধে যাবার দুঃসাহস তোমার হ'ল কি করে? নিজেকে তুমি কি ভেবেছ? আজ পর্যন্ত উনি যা করেছেন তোমার জন্য—সব ভুলতে পারলে?

আমার জন্য কিছু করেন নি, নিরুত্তাপ জবাব, করেছেন তাঁর মেয়ের জন্য ...এখন দেখছেন, যা করেছেন সবই ভুল করেছেন।

শুধু বাবা নয়, সকলেই তাই দেখছে। অনুচ্চ কণ্ঠে নীলা ঝাঁজিয়ে উঠল প্রায়, ভুল না হয় হয়েছে, ভুল মানুষেরই হয় কিন্তু সে দায়টা বাবার ওপর চাপাতে লজ্জা হ'ল না তোমার? সঙ্কোচ হ'ল না?

ব্যথায় বিবর্ণ হয়ে গেল মানুষটার সমস্ত মুখ। সামলে নিয়ে শান্ত মুখেই জবাব দিল আবার, ভুলের দায় আমি কারো ওপর চাপাতে চাইছি না নীলা, সত্যি নিজে ভুল করেছি কি না সেটুকুই বুঝে নিতে চাইছি। ওই জমিও আছে আর তোমার বাবার ডিজাইনও আছে—এ দুটো একবার তিনি এক্সপার্ট দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিচ্ছেন না কেন? তাতে কোন গলদ না থাকলে, ভুল আমার তো বটেই! ··কিন্তু তোমার বাবা তা করবেন না, কারণ, তাঁর মনে সন্দেহ আছে।

কি বলছে, খানিক চুপ করে থেকে বুঝতে চেষ্টা করল নীলা। কিন্তু বোঝা অসম্ভব। বিশেষ করে যেখানে ভালো করে কিছু বোঝবার জন্যেই এখানে আসা। উল্টে রেগে গেলো আরো। শান্ত ধৈর্যটুকুও তিরোহিত হ'ল।—বলিহারি আস্থা তোমার নিজের ওপর! বাবার কাজ ঠিক আছে কি না অন্য এক্সপার্ট ডেকে সেটা যাচাই করতে হবে?

নিরুত্তর।

অতশত আমি বুঝিনে, তোমার আমার ভালোর জন্য বাবা যা বলছেন তাই তোমার করা উচিত, আর তাই তুমি করবে, অন্তত আমার জন্যেও করবে।

কিন্তু তোমার বাবা যা বলেছেন তাই করলে যেখানে আমায় নেমে আসতে হবে, তাতে তোমার আমার কারোরই ভালো হবে না।

হবে হবে হবে! নীলার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে এসেছে। আরো সামনে ঝুঁকে এলো। বলে গেল, হয়তো তোমার দুর্নাম হবে কিছু, হয়তো বা উন্নতিও বন্ধ থাকবে কিছুকাল, কিন্তু বাবা ঠিক আবার টেনে তুলবেন তোমায়। তার বদলে তাঁকে অপদস্থ করতে গেলে তাঁর নাগালও পাবে না তুমি, উল্টে সবই যাবে—তার অর্থটা ভেবে দেখছ?

স্তব্ধ গুমোট একটা। একটানা। দুঃসহ।

আগে দেখি নি। এখন দেখছি। সঙ্গে সঙ্গে আরো কেউ যাবে, সব ছেড়ে নিজেকে আর আমার সঙ্গে জুড়ে দিতে পারবে না, এই তো ?

সোজা হয়ে বসল নীলা। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করে উঠল তার পর, ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে কাব্য করলেই তো পারো। তুমি কি ভাবো এ পর্যন্ত তোমায় টেনে তোলা হয়েছে তোমার ভাবের ঘোরে বৈরাগী হবো বলে ? সে রকম লোকের কি খুব অভাব ছিল ?

এর থেকে স্পষ্ট আর বোধ হয় কিছু শোনার ছিল না বাদল গাঙ্গুলির।··· ওকে টেনে তোলা হয়েছে! ইচ্ছে হ'ল বলে, আভিজাত্যের ফাঁস পরিয়ে টেনে যাকে তুলছ, উঠলে এবারে একটা মরা মানুষই উঠবে। বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে একখানা হাত রাখল শুধু কাঁধে।—নীলা···।

বলো। হাত সরিয়ে দিয়ে কঠিন মূর্তির মতো বসে রইল নীলা।

তোমার আমার সম্পর্কটা এর বাইরে আর কিছু নয় তা হলে ?

তোমার এত বড় ঘা খেয়েও সেটা ভাঙবে না এমন কিছু নয়। বাবাকে তুমি অপমান করেছ, তাঁর মানসম্ভ্রম নষ্ট করতে বসেছ। নিজের ভুল স্বীকার করে নাও, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, তাঁর ক্ষমতা তুমি ভালই জানো।

কিছুক্ষণ।···অনেকক্ষণ। একটা আচ্ছন্নতার ঘোর কাটল যেন।—এই তাহলে তোমার শেষ কথা ?

হ্যাঁ। হাতঘড়ি দেখে নীলা উঠে দাঁড়াল।—আচ্ছা, কালকের মধ্যে তোমার জবাব পাব আশা করি, গুড নাইট্—।

···আর দেখা হয় নি।

কিন্তু জবাব নীলা পরদিনই পেয়েছিল। নীলা ঠিক নয়, বিপুল বাড়রী পেয়েছিলেন।

নীলা চলে যাওয়ার পর সে রাত্রিরও অবসান হয়েছিল বৈকি। এত বড় জবাবের দুর্বহ বোঝা বহন করে নিঃশব্দে কেটেছে সে রাত। তিলে তিলে, পলে পলে। আবার সকাল হয়েছে। আবার অফিসের সময় হয়েছে। আবার অফিসে এসেছে···।

শেষবার।

স্টেটমেন্ট লিখেছে। যেমন চেয়েছিলেন বিপুল বাড়রী তেমনি। যে জবাব নীলা আশা করে গেছে তেমনি। স্টেটমেন্টে সই করে পাঠিয়ে দিয়েছে।

আর সেই সঙ্গে পদত্যাগ পত্রও দাখিল করেছে নিজের।

ওটুকু কাজ শেষ করেই ফিরে এসেছে আবার। একটা তোঁতা [illegible]

ফড় করে উঠেছে থেকে থেকে। তার পরেই মনে হয়েছে মা নেই এখানে। নেকদিন নেই।···মায়ের কাছে যাবে।

নরেন এসেছিল তার আগে।

তেমনি হাসি। তেমনি খুশি। আরো বেশি হাসিখুশি যেন। অফিস কামাই বে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে গেছে ওকে। অনর্গল কথা বলেছে। কতক কানে ছে, কতক যায় নি।

···মুক্তিটা যেন ওরই। কেননা ওকেও ভালবাসত এত, সেটা যেন ভারী জে চোখে পড়েছিল সেদিন।

মা অবাক হয়েছিল বৈকি। অবাক নয়, ভয়ই পেয়েছিল। একসঙ্গে কত কথা জ্ঞাসা করেছিল ঠিক নেই।—এমনি চলে এলি কি রে! ··তা বেশ করেছিস। কিন্তু এরকম হঠাৎ···শরীর ভালো আছে তো? হ্যাঁ রে? এমন শুকনো খাচ্ছে কেন?

অত হাসছিল তাও ওই কথা! ··তার পর আস্তে ধীরে মা শুনেছে সব। নও মন্তব্য করে নি কিছু। কিন্তু মায়ের ভিতরটা যেন দেখতে পাচ্ছিল। ৎ কি মনে পড়ে গেছে তাঁর দিকে চেয়ে। খুশিতে বলেই ফেলেছিল।— সার দিন নরেন সারাক্ষণ সঙ্গে ছিল মা, গাড়ি ছাড়ার আগে আমাকে বলল, দর অত বড় অবিচার মাথা পেতে নিলে তোমার মুখের মা ডাকও আর লো লাগত না তোমার ওই মায়ের—গিয়ে দেখো।

শুনে মা হেসেছিল। নরেনের উপরে মায়ের নীরব আশীর্বাদ ঝরেছিল দুই খে।—তা তো হ'ল, কিন্তু তোর মুখ-চোখের এ অবস্থা কেন, অত বড় রিটা গেল বলে?

মিথ্যেই অত হাসছিল। অত হাসতে চেষ্টা করছিল।

একদিন নয়। আরো একদিন ধরা পড়েছে।

খাঁচা ভেঙে এসেছিল। কিন্তু বড় অভ্যস্ত খাঁচা। মুক্তিটা ঠিক মুক্তির মতো ছিল না। নীলার ফোটো ছিল ট্রাঙ্ক-ভরতি। অনেক সপ্রগল্‌ভ হাসিখুশি কে বন্দী করেছিল একে একে। একা ঘরে সেগুলো বার করে বসেছিল দিন। ছিঁড়ছিল একটা একটা করে। ঠাণ্ডা মাথায়। শান্ত মুখে। স-মনোযোগে। র আনাচেকানাচে ঘুর ঘুর করে আশার আলেয়ারা। উঁকিঝুঁকি দেয় কাঙ্ক্ষার নটীরা। কে জানে সেদিনের সেই একরাতের তিলে তিলে পলে দাহ করা ভস্ম থেকে আবার তারা উঠে আসবে কিনা। আবার তারা ছানি [illegible]। আবার তারা [illegible] পলাবে কিনা।

মা কখন এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করে নি। মৃদু ভর্ৎসনায় চমকে উঠেছিল। —এই করে কি কিছু সুবিধে হবে?

অপ্রস্তুতের একশেষ। শেষে হেসেই ফেলেছিল। নাঃ, তোমাকে লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু করারও জো নেই।

খণ্ড ছিন্ন ফোটোগুলোর দিকে খানিক চেয়ে থেকে ভারী অদ্ভুত কথা বলেছিল মা তার পর। বলেছিল, হ্যাঁ রে এত বুঝিস আর এটুকু বুঝিসনে, জ্বর হলে গায়ে জল ঢেলে গা ঠাণ্ডা করা যায়? ও যেমন আছে থাকতে দে, আপনি সব ঠিক হয়ে যাবে।

ছেলের অনেকক্ষণ আর বাকস্ফুরণ হয় নি তার পর। চেয়েই ছিল শুধু। তার পর বলেছিল, এত বুঝি, কিন্তু তোমার মত যদি সব কিছু এত সহজ করে বুঝতাম মা…।

থাক, খুব হয়েছে। তেমন সাদাসিধে কথা তাঁর। কি করবি এবারে ঠিক করে ফ্যাল্। কাজের মানুষ তুই, দিনরাত এমন শুয়ে বসে ভালো লাগবে কেন? কোথায় যাবি চল্, আমিও না হয় যাই তোর সঙ্গে।…

মড়াই ঘুমিয়ে পড়েছে। মড়াই ঘেরা পাহাড়গুলো ঘুমিয়েছে। মড়াইয়ের রাত্রিও ঘুমিয়েছে। নিটোল ঘুম সর্বত্র। মাথার ওপর ওই আকাশভরা তারাগুলো জেগে আছে শুধু। খোলা বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে মড়াইয়ের চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি তাদের দেখছে চেয়ে চেয়ে।…ছেলেবেলায় গল্প শুনত জীবনের শেষে নাকি ওই তারা হয়ে থাকার জীবন।

তাই যদি হয়, কোন্‌টি তার মা?

—নয়—

মড়াইয়ের কাজে এখন পর্যন্ত বিঘ্ন ঘটে নি কোথাও।

যেমন চলছিল তেমনি চলেছে। ঘোষ-চাকলাদারই এখানকার একমাত্র কনট্রাক্টার নয়। ছোটবড় আরো আছে, ছোটবড় কাজ নিয়ে আছে। একজনের বিপর্যয়ে আর একজনের সুদিনের সম্ভাবনা। তবু প্রতিকূল আবর্তের ছায়া পড়ে একটা। অনাগত উৎকণ্ঠার মতো কিছু একটা দুর্যোগ যেন থিতিয়ে আছে। শুরু থেকেই ঘোষ-চাকলাদারকে সকলে স্বতন্ত্র চোখে দেখে এসেছে বলেই হয়তো এরকম লাগছে।

বাবা বা নরেনবাবুর দুশ্চিন্তা দেখে সান্ত্বনা মুখে যাই বলুক, মেজাজ ঠাণ্ডা

হতে ভিতরে ভিতরে একটু দমে গেল সেও। যাই হোক না কেন, সূচনা শুভ নয় তো বটেই।

অনধিত এক জীবনের অধ্যায়ও তার পর শুনল একদিন। নরেনই বলেছে। যেভাবে বলে সচরাচর, সেভাবে নয়। সান্ত্বনার শোনার দরদ তারও ভেতরটাকে ছুঁয়ে গিয়েছিল বোধ হয় সেদিন। সান্ত্বনা তন্ময় হয়ে শুনেছে।

শেষ হতে নরেন নিজেই যেন থমকে গেল একটু। সারাক্ষণ সান্ত্বনা ওরই দিকে চেয়েছিল বটে, ওরই কথা শুনছিল। কিন্তু তার কথার বুনটে দেখছিল যাকে সে অন্য মানুষ। দেখছিল চিফ ইঞ্জিনিয়ারের খোলস থেকে যাকে উদ্ঘাটন করে দেখাল, তাকে। হালকা হেসে নরেন বলল, কি হ'ল, কেঁদে-টেদে ফেলবে নাকি?

নিজের স্তব্ধতায় নিজেই একটু লজ্জা পেল সান্ত্বনা। বলল, না, বড় দুঃখের জীবন তো ভদ্রলোকের।

দুঃখের বলেই তো এমন একটা নিখুঁত জিনিস গড়ে উঠছে, নরেন ঠাট্টা করল আবারও, ওর ভেতরটা যত জ্বলবে, লোকে ততো বেশি আলোর আশ্বাস পাবে, মন্দ কি?

যান্, আপনি ভারি নিষ্ঠুর।

অন্যমনস্কের মতো নরেন ভাবল কি। পরে বলল, নিষ্ঠুর নয়, ওর জীবন থেকে নীলা গেছে ভালই হয়েছে···কিন্তু একেবারে গেছে কি না ভেবেই ভয় হয় মাঝে মাঝে।

সান্ত্বনার জিজ্ঞাসু চোখে চোখ রেখে বাকিটুকুও না বলে পারল না।—মানুষটাকে যত শক্ত দেখো ততো শক্ত নয়, আমার বিশ্বাস ওই মেয়ে সামনা-সামনি এলে আবারও পারে ওর জীবনে সব কিছু ওলটপালট করে দিতে, ওর এই কাজ এই নিষ্ঠা সব কিছু তছনছ করে ফেলতে।

শোনা মাত্র মুখভাব বদলাতে লাগল সান্ত্বনার। একজন গেলেও সরকারী কাজ বন্ধ থাকবে না—সে কথা মনে হ'ল না। ওলটপালট হয়ে যাওয়া এবং নিষ্ঠায় ছেদ পড়ার সঙ্গে ড্যামের কাজে ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনাটা এক করে দেখল কিনা সে-ই জানে। মেয়েটার আবার সামনাসামনি আসার প্রসঙ্গ কল্পনা করে সমস্ত মুখে কঠিন ছায়া পড়ল একটা।

রণবীর ঘোষের ব্যাপারটা স্থগিত আছে এখনও। কতকাল থাকবে তারও ঠিক নেই। হেড অফিস থেকে নির্দেশ আসে নি এখনো কিছু। কেন আসে নি তাও অনুমান করতে পারে বাদল গাঙ্গুলি। ঘোষ-চাকলাদার নিশ্চেষ্ট বসে নেই।

এ ব্যাপারের ফলে কাজের ধারা একটু বদলেছে বাদল গাঙ্গুলির। বিশ্বাসের শান্তিভঙ্গ হয়েছে একবার। ঘোষ-চাকলাদারকে সস্‌পেণ্ড করুক আর যাই করুক, ভিতরে চিড় খেয়ে গেছে একটা। দিনের মধ্যে দু'তিন বার মড়াইয়ে নামে। সন্ধানী চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সব। ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করে।

ফলে মড়াইয়ে সান্ত্বনার সঙ্গেও আজকাল দেখা হয়ে যায় মাঝে মাঝে।

সান্ত্বনার ইচ্ছেও হয় সামনে গিয়ে দুটো কথা বলে। গাছতলায় সেই লাঞ্চের পর্ব মনে পড়তে রাঙিয়ে ওঠে নিজেই। রাগের মাথায় কি যাচ্ছেতাই না বলেছিল, বড়সাহেবের প্রতি পাগল সর্দারের সেই অভিযোগ মুছে গেছে মন থেকে, ভুতুবাবুর কথাগুলোও। একটা মেয়ের কাছ থেকে অত বড় ঘা খেয়েও মেয়েদের ওপর ভদ্রলোক বীতস্পৃহ হবে না তো কি! সব শুনে ওর নিজেরই রাগ ধরে গিয়েছিল মেয়ে জাতটার ওপর।

সামনাসামনি পরে গেলে নমস্কার বিনিময় হয় বড় জোর। ইচ্ছে থাকলেও কাছে ঘেঁষে না সান্ত্বনা। পারেও না।

কারণ সান্ত্বনাও বদলেছে।

মাসির বাড়িতে বাবার সঙ্গে ঝকাঝকি করে যে মেয়ে মড়াইয়ে এসেছিল, সে বদলেছে। একটু একটু করে বদলেছে। দশ জনের চোখে নিজেকে দেখে বদলেছে। সেই হাসিখুশি আছে, সেই কৌতূহল-প্রাচুর্যও আছে, কিন্তু ভরা জোয়ারের মধ্যে চেতনার রাশটাও তেমনি সজাগ আজকাল। ওভারসিয়ারের মেয়ে, সেটাই একমাত্র পরিচয় নয় এখন। স্ব-মহিমায় স্বতন্ত্র, স্বয়ংবিকশিত। নিজের পরিপূর্ণতার রহস্য নিজে জানে। ওই যে এত বড় চিফ ইঞ্জিনিয়ার মড়াইয়ের, ঘা-খাওয়া পোড়-খাওয়া মানুষ—দেখলেও যে না দেখার ভান করে কত সময়, কাজের ফাঁকে ফাঁকে তারও বিমনা দৃষ্টি উধাও হয়ে আসতে দেখেছে ওর কাছ পর্যন্ত।

অন্য রকমের যোগাযোগ ঘটল একটা সেদিন।

বিকেলে মেন কোয়ার্টারস-এর দিকে ছিল সান্ত্বনা। বড় বড় ফোঁটায় জল পড়তে লাগল হঠাৎ। অসময়ের জল। অন্যমনস্ক ছিল, থমকে দাঁড়াল। তার পর আকাশের দিকে চেয়ে দিল ছুট।

অদূরের সব ক'টা কোয়ার্টারই চেনা। একটার খুব কাছে নয় আর একটা। চকিতে ভেবে নিয়ে যে দিকে এগোলো, একা কোনদিন সেখানে যাবে ভাবে নি। ভদ্রলোক তো [illegible] বাড়ি নেই এখন, শুধু নিধু আছে...।

কিন্তু জলটা চেপে এলো যেন। যতটা ভিজবে ভেবেছিল তার থেকে বেশি ভিজে গেল। একেবারে বাড়ির গায়ে এসে সেই চেতনার রাশে টান পড়ল

আবার। না, যাবে না। আগে হলে ভাবত না, সরাসরি ঢুকে পড়ত। এখন মন চাইছে বলেই যাবে না। তাছাড়া ভিজেছে একেবারে কম না। হলই বা নিধু···

বাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছাতের আলসেয় মাথা বাঁচাতে চেষ্টা করল। কি যাচ্ছেতাই জল রে বাবা! কতক্ষণে ছাড়বে ঠিক কি। ভদ্রলোক যদি এসেই পড়েন এর মধ্যে। অস্বস্তিতে আকাশ বিশ্লেষণ করতে লাগল সান্ত্বনা।

ওদিকে মাথার ওপর জানালা খুলে যে লোকটা গলা বাড়িয়েছে সে স্বয়ং নিধুরাম।

দিদিমণি, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে ভিজছ! এসো এসো·ভিতরে এসো!

চমকে উঠেছিল সান্ত্বনা। পরে নিস্পৃহ বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল, এটা তোমাদের বাড়ি নাকি নিধু?

বহুবচনে প্রীত হ'ল নিধুরাম। হৃষ্ট কণ্ঠে জবাব দিলে, হ্যাঁ দিদিমণি, আমাদের বাড়ি, আমার আর বাবুর। কিন্তু তুমি ভিজে যাচ্ছ যে, ছুট্‌টে ভেতরে চলে এসো না!

এভাবে গা বাঁচানো সম্ভব নয়। কিন্তু পা যেন আটকে আছে এখন মাটির সঙ্গে। বলল, ভিতরে যাব···তোমার বাবু রাগ করবে না তো?

নিধু অবাক।—বিষ্টিতে ভিজছ, রাগ করবে কেন? আর বাবু তো এখন আপিস ঠ্যাঙাচ্ছে—

ভিতরে প্রবেশ করে সান্ত্বনা শাড়ির আঁচলে হাতমুখ মুছে ফেলল। কটাক্ষে নিধুকে দেখে নিল একবার। দিদিমণি আসার আনন্দই তার চোখে মুখে।

দিদিমণিকে সকলে চেনে, সকলে জানে আর সকলে ভালোবাসে।

দাঁড়াও, একটা তোয়ালে এনে দিই তোমাকে।

না-না, তোয়ালে কিছু দরকার নেই, সান্ত্বনা শশব্যস্তে থামালো তাকে, এই তো একটুখানি ভিজেছি মোটে।

কতটা ভিজেছে নিধু তাই দেখে নিল একবার। শাড়ির আঁচলটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে সান্ত্বনা সকৌতুকে ভিতরের দিকে উঁকি দিল। নিধু বলল, সব ঘুরে ঘুরে দেখো না দিদিমণি, আমি তো আছি, ভয় কি!

সান্ত্বনা মাথা নাড়ল। আশ্বস্ত হ'ল যেন। কিন্তু এগোবার আগেই সাগ্রহে আর একটা প্রস্তাব করে বসল নিধুরাম। নিজের যা কিছু অন্যের চোখ দিয়ে আস্বাদন করে নেওয়ার বৃত্তিটা শাশ্বত। দিদিমণির মতো এমন সমঝদার আর পাবে কোথায়। সবিনয়ে বলল, আগে আমার ঘরখানা দেখে যাও, হ্যাঁ? বাবুর ঘর থেকে আমার ঘর ঢের ভালো, দেখবে এসো, কাউকে দেখাইনে।

সানন্দে আগে তারই ঘর দেখতে চলল সান্ত্বনা। সত্যই দেখার মতো ঘর। নিধুর নিজস্বতা আছে একটা। যেখানে যা কিছু পছন্দসই সবই ঘরে এনে পুরেছে। চৌকি, হাতলভাঙা চেয়ার, খবরের কাগজে ঢাকা কেরোসিনকাঠের টেবিল। টেবিলে রাজ্যের জিনিস। রঙ-ওঠা টাইমপীস্, ফাটা আয়না, রোঁয়া-ওঠা বুরুশে দামী চিরুনি, সস্তা ফাউন্টেন পেন, কালি, চকচকে অ্যাশ-পট একটা, দামী তেলের শিশি, দুটো একটা অন্য ফাইল পর্যন্ত। আলনায় আধময়লা কাপড় জামা আর ছেঁড়া টার্কিশ তোয়ালে, নিচে দু'তিন জোড়া পুরানো জুতো। সামনেই দেয়ালে মহাদেবের ছবি আর তার পাশেই স্রস্তবসনা নারীমূর্তির বিলিতি ক্যালেণ্ডার।

বাঃ সুন্দর! সান্ত্বনা হেসেই ফেলল, এত সব তুমি কোথায় পেলে?

একটু যেন বিব্রত হয়ে পড়ল নিধুরাম। জবাব দিল, পাবে আবার কোথায়, এ সব তো তারই। কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারল না তবু। একটু সতর্ক করে রাখা ভালো। বলল, আমার ঘরে এত সব আছে তুমি যেন বাবুকে বোলো না দিদিমণি।

সান্ত্বনা মাথা নেড়ে আশ্বস্ত করল তাকে, বলবে না। খুশি হয়ে নিধুরাম নিচু গলায় বলল আবার, তোমাকে তাহলে বলি দিদিমণি, বাবুর তো কিছু মনে থাকে না, যখন যা ভালো কিছু নিয়ে আসে, কিছুদিন গেলেই সেটা আমার হয়ে যায়। যদি কখনো খোঁজ পড়ে, বলি খুঁজে দেখ'খন—ব্যস্, তার পর আর মনে থাকে না, কি করে থাকবে, সারাক্ষণ তো মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ করে ড্যাম্ ঘুরছে!

দিদিমণিকে হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে কিছু বোধ হয় খেয়াল হ'ল নিধুরামের। অতঃপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে মনোভাবটুকু জ্ঞাপন করল, তার সার কথা, দিদিমণি ভাবছে চুরি, চুরি নয়, চুরি কেন হতে যাবে! এমনিই নেয় সে, তেমন বেশি খোঁজ পড়লে চুপি চুপি তো আবার ফিরিয়েই দেয়। আর তাছাড়া সে তো আর বিয়ে-থাওয়া কিছু করে নি, ঘর সংসারও নেই—এ সব তো এখানেই থাকবে বরাবর, কোথায় আর যাবে।

কোনরকমে হাসি দমন করে তার কথায় সায় দিতে দিতে বাইরে এলো সান্ত্বনা। নিধু বলল, বাবুর আসার সময় হয়ে গেল, আমি চট্ করে চায়ের জল চাপিয়ে আসি।

নিধুর পাল্লায় পড়ে এভাবে এখানে এসে পড়ার অস্বস্তি অনেকটা কেটেছিল। গৃহস্বামীর প্রত্যাবর্তন-সম্ভাবনায় সঙ্কোচ বাড়তে লাগল আবার। বাইরে অঝোরে জল পড়ছে তেমনি। ওর সঙ্গে আড়ি করে নেমেছে যেন। এত জলে কেউ বেরোয় না এই যা ভরসা। একটু ধরে এলে ও নিজেই আগে

পালাবে এখান থেকে।

দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে নিধুর মনিবের ঘরে উঁকি দিল সান্ত্বনা। আবর্জনাস্ত অগোছালো ঘরের ছিরি দেখে ওর হাসি পেয়ে গেল। যেটার যেখানে খুশি পড়ে আছে। সব ছাড়িয়ে চোখ গেল ঘরের কোণের টেবিলটার দিকে। টেবিলের দামী ফোটোস্ট্যাণ্ডের ওপর।

এরই কথা শুনেছিল নরেনবাবুর মুখে। ফোটোখানার কথাও শুনেছিল। পায়ে পায়ে এগোলো সান্ত্বনা। কাছে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগল। ঝকেঝকে চকচকে চেহারা। সুশ্রী। শৌখিন বেশবাস। সুপরিস্ফুট আভিজাত্য।

এই তাহলে নীলা! সামনাসামনি এলে যে এখনো পারে সব ওলটপালট করে দিতে, এই কাজ এই নিষ্ঠা সব তছনছ করে ফেলতে!

চেয়ে চেয়ে দেখছে সান্ত্বনা।

পারে বোধ হয়। নইলে এ ছবি এখনো এখানে কেন। হাতে তুলে নিল ছবিখানা। কাছে দূরে এপাশে ওপাশে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল আবার। আয়নায় চোখ পড়ে নি, নইলে দেখত নিজের এই দেখাটার মধ্যে প্রীতি ছিল না খুব।

নিধুর সাড়া পেয়ে ফোটো যথাস্থানে রেখে দিল আবার। নিধু চুপি চুপি পরিচয় করিয়ে দিল, উটি নীলা দিদিমণি, বাবুর সঙ্গে খুব ইয়ে ছিল একসময়, কি রকম সব গণ্ডগোল হয়ে গেল, নইলে বাবুর তখন ফুর্তি ছিল কত।

সান্ত্বনা জানে সবই। কিন্তু জানুক বা না জানুক নিধুর মুখে কিছু শুনতে যাওয়া বিড়ম্বনা। বেরিয়ে এসে বাইরের ঘরে বসল সে।

নিধুর ভদ্রলোক হওয়ার সরঞ্জাম সংগ্রহে বিশেষ একটা অভিলাষ অপূর্ণ থেকে গেছে বলেই নীলা দিদিমণির প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল। গোপনে বাসনাটা ব্যক্ত করে ফেলল সান্ত্বনার কাছে।—কাউকে যদি না বলো তো একটা কথা বলি দিদিমণি, হ্যাঁ?

কোনরকম প্রতিশ্রুতি না দিয়েই সান্ত্বনা আবার কিছু শোনবার সম্ভাবনায় শঙ্কিত নেত্রে তাকালো তার দিকে।

আমাকে অমনি রূপোর খাপে বাঁধানো ছবি দেবে একটা দিদিমণি? টেবিলে রাখতুম—

নিবেদন শুনে দুই চক্ষু প্রথমে বিস্ফারিত হয়ে উঠল সান্ত্বনার। উচ্ছ্বসিত হাসির আবেগে স্থির বসে থাকা দায় হ'ল তার পর। এই নিয়ে ওর সামনে বসে হাসাটাও রিসদৃশ। আবেদন পেশ করে ফেলেই নিধুও লজ্জায় অধোবদন। দিদিমণি অত হাসবে জানলে বলত না।

সান্ত্বনা বলল, আমার কাছে তো নেই, পেলে দেব'খন। প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যই জিজ্ঞাসা করল, তোমার চা হয়ে গেল ?

না, সবে জল গরম হ'ল, এবারে খাবারটা আগে তৈরী করব, তুমি বসো।

মনে মনে নিধুও একটু আড়াল হবার ফিকির খুঁজছিল হয়তো। ব্যস্ত হয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

কিন্তু দিদিমণির মতো একজনকে চুপচাপ বসিয়ে রেখে কতক্ষণ আর ভালো লাগবে। তার ওপর একটা প্ল্যানও এসে গেছে মাথায়। এবারের প্রস্তাবে নিশ্চয় খুশি হবে। সেই টিফিন ক্যারিয়ার বদলানোর ব্যাপারটা নিধু জীবনে ভুলবে না। বাবু অবাক হয়ে কেমন চেটেপুটে খেয়েছিল এবং পরে জেনে ফেলে আরো কত অবাক হয়েছিল, সে সব ফিরিস্তি দিদিমণির কাছে অনেক দিন আগেই বলা হয়ে গেছে।

গামছায় হাত মুছতে মুছতে কাছে এসে দাঁড়াল আবার। দিদিমণি, নতুন খাবার কিছু তৈরী করে দেবে ? দাদাবাবু খেয়ে ভারি খুশি হবে সেবারের মতো—

ঝোঁকের মাথায় এখানে এভাবে এসে আটকে পড়ার অস্বস্তি ক্রমেই বাড়ছিল সান্ত্বনার। ভুরু কুঁচকে জলের বহর দেখছিল। ওকে জব্দ করার জন্যেই যেন সব কিছু। যার কথা ভেবে এত সঙ্কোচ, এর ওপর তাকে খুশি করার এই প্রস্তাব শুনে প্রায় রেগেই গেল। বলল, রোজ কচ্ছ তুমিই করোগে যাও, আমি এখন পারব না—তোমাদের ছাতাটাতা আছে কিছু ?

হঠাৎ এই বিরাগের সুরটা কানে বাজতে থতমত খেয়ে গেল নিধু। মাথা নাড়ল, নেই—। ফিরে গেল।

ছাতা থাকলেই বা এ জলে যেত কি করে! সাদা মনে এসেছিল লোকটা, এভাবে না বললেই হ'ত। ভাবল সান্ত্বনা। নেমন্তন্ন করে তো আর ডেকে আনে নি, বরং এসেছে বলে খুশিতে আটখানা হয়েছে। উসখুস করতে লাগল।··· নীলার মতো মোটর হাঁকায় নি কখনো, ঝরনার মতো এম. এ. পড়ে নি—কিন্তু এই একটি জায়গায় তার হাত পড়লে তেমন কিছু করে তুলতে পারে, সে অবস্থা পুরোপুরি আছে। আর এটুকু পাবার আকর্ষণও কম নয় ওর কাছে।

উঠল। পায়ে পায়ে নিধুর রন্ধনশালার দরজায় এসে দাঁড়াল। কাগজে জড়ানো বড় একটা পাঁউরুটি আর গোটাকতক ডিম সামনে রেখে গম্ভীর মুখে নিধু পেঁয়াজ কুচোতে বসেছে।

কি খাবার কচ্ছ নিধু ?

জবাব না দিয়ে নিধু ডিম-পাঁউরুটির দিকে একবার তাকালো শুধু। বড়

সাহেবের আপনার লোক প্রায়, তারও একটা মানমর্যাদা আছে। নেহাত দিদিমণি বলেই ভুলেছিল আর অমন অনুরোধ করেছিল।

সান্ত্বনা আবার জিজ্ঞাসা করল, আপিস থেকে এসে এই শুকনো ডিম-রুটি খাবেন তোমার বাবু?

নিধু সাফ জবাব দিল, খিদেয় পেট চুঁই চুঁই করে তখন, খাবে না তো কি!

জবাব শুনে বিমর্ষ হ'ল সান্ত্বনা। কিন্তু ওর দিকে চেয়ে বেশ একটু কৌতুকও অনুভব করল।—জল ছাড়ার তো কোন লক্ষণ নেই, তোমার বাবু আসবেন কি করে?

আঁটা-পুকুর আছে, বিষ্টির জল ভেতর সেঁধোয় না, ঠিক আসবে।

সান্ত্বনা দু'চার মুহূর্ত ঘরের ভেতরটা দেখে নিল চুপচাপ। তেমনি হালকা করেই বলল আবার, তোমার আছে তো দেখছি শুধু ডিম আর রুটি, এ দিয়ে আবার নতুন কি করতে চাইছিলে তুমি?

জবাব না দিয়ে নিধু ঘরের কোণে তরকারির ঝুড়িটার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করল।

সান্ত্বনা হাসল একটু।—আচ্ছা সরো, দেখি কি করতে পারি।

এতক্ষণে নিধুর ফুর্তি ফিরে এলো আবার। একগাল হেসে তরকারির ঝুড়িটা টেনে আনলো। অন্যান্য সরঞ্জাম হাতের কাছে গুছিয়ে দিতে লাগল। চৌকাঠের ওপর বসে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগল তার পর।

নিধু অরসিক নয়। তার মনে হল, দুখানি যোগ্য হাতের তৎপর ছোঁয়া পেয়ে ঝিমন্ত রান্নাঘরটাই যেন নড়েচড়ে জেগে উঠেছে। তরকারি শেষ, আদা-পেঁয়াজের রস সহযোগে সেদ্ধ আলুর কাটলেট শেষ, এবারে ডিম আর রুটি এক-সঙ্গে করে ভেজে নামাচ্ছে। কথাবার্তা থেমে গেছে নিধুরামের, সব ক'টিরই সুঘ্রাণে রসনা সিক্ত।

বাইরে খটাখট্ কড়া নাড়ার শব্দ।

নিধু ছুটল। হাত থেমে গেল সান্ত্বনারও।

গৃহস্বামীর পদার্পণ ঘটেছে। জলঝরা ওয়াটার-প্রুফ খুলে নিধুর হাতে দিল। ভিজে জুতো বদলে ঘরে ঢুকলো। তোয়ালে দিয়ে আধভেজা হাতমুখ মুছে ফেলে ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ পড়ে রইল খানিকক্ষণ। নিধু দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে।

খানিক বাদে আপিসের বেশভূষা বদলে এবং হাত মুখ ধোয়া শেষ করে আবার ইজিচেয়ারে এসে বসল, বলল, খুব ভালো করে চা কর্—

এরই প্রতীক্ষায় ছিল নিধুরাম। নির্দেশ শোনার আগেই রান্নাঘরে এসে হাজির। সান্ত্বনা গুছিয়ে রেখেছে সব। একটি কথাও না বলে তার হাতে তুলে দিল। খেয়াল করে ওর মুখের দিকে তাকালে নিধুরামও ভড়কে যেত হয়ত। কিন্তু তার চোখ অন্যদিকে। নিজেদের জন্য কতটা আছে না আছে দেখে নিয়ে খাবার হাতে দ্রুত প্রস্থান করল আবার।

রোজকার মতই খবরের কাগজ নিয়ে বসেছে মনিব। খাবারের ডিশে হাত বাড়াল। তার পরেই তফাৎটা বুঝতে পারল। কাগজ কোলে নামিয়ে ভালো করে দেখল চেয়ে। তার পর অবাক হয়ে তাকালো নিধুর দিকে। কিছু স্মরণ হ'ল বোধ হয়।

নিধু প্রস্থানোদ্যত।

ডাকল, এই শোন্ তো—

প্রত্যাবর্তন।

এ খাবার তুই তৈরী করেছিস না কেউ পাঠিয়েছে?

নিধু জবাব দিল, এ বৃষ্টিতে আবার পাঠাবে কেমন করে, ঘরে বসেই তৈরী করেছে দিদিমণি।

দিদিমণি!

স্মরণ করিয়ে দিতে চেষ্টা করল নিধু, সেই ওভারসিয়ার দিদিমণি—সেই সেবারে রাস্তায় যার সঙ্গে পোলাও-কালিয়া বদল হয়ে গেছল। বাইরে দাঁড়িয়ে জলে ভিজছিল, আমি ধরে নিয়ে এলাম—আসতে কি চায়, বলে, তোমার বাবু রাগ করবেন না তো?

চায়ের সরঞ্জাম হাতে সান্ত্বনা সরাসরি ঘরে ঢুকে পড়ল। তেপায়ার ওপর রাখল ঠক্ করে। বলল, অত জেরার কি আছে, খেতে ভালো না লাগে সরিয়ে রেখে দিন। নিধু ওমলেট আর পাঁউরুটি নিয়ে আসুক, চিবোন বসে বসে।

বাক্য শুনে নিধু হতভম্ব। বাইরের জলের দরুন ঘরে আলো কম হচ্ছিল। আলোটা জ্বেলে দিল। মনিবের মুখে রাগের চিহ্নমাত্র না দেখে আশ্বস্ত। উল্টে হাসির মতোই দেখল যেন। তক্ষুনি রান্নাঘরের কথা মনে পড়ে গেল তারও। তাড়াতাড়ি সেদিকেই চলল সে।

বসুন।

বন্ধ দরজা-জানালার কোনো এক ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা যদি এসেই পড়ে সেটা উপলব্ধি না করে উপায় নেই। চাক বা না চাক, ভালো লাগার আভাস লাগল চিক ইঞ্জিনিয়ারের মুখে।

এ রকম পরিবেশে সান্ত্বনার একমাত্র সোজা রাস্তা সহজ হওয়া। এই সহজ হওয়ার দায়েই সরাসরি ঘরে এসে ঢোকা। বলল, হ্যাঁ বসবে, বাড়িতে ওদিকে বাবা কত ভাবছেন!

জানালা দিয়ে বাইরের জলঝরা আকাশ নিরীক্ষণ করে বাদল গাঙ্গুলি হালকা জবাব দিল, তাহলে বাড়ি যান।

বিস্মিত নেত্রে তাকালো সান্ত্বনা, এই বৃষ্টিতে যাব কি করে?

তাহলে বসুন।

সান্ত্বনা সকৌতুকে দেখল আবারও। পরে বলল, আমার নাম সান্ত্বনা। আমাকে আপনি বসুন বলতে হবে না।

খেতে খেতে বাদল গাঙ্গুলি মুখ তুলে হাসল একটু।—নাম জানি।

সকলেই জানে।

অর্থাৎ সকলেই যখন জানে, তার জানাটাও এমন কিছু নয়। এই নিস্পৃহ অভিব্যক্তির পিছনে আয়াস কতটুকু বুঝতে দিতে রাজী নয় সান্ত্বনা। বলল, কতক্ষণে যে ধরবে এ ছাইয়ের জল কে জানে, সেই কখন থেকে আটকে আছি।

নরেনবাবু হলে এই অকালবর্ষণের সুবিবেচনার কথা বলে খাবারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠত। আহার-রত মানুষটা সে দিক দিয়েও গেল না। ক্ষুদ্র প্রশ্ন করল, আজ এদিকে রাউণ্ড ছিল বুঝি?

এবারেও সেই একই কথার টোপ ফেলল সান্ত্বনা।—ছিলই তো, আপনার ডিম-রুটি চিবুনো বরাতে নেই বলেই ছিল বোধ হয়। ওই নিধুর জন্যে, নইলে কবে এতক্ষণে ভিজেই বাড়ি চলে যেতাম।

এবারেও সুতোটা ছেড়ে দিয়ে গেল বাদল গাঙ্গুলি। মৃদু হেসে পেয়ালায় চা ঢেলে নিয়ে আবার আহারে মনঃসংযোগ করল।

জানালার কাছে গিয়ে একবার আকাশটা দেখে এলো সান্ত্বনা। তার পর দাঁড়িয়ে রইল তেমনি। ভুরুযুগলে কুঞ্চনরেখা মিলিয়ে গেল। এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি, আগের থেকে শুকনো দেখাচ্ছে ভদ্রলোককে। মড়াইয়ে বিগত গোলযোগের দরুন বোধ হয়। কিন্তু শুকনো হলেও সঙ্কল্পের কাঠিন্য আছে তাতে। আর আছে প্রায়-রূঢ় স্বাতন্ত্র্যবোধ। ভেবেছিল এই নিয়ে কথাবার্তা হবে, মড়াইয়ের ভালোমন্দ মিশে আছে তারও মনের সঙ্গে, জানিয়ে দেবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ভয়ানক গায়ে-পড়া শোনাবে। এরকম নির্বিকার অভ্যর্থনায় সান্ত্বনাও অভ্যস্ত নয় আজকাল।

কি হ'ল, বসতে আপত্তি আছে নাকি? চায়ের পেয়ালা রেখে বাদল

গাঙ্গুলি মুখ তুলল আবার। আপনি বা তুমি দুইই এড়িয়ে গেল।

সান্ত্বনাও লক্ষ্য করল সেটুকু। ঘরের মধ্যে বসবার দ্বিতীয় জায়গা শয্যা বিছানো খাটখানা। খাটের পাশেই টেবিল। টেবিলের ওপব নীলার ফোটো। ফোটোর মধ্যে মেয়েটা যেন একেবারে মুখোমুখি হাসছে তার দিকে চেয়ে চেয়ে। পাল্টা জবাবেই যেন সান্ত্বনা ঈষৎ ভ্রূভঙ্গি সহকারে দেখতে লাগল তাকে। আর তার এই দেখাটা অনুসরণ করে অন্য লোকটির নীরব চাঞ্চল্য না তাকিয়েও উপলব্ধি করতে পারল।

বাদল গাঙ্গুলির দু চোখ ওব দিকেই সংবদ্ধ। ভিতরে একটা নাড়াচাড়া পড়ল হঠাৎ। গুরুগম্ভীর পদমর্যাদার আবরণ সরিয়ে অনেকদিনের আহত মানুষটাই জেগে উঠল যেন। নিছক কৌতূহলে ভিতবের একটা দুর্বল ক্ষত কেউ উল্টে পাল্টে দেখতে থাকলে যেমন লাগে তেমনি লাগছে। অস্বস্তিকর, যন্ত্রণাদায়ক।

হঠাৎ বেদম হাসি পেয়ে গেল সান্ত্বনাব। হাসতে হাসতে খাটের কোণ ঘেঁষে বসে পড়ল এবার। মানুষটার চোখের দৃষ্টি ধারালো হয়ে উঠেছে দেখেও হাসি থামে না কিংবা হয়তো ইচ্ছে করেই থামতে দিল না সেটা।

এত হাসির কি হ'ল? নীরস ঠাণ্ডা প্রশ্ন।

সান্ত্বনার সামলে নিতে সময় লাগল তবু। শাড়ির আঁচলে চোখ মুখ মুছে নিয়ে বলল, শুনলে আপনি রেগে না যান। আপনার নিধুরও ভারি শখ এইরকম একখানা ঝকঝকে ফোটো ওর টেবিলে রাখে, আমাকে বলছিল যদি একটা যোগাড়-টোগাড় করে দিতে পারি।

হাসির কারণ শুনে অন্তস্তলের একটা ছায়াভয় মুহূর্তে অপসৃত হয়ে গেল যেন। ইচ্ছে না থাকলেও যেখানে সহজ হওয়া যায়, সহজ হতে হয়, তেমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে মেয়েটার জুড়ি নেই বোধ হয়। মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো বাদল গাঙ্গুলি। বলল, তা তুমি ইচ্ছে করলে এর থেকে অনেক ভালো ফোটোই তো নিধু পেতে পারে, বলছিল যখন দিয়েই দাও একখানা।

বুঝল সান্ত্বনা। বুঝেও দুর্বোধ্যতার ভান করতে হ'ল তাকে।—আমি কোত্থেকে দেব?

তোমার নিজের ফোটোই একখানা দিয়ে দিতে পারো…।

চকিত কটাক্ষে সান্ত্বনা তাকালো একবার তার দিকে। অপরিণত অজ্ঞতায় ঠোঁট উল্টে জবাব দিল, আমার ফোটোই নেই—। কি মনে পড়তে আর এক ঝলক হাসল আবার। মুখোমুখি জাঁকিয়ে বসল।—জানেন, মাসিমা একবার তো আমায় সাজিয়েগুজিয়ে ফোটো তোলানোর সব ঠিকঠাক করলে। ফোটো-

গ্রাফারের সামনে যেই গিয়ে দাঁড়ানো, অমনি ভদ্রলোক সেই কালো ঘোমটা মাথায় দিয়ে যা শুরু করে দিলে—সোজা হোন, বেঁকে দাঁড়ান, মুখ তুলুন, মুখ নামান, গম্ভীর হোন, ওয়ান—টু—হাসুন। আমার আগেই হাসি পেয়ে যাচ্ছিল, তার ওপর যেই না বলা হাসুন, আমি হেসে একাকার—কালো ঘোমটা সরিয়ে ভদ্রলোক এমন চেয়ে রইল—আমার হাসি আর থামলই না, একেবারে দে ছুট!

নিজের অজ্ঞাতে ভালো লাগছে বাদল গাঙ্গুলিব। কল খুলে দিলে যেমন ঝরঝরিয়ে জল পড়ে, এ মেয়ের হাসির উৎসে নাড়া পড়লে তেমনি ঝরঝবিয়ে হাসি ঝরে।

তোমাব সুন্দরী কেমন আছে?

আর একদিন আর এক জায়গায় এই একই প্রশ্ন করে যে জবাব পেয়েছিল বিলক্ষণ মনে আছে। আছে বলেই আজ আবারও জিজ্ঞাসা কবল।

সান্ত্বনা যথার্থই লজ্জা পেল এবার।—তবু বলল, ওর ওপব্ আপনার খুব টান দেখছি।

যে টানা টানিয়েছিলে, টান হবে না?

আরক্ত হয়ে উঠল সান্ত্বনা।—আমি কি জানতুম আপনি চিফ ইঞ্জিনিয়ার এখানকার?

জানলে কি করতে?

স্যালুট-ট্যালুট করতাম বোধ হয়।

গোরু ছুটে যেতে যেভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল, দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল বাদল গাঙ্গুলির। সে কথা বলে লজ্জা না দিয়ে বলল, কিন্তু তার পরেও তো অনেকবার দেখা হয়েছে, পরোয়া কর নি তো?

অম্লান বদনে উল্টো জবাব দিল এবার। আমি পরোয়া করতে যাব কেন, আমি আপনার চাকরি করি?

বাদল গাঙ্গুলি হাসছে।

ঘরের আলোয় বাইরের দিকটা এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি কেউ। অধ্যবসায়ী ছাত্রের দুরূহ কোন আঁকের ফল মিলে গেলে যেমন হয় তেমনি একটা তৃপ্তির আস্বাদন নিয়ে সান্ত্বনা উঠে জানালার ধারে জল থেমেছে কিনা দেখল। জিব কামড়ে বলল, এই যা, জল কখন ছেড়ে গেছে, বাবা দেবে'খন, আমি চলি—।

ঘাড় ফিরিয়ে বাদল গাঙ্গুলিও তাকালো বাইরের দিকে। সন্ধ্যার ঘন ছায়া নেমেছে। বলল, নিধুকে ডেকে দিই, সে সঙ্গে যাক।

অস্ফুট হেসে উঠল সান্ত্বনা, চাল নেই, তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার—

নিধুকে ডাকতে হবে না, আমি একাই যেতে পারব।

লঘু চরণে ঘর থেকে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।···বাদল গাঙ্গুলি চুপচাপ বসে। রাত্রিচেরা বিদ্যুৎঝলকে বিবরাশ্রয়ীদের সাড়া পেয়ে হঠাৎ সচেতন হ'ল যেন। এ বিস্মৃতি চায় নি, চায়ও না। চোখ দুটো আবার শুকনো খরখরে হয়ে উঠতে লাগল আগের মতোই।

কিন্তু তবু ঘরের আলোটা এখন নিষ্প্রভ লাগছে কেমন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কোয়ার্টার থেকে সান্ত্বনা বেরিয়ে এলো বিজয়িনীর মতোই। অন্তর্তুষ্টিতে ভরপুর। কাউকে বলা যাবে না, নরেনবাবুকেও না।···বলতে পারলে কিন্তু বেশ হ'ত। কলের মানুষ নাকি! কলের মানুষের কলকব্জাগুলো একটু নাড়াচাড়া করে দেখে আসতে পারে বোধ হয় ইচ্ছে করলে।

কিন্তু মেন কোয়ার্টারস-এর বাঁধানো রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই সমস্ত নারী-বিক্রম ঠাণ্ডা। কোয়ার্টার থেকে পঁচিশ-তিরিশ গজ দূরে রাস্তার আলোর নীচে দাঁড়িয়ে রণবীর ঘোষ কথা বলছে নিধুর সঙ্গে। মড়াইয়ের সোসাইটি বলতে মেন কোয়ার্টারস্। দেখা এখানে সকলের সঙ্গেই হতে পারে। কিন্তু জলঝরা রাস্তায় লোকজন নেই আজ, এখানে এ সময়ে নিধুর সঙ্গে কথা বলাটা শুধুই যোগাযোগ নয় নিশ্চয়। সেই বাদনা উৎসবের পর এই ক'মাসের মধ্যে লোকটাকে আর সামনাসামনি দেখে নি সান্ত্বনা।

মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে নিল। সোজা নিধুর সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে অনুশাসনের সুরে বলল, তুমি এখানে আর ওদিকে ডেকে সারা এতক্ষণ। আমাকে পৌঁছে দেবে চলো।

কিন্তু নিধুর মনে রয়েছে অন্য চিন্তা। বলে উঠল, এই যাঃ, তুমি চলে এলে দিদিমণি, তোমার খাবার যে রান্নাঘরে ঢাকা পড়ে থাকল! আমি অপিক্ষে করে করে ভাবছিলাম ··

তুমি আসবে না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্‌বক্ করবে? যথার্থ রেগে উঠল সান্ত্বনা।

নিধু হকচকিয়ে গেল। সান্ত্বনা ভ্রূক্ষেপ করুক বা না করুক, রণবীর ঘোষ নিজে থেকেই অমায়িক হেসে বললে, আপনার যাবার তাড়ায় বেচারীর দরদটুকু মাঠে মারা গেল, খবর সব ভালো তো?

জবাব না দিয়ে সান্ত্বনা পলকের জন্য শুধু মুখ তুলে তাকালো একবার। সেই হাসি ভেজানো ঝকঝকে মুখ আর চকচকে চোখ। বিগত গোলযোগের আঁচ লেগেছে কোথাও মনে হয় না, একটুও বদলায় নি।

পা বাড়াবার আগেই দ্বিতীয় দফা বাক-নিঃসরণ হ'ল রণবীর ঘোষের।—

সেই দু মাস আগে আমার গো-ডাউন দেখতে যাবেন বলেছিলেন, এতদিনের মধ্যে কই একবারও গেলেন না তো ?

আপনার গো-ডাউন এখনো আছে নাকি ?

বলবে ভাবে নি, বলতে চায়ও নি। মুখ দিয়ে আপনিই যেন বেরিয়ে গেল হঠাৎ। সচকিত হয়ে ডাকল, নিধু এসো—

সায়েবকে বলে আসি দিদিমণি···

বলতে হবে না, এসো তুমি। ঝাঁঝিয়ে উঠে সান্ত্বনা হনহন করে এগিয়ে গেল।

রমণী-বিরাগে অনভ্যস্ত নিধুরাম শশব্যস্তে অনুসরণ করল তাকে। মনটাই খারাপ হয়ে গেছে। দিদিমণি এ রকম বললে বলে নয়, নিজের হাতে সব করে না খেয়ে চলল বলে। বেচারীর দোষ নেই। জিজ্ঞাসা করতে এসেও মনিবের ঘরের আবহাওয়া দেখে রসভঙ্গ করতে মন সরে নি। বাবুর অমন হাসিমুখ দেখে নি অনেককাল।

সামনের বাঁক না পেরনো পর্যন্ত সান্ত্বনা আর এদিক ওদিক চাইতেও পারছে না। না তাকিয়েও পিছনে রণবীর ঘোষের দুই চোখ উপলব্ধি করতে পারছিল। নিধু পাশে আসতে জিজ্ঞাসা করল, লোকটা দাঁড়িয়ে আছে না তোমার বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেল ?

নিধু ঘাড় ফিরিয়ে দেখল একবার। বলল, দাঁড়িয়ে এদিকপানে চেয়ে আছেন। বাবুর সঙ্গে আজ আর দেখা করবেন না তো উনি।

সান্ত্বনা বলল, দেখা করবেন না তো তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে এত কি কথা হচ্ছিল ?

যেন সে-ই মনিব নিধুর। নিধুর বক্তব্য, দেখা করার জন্য লোকটি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে শেষে ঠিক করেছে অত রাত্রে আর দেখা করবে না, আর একদিন আসবে।

জবাবদিহি শুনে আরো রেগে গেল।—অপেক্ষা করছিল তো তুমি তোমার বাবুকে খবর দাও নি কেন ?

তাই বা কি করে দেবে নিধু! লোকটা যে নিষেধ করল, সাহেব দিদিমণির সঙ্গে গল্প করছে যখন আর বিরক্ত করে কাজ নেই, বাড়িতে কখন কি রকম ফুরসত থাকে সাহেবের, তাই জেনে নিচ্ছিল।

নিধুর আত্মসমর্থনে কিছুমাত্র খুশি না হয়ে নিজের মনে গজগজ করতে করতে এগোলো সান্ত্বনা।

নিধু মিথ্যে বলে নি খুব। তা বলে নির্জলা সত্যিও বলে নি একেবারে। দিদি-

মণির মেজাজ দেখে চেপে গেল। নইলে কথা উঠতে আরো অনেক কথাই বলে ফেলেছে সে। দিদিমণির কথা। যত বড় সাহেবই হও, দিদিমণির সামনে সব জল। প্রকারান্তরে এ কথাটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছে রণবীর ঘোষকে। তার পর দিদিমণির রান্নার প্রশংসাও করেছে বৈকি। আর তাই যখন করল, সেবারের সেই 'টিপিনকার' বদলে দেওয়ার মজার খবরটাই বা না বলে পারে কি করে।

কিন্তু সান্ত্বনার মন থেকে রণবীর ঘোষ মুছে গেল একটু বাদেই। তার আগের অধ্যায়টুকুই জুড়ে বসল আবার।···নরেনবাবু মিথ্যে বলে নি বোধ হয়। আসলে ওই মেয়েটাকে ভুলতে পারে নি বলেই একটা শোকের অহঙ্কার চোখের সামনে সর্বদা জিইয়ে রাখতে চায় মানুষটা। নইলে ও ছবিটা ওভাবে ওখানে থাকত না। থাকুক, সান্ত্বনার আপত্তি নেই। কিন্তু ঠুনকো এক নারী-বিষে জ্বলছে বলে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে একজন তার গ্লানি ছড়িয়ে সমস্ত মেয়ে জাতটাকে কালো করে দেখবে, সেখানেই যত আপত্তি। ওকে যেন তাদের সকলের অপমান। থেকে থেকে কেবলি মনে হতে লাগল, একটা কাজের মতো কাজ হয়েছে আজ। ওপর ওপর দেখতে গেলে কিছুই নয়, কি আর এমন বলে এসেছে কিন্তু মনের কারিগরী অন্য রাস্তায়। ও যেন জানে, বলাটাই সব নয়। বলে হোক, না বলে হোক, ওই লোকটার ওই কালোর শোক কিছুক্ষণের জন্য অন্তত ঘুচিয়ে এসেছে।

নিধুকে আগেই বিদায় দিয়েছে। বাড়ি ঢুকে দেখে, বাবা চিন্তিত মুখে ঘরবার করছেন। দেখেই বলে উঠলেন, ঝড়জল দেখে বেরোস্ না, না কি—?

অপ্রস্তুত হয়েও জবাব দিল, জল এসে গেল তার আমি কি করব ?

বিরস বদনে অবনীবাবু কাছে এসে হাত দিয়ে তার গা মাথা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলেন, ভিজেছে কি না।

কেমন, ভিজেছে ?

অবনীবাবু হেসে বললেন, না, খুব বাহাদুরি—সেই থেকে ভাবছি আমি, ছিলি কোথায় তুই ?

তোমার তো কাজ না থাকলেই ভাবা, রোসো এদিকের ব্যবস্থা দেখে আসি আগে।

সরে এলো সান্ত্বনা। ব্যবস্থার জন্য নয়, ছিল কোথায় এতক্ষণ সেটাই এড়াতে চায়। কিন্তু কেন ?

এই কেনটাই ভালো লাগছে না কেন জানি। নিজের পরিবর্তন জানে, উপলব্ধি করে। আগে হলে বাবার সামনে জাঁকিয়ে বসত, বলত সব। আজ

বলতে পারল না। পারল না, কারণ জলটা হঠাৎ এসেছে বটে, কিন্তু বাদল গাঙ্গুলির বাড়িতে ওর যাওয়াটা আকস্মিক কিছু নয়। জলের সুযোগে ভিতরের একটা আগ্রহ ওকে ঠেলে পাঠিয়েছে।

তিন চার দিন পরে বাড়ি ঢুকেই নরেন হৈ-চৈ করে উঠল প্রায়, তোমার ব্যাপারখানা কি বল তো! অমন একটা অ্যাডভেঞ্চার করে এলে অথচ আমাকে বলই নি কিছু?

শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুখে এক ঝলক রক্ত নেমে এলো সান্ত্বনার। কাজের অছিলায় উঠে গিয়ে একটু বাদে ফিরে এলো আবার।—কি হয়েছে বুঝলাম না।

বুঝলে না? সেদিনের জলে কোথায় আটকে পড়েছিলে?

ও, এই কথা। সে আবার বলার মতো কি?

বলার মতো কি! জবাব শুনে নরেন আরো অবাক। যেন নির্ঝরিণী বলছে, ঝরার মতো কি।

যথাসম্ভব নিস্পৃহতা বজায় রেখে সান্ত্বনা সাদাসিধে ভাবেই জিজ্ঞাসা করল, কার কাছে শুনলেন?

নিধুরাম দি গ্রেট।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ওর কথা ভুলেই গিয়েছিল। এবারে রাগও হ'ল বেশ। ঠেস দিয়ে বলল, নিধুরামের সঙ্গে খুব ভাব বুঝি আপনার?

খুব। নিধু হ'ল আমার দশ বছরের শাকরেদ।

কান কুড়কুড় শেখে? হেসে উঠল। ঠাট্টা করতে পেরে নয়, প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্য।

অ্যাডভেঞ্চারের কথাটা চাপা পড়ে গেল ঠিকই। এর পরেও ও কিছু বলল না দেখে নরেনও তুলল না কথা। মনে একটা জিজ্ঞাসার আঁচড় পড়ল কি পড়ল না। ব্যাতিক্রমটুকুই উপলব্ধি করল শুধু। কিছুদিন ধরেই করছে। কথার ফাঁকে ফাঁকে ওকে লক্ষ্য করল অনেকবার।...উচ্ছলতা নয়, সম্প্রতি খুশির জোয়ারটা ওর ভিতরে এসে থেমে আছে যেন।

ড্যামের সকলেই ব্যস্ত ইদানীং। আর একটা বছর ঘুরে আসছে। কাজের গতি লক্ষ্যের নিশানায় পৌঁছয় নি। নতুন বছরের ছক কাটা হচ্ছে। সন্ধ্যায় মিটিং বসছে রোজই। আরো লোকজন আরো সাজসরঞ্জাম আরো তৎপরতা বাড়ানোর জল্পনা-কল্পনা।

অবনীবাবুর বাড়ি ফিরতে রাত হয় প্রায়ই। নরেনেরও ক'দিনের মধ্যে দেখা নেই। আগে এ ধরনের বাড়তি অবকাশে সান্ত্বনা নিজেকে আরো বেশি করে বাইরে ছড়িয়ে দিত। কিন্তু পর পর ক'টা দিন বাড়ি বসেই কাটছে একরকম। বাইরের সঙ্গে নিজেকে মেলানোর অশান্ত তাগিদে ছেদ পড়েছে। বেশ লাগছে এই ভরা ভরা অলস মুহূর্তগুলো।

দিদিয়া!

হঠাৎ পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন কাঁটা দিয়ে উঠল সান্ত্বনার। ভিতরের দাওয়ায় বসে বাইরের আলোর রংবদল দেখছিল চুপচাপ। উঠবে, আলো জ্বালবে, সন্ধ্যে দেখাবে। আঁধার ঘনিয়ে আসছিল, কিন্তু উঠি উঠি করেও ওঠা হচ্ছিল না। এরই মধ্যে অনতিদূরে কোথায় চাপা গলার অতিপরিচিত ফিস ফিস ডাক শুনে সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। সহসা প্রেতের ডাক শুনল যেন।

ই দিদিয়া!

সান্ত্বনার সারা অঙ্গে হিমস্রোত বইছে একটা। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। আকুল হয়ে বলতে চাইল, কোথায় রে, কোথায় তুই? ব্যাকুল নেত্রে এদিকে ওদিকে তাকাল শুধু।

দি-দি-য়া!

এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল এবার। সুন্দরীর ঘরের দিক থেকে আসছে অস্ফুট কণ্ঠস্বর। এগিয়ে গেল। আড়ষ্ট কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল তার পর। গোয়ালঘরের দেওয়াল ঘেঁষে অন্ধকারে আবছা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

চাঁদমণি।

অস্ফুট হাস্যধ্বনি।—আমাকে চেনতে পারিস লাই দিদিয়া?

সান্ত্বনা সামলে নিয়েছে খানিকটা, মৃদু গলায় ডাকল, আয়।

উবাসীর বাবু কথা?

নেই, আয়। হাত ধরে তাকে ভিতরের দাওয়ায় নিয়ে এসে আলো জ্বেলে দিল। তারপর আর মুখে কথা সরল না একটাও।

চাঁদমণি কিন্তু হাসছে। যেমন হাসতো আগে তেমন নয়, তবু হাসছে। সান্ত্বনার আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, তুকে একটোবার দেখতে আলাম, আরো অনেক সোন্দরপানা দেখতে লাগছে তুকে।

সোজাসুজি সান্ত্বনা তাকাতেও পারছে না। মড়াইয়ে চাঁদমণি বলে মেয়ে ছিল একটা পাগল সর্দারের। অনেকদিন পর্যন্ত তার মূর্তি আর তার কথা সকলেরই মনে হয়েছে। অন্তত সান্ত্বনার তো হয়েছে। কিন্তু সব সত্ত্বেও প্রেতের প্রত্যাবর্তন

যেমন কাম্য নয়, তেমনি বিষম এক অস্বস্তিতে স্তব্ধ হয়ে রইল যেন।···কালোর ওপর আলগা কালো ছাপ পড়েছে আর একটা, ঢলঢলে প্রাচুর্যে শুকনো টান ধরেছে, যে কালো চোখ কারণে অকারণে জ্বলতে দেখেছে কতবার, তার নিচে যেন কালো দীঘির ছায়া। চকচকে মুখে পরুষ নির্যাতনের রুক্ষতা, আর··· আর···মেয়েটা একলা নয় এখন, ওর দিকে তাকালেই সেই অনাগত সম্ভাবনাটা চোখে পড়ে।

চাঁদমণি দাওয়ার ওপরে বসল।

সান্ত্বনা দাঁড়িয়ে তেমনি। কি করবে, কি বলবে বুঝে উঠছে না। কেন এলো মেয়েটা। এলো যদি, এমন লুকিয়ে তার কাছেই বা এলো কেন! অস্ফুট প্রশ্ন করল, এতদিন ছিলি কোথায় তুই?

ছেলাম? হাসিতে দাঁতগুলি আগের মতো ঝকঝকিয়ে উঠল না আর।··· ছেলাম—কেতো লয়া জায়গায় ছেলাম।

তোর বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে? সান্ত্বনাও বসল আস্তে আস্তে।

সভয়ে চাঁদমণি ফিরে তাকালো তার দিকে। বলল, উ দেখলে তো ভূঁয়ে পুঁতে ফেলাবে।

বেশ করবে, হঠাৎ রাগে দপ করে উঠল সান্ত্বনা, আঁশবঁটি দিয়ে কুটবে তোকে, আমি খবর পাঠাচ্ছি তাকে।

চাঁদমণি অনেকক্ষণ শুধু চুপচাপ চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর হাসল আবার। সেই হাসি দেখে গা আরও জ্বলে গেল সান্ত্বনার, মড়ার হাসি-রোগ যায় নি এখনো। কিন্তু পর-মুহূর্তে হকচকিয়ে কাঠ হয়ে গেল একেবারে। সহসা উবুড় হয়ে তার দু পা আঁকড়ে ধরে মাথা গুঁজে পড়ে রইল চাঁদমণি। নড়ার ক্ষমতা নেই, সর্বাঙ্গ অবশ সান্ত্বনার। এক পাহাড়প্রমাণ জমাট বেদনা যেন কেঁদে কেঁদে তার পায়ের ওপর গলিয়ে দিচ্ছে মেয়েটা।

নিস্পন্দ পুতুলের মতো বসে আছে সান্ত্বনা। কিন্তু ওই কান্নার স্পর্শে চোখ দুটো তারও ভিজে উঠেছে বার বার।

নিজেই উঠল চাঁদমণি। শান্ত হয়ে আঁচলে চোখ মুছে নিল অনেকক্ষণ ধরে। আবারও হাসল তারপর। জানাল, দিদিয়ার সঙ্গে ছাড়া আর কারও সঙ্গেই দেখা করতে সাহস করে নি। দিদিয়ার ও ক্ষতি করতে চেয়েছে কতবার, তবু। ও চলে যাচ্ছে, এখান থেকে অনেক দূর চলে যাচ্ছে, আর কোনদিন দেখা হবে না কারও সঙ্গে, কিন্তু সকলকে একবারটি দেখতে ইচ্ছে করে খুব—সকলকে আর কি করে দেখবে, লুকিয়ে লুকিয়ে শুধু বাবাকে দেখবে একবার, দেখে চলে যাবে।

কোথায় যাবি ? কার সঙ্গে যাবে, সে প্রশ্ন আর মুখে এলো না।

কে জানে কোথায় যাবে। কে জানে কতদূর নিয়ে যাবে তাকে। বাবাকে একবার দেখা হলেই যেখানে হোক যাবে, আজ ক'দিন ধরে চেষ্টা করছে তাকে লুকিয়ে দেখতে, কিন্তু মড়াইয়ে তো আর যেতে পারে না, গাঁয়ের দিকে গেলেও সকলে চিনে ফেলবে। দিদিয়া কি আর বাবাকে দেখেছে ? ক'দিন দেখেছে ? কোথায় দেখেছে ?

আবার উষ্ণ হয়ে উঠছে সান্ত্বনা। সেই নিমম বিচারেব মহড়া ভেসে উঠল। কি না হতে পারত। নিজের জীবনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে যে লোকটা এত বড় বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করল তার বাবাকে, তার প্রসঙ্গ আভাসেও জিজ্ঞাসা করল না একবার। সান্ত্বনা নীরস কণ্ঠে বলে উঠল, নিজের দেশ ছেড়ে সকলকে ছেড়ে ওই জমাদার লোকটাই বেশি হ'ল যখন, তখন আবার দরদ কিসের এত ?

কোন্ জমাদার ? বাহাদুর ? হঠাৎ চাঁদমণির দুই চোখ জলন্ত অঙ্গারের মতো ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠল। যেমন মড়াইয়ে জ্বলত আগে। চেয়ে রইল সান্ত্বনার দিকে। শুধু ওকে নয়, ওর ভিতর দিয়ে সকলের ধারণাটাই উপলব্ধি করে নিতে চাইলে বোধ হয়। তারপর আস্তে আস্তে নিবে গেল আবার। শান্ত হ'ল। ঠাণ্ডা জবাব দিল, বাহাদুর লয়।

সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎস্পৃষ্টের মতো একটা ঝাঁকুনি খেলো সান্ত্বনা। বাহাদুর নয় ! বাহাদুর না হলে যে আর কে সেটা বুঝতে এক মুহূর্ত দেরি হ'ল না তার।

চাঁদমণি জানাল, সেই থেকে কলকাতায় ঘোষবাবুর আড়তে কাজ করছে বাহাদুর। ঘোষবাবু অনেক টাকা দিয়েছে তাকে, আরো দেবে। টাকার লোভে বাহাদুর ওকে দেশে নিয়ে যেতে রাজী হয়েছে, বলেছে বিয়ে করবে। কিন্তু বিয়ে করবে না চাঁদমণি জানে, কেউ করে না···কিন্তু যেতেই যখন হবে কোথাও, ভয়ডর নেই আর, ওর সঙ্গেই যাবে।

মুখ তুলে সান্ত্বনা চাইতেও পারছে না আর। নির্বাক, বিমূঢ়, অধোবদন।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে চাঁদমণি উঠে দাঁড়াল একসময়। বলল, যাবার আগে পারলে দিদিয়ার সঙ্গে আর একবার দেখা করে যাবে।

তবু একটি কথাও বলতে পারল না সান্ত্বনা। মুখ ফুটে একবার জিজ্ঞাসাও করতে পারল না, কোথায় যাচ্ছে এখন ও, কোথায় থাকবে।

দিদিয়া—

ডাক শুনে এবারে চমকে তাকালো ওর দিকে। কিছু একটা বলবে চাঁদমণি,

স্থিরনেত্রে দেখছে তাকে, চোখ দুটো চকচক করছে প্রায় আগের মতোই।

হঠাৎ অস্ফুট কণ্ঠে একটু হেসে উঠল চাঁদমণি। বলল, দিদিয়া, আখুন তুকে আরো ঢের ঢের সোন্দর দেখতে লাগছে। তু টুকচি সামলে চলিস, বোঝলি?

পিছনের গোরু ঢোকা সরু পথ দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

সান্ত্বনা স্থাণুর মতো বসে আছে তেমনি। কতক্ষণ ঠিক নেই। আজ বুঝতে পারছে, অনেক কিছুই বুঝতে পারছে। কেন মড়াইয়ে রণবীর ঘোষের সঙ্গে প্রথম দিন ওকে দেখে অগ্নিদৃষ্টিতে ভস্ম করে ফেলতে চাইছিল চাঁদমণি, বুঝতে পারছে। বুঝতে পারছে, কেন আদিম ঈর্ষায় বাদনা উৎসবে ওই মেয়ে ক্ষতবিক্ষত করতে চেয়েছিল ওকে। আর বুঝতে পারছে, শাল মহুয়ার ধারে কোন্ প্রতীক্ষায় জিপ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত রণবীর ঘোষ।

কিন্তু আজ ওর কাছেই এলো কেন চাঁদমণি? এলো কোন্ বিশ্বাসে? সহানুভূতির জন্যে নয়, নালিশ জানাতে নয়। শুধু ওর বাবাকে দেখার ইচ্ছেয় এসে থাকলে তাকে দেখেই ফিরে যেত। এত বড় মর্মঘাতী বেদনা নিয়ে ওর কাছে আসত না। এসেছে শুধু এই জন্য, এসেছে শুধু এই শেষের কথাটি বলে যেতে। এসেছে নারীমাংসলোলুপ এক পুরুষদানবের সম্বন্ধে ওকে সচেতন করে দিয়ে যেতে।

মড়াইয়ের বাতাস পর্যন্ত দুঃসহ বিষাক্ত হয়ে উঠল যেন। কিছু ভালো লাগছে না, কিচ্ছু না। কাউকে বলবে কিছু? কি বলবে?

এক এক করে তিন চার দিন কেটে গেল।

অধীর আগ্রহ। দুরু দুরু প্রতীক্ষা, চাঁদমণি আবার একদিন আসবে বলে গেছে। সন্ধ্যায় বাড়ি ছেড়ে এক মুহূর্তের জন্য বেরুতে পারে না। নরেন বা তার বাবা সেই সময় বাড়ি থাকলেও অধীর হয়ে ওঠে।

অস্থিরতা বাড়ে। দুপুর হতে সোজা মড়াইয়ে চলে এলো সেদিন। পাগল সর্দারের দেখা পেল না। প্রায়ই কামাই করে আজকাল। কিন্তু সেদিন আরো একটা লোককে দেখল না সান্ত্বনা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাছে দূরে সর্বত্র খুঁজল। হোপুন। অক্লান্ত নির্মম যান্ত্রিক আঘাতে শক্ত কঠিন পাথুরে মাটির বুকে শুধু ক্ষতচিহ্ন আঁকে যে।

ফিরে চলল আবার। কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আসে নি পাগল সর্দারের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু অপরাহ্নের যাতনার সঙ্গে একটা ভীতিও মিশে আছে কেমন।

বাড়িতেই পাওয়া গেল সর্দারকে। মাটির ঘরের মেঝেয় বসে পাতার নলে

তামাক খাচ্ছে। অদূরে হোপুনও চুপচাপ বসে।

আই রে দিদিয়া, আয় আয়! মহা খুশি হয়ে পাগল সর্দার তামাক খাওয়া বন্ধ করে হাত বাড়িয়ে একটা মোড়া টেনে বসতে দিল তাকে।—বসো দিদিয়া, আজ সোমকাল হতে তুকে ভাবতে ছেলাম, অনেক দিন দেখি লাই।

দ্বিতীয় মানুষটার উপস্থিতি বরাবরই অস্বস্তির কারণ সান্ত্বনার। ও যে এসেছে সেটা যেন টেরই পায় নি লোকটা। তবু পাগল সর্দারের খুশির আপ্যায়নে ভিতরের একটা দুর্ভর বোঝা যেন হালকা হয়ে গেল অনেকটা। মোড়াটা তার কাছে টেনে বসে অন্তরঙ্গ ভ্রূকুটি করে বলল, বাড়ি বসে থাকলে দেখবে কি করে, কাজে যাও নি কেন আজ?

শরীলটা আরাম দেল না, জ্বর আসল ভাবলাম—

তোমার তো রোজই জ্বর আসছে আজকাল। জ্বর এলে কেউ খালি গায়ে বসে থাকে? কপালে পিঠে হাত দিয়ে তার গা পরীক্ষা করল সান্ত্বনা।—কোথায় জ্বর, গা তো ঠাণ্ডা পাথর! তুমি বড় শুধু শুধু কামাই কর আজকাল।

ওর হাতের এই স্পর্শ আর অনুশাসন সমস্ত বুক দিয়ে অনুভব করে নিল সর্দার। তার পর হেসে তাকাল হোপুনের দিকে, বলল, উকেও জ্বর লেগেছে, আমো সঙতে দু'দিন কামাই দেল—জ্বরপানা মূর্ত্তিটা দেখে লে দিদিয়া!

সত্যিই এবার না তাকিয়ে পারল না সান্ত্বনা, আর হেসেও ফেলল। ওর ভিতরকার ঠাণ্ডার আঁচ দশ হাত দূর থেকেও উপলব্ধি করা যায়। মুখ তুলে হোপুন দু'জনের দিকেই তাকালো। তারপর উঠে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। প্রায় আগের মতোই, কোন তারতম্য নেই।…একদিন শুধু অন্যরকম দেখেছিল। চাঁদমণির সঙ্গে সেই পাহাড়ের নির্জনে…

পাগল সর্দার কি বলে চলেছে ঠিক যেন কানে যাচ্ছে না, তার মুখের দিকেই চেয়ে আছে সান্ত্বনা। ক'টা মাসে সর্দারের বয়স যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। কালো মুখে নিষ্প্রভ জরা নেমেছে একটা। পাগল সর্দার বুড়িয়ে গেছে।

আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, চাঁদমণির খবর কিছু পেলে সর্দার?

এক মুহূর্ত। সর্বাঙ্গের স্থবিরতা মুহূর্তে বিলীন হয়ে গেল বুঝি। ক্ষীণদ্যুতি চোখের কোটরে লক্ষ্যভ্রষ্ট ব্যাধের ক্রুর পরিতাপ চিকচিকিয়ে উঠল। সময় লাগল সামলে নিতে। অবসাদাচ্ছন্ন মৃদু জবাব দিল তার পর, উ আঙ্গুসীর লাম তু আর ইখেনে লিস্‌না দিদিয়া—

নাম আর নেয় নি সান্ত্বনা। যা বোঝবার ওটুকুতেই বুঝে নিয়েছে।

বাইরের দিকে চোখ পড়তে ব্যস্ত হয়ে উঠল বিকেলের আলো কমে আসছে। চাঁদমণি যদি আসে…এসে যদি ফিরে যায়।

আর বসতে পারল না এক মুহূর্তও। ভিতর থেকে কিছু যেন ওকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল বাড়ির দিকে।

কিন্তু দিন যায়, চাঁদমণি এলো না।

হোপুন আর পাগল সর্দারের ক্ষতি কিছুতে আর বড় করে দেখতে পারছে না সান্ত্বনা। রাগ হয় ওর বাবার ওপর, কেন এতদিন বিয়ে দেয় নি। রাগ হয় হোপুনের ওপর, কেন জোর করেই বিয়ে করে নি এতদিন! নিদারুণ ভয়ে নিজের বাবার কাছে গিয়েও দাঁড়াতে পারে নি মেয়েটা। শুধু ওকে বিশ্বাস করেছে, ওর কাছে এসেছে। আশ্চর্য। কিন্তু আবার এলে বলে দেবে, তোর বাবাকে দেখে কাজ নেই চাঁদমণি, তুই পালা শিগগির, যেখানে হোক পালা। কিন্তু পালাবেই বা কোথায়, এত বড় পৃথিবীতে কোথাও আর আশ্রয় নেই…। বীভৎস শকুনির ছায়া নেমেছে ওর জীবনে।

ধড়ফড় করে ওঠে সান্ত্বনার বুকের ভিতরটা। কাঁপুনি ধরে সর্বাঙ্গে। দিনে অস্বস্তি। রাতে ঘুম নেই। সেই পা-ভেজানো কান্নার স্পর্শ ভুলতে পারছে না কিছুতে, চোখের কোণে এসে জমছে। মন বলছে চাঁদমণি আর আসবে না। যে জন্যে এসেছিল বলে গেছে। তবু সন্ধ্যার ছায়া নামার সঙ্গে সঙ্গে উতলা হয়ে ওঠে। অন্ধকার গাঢ়তর হতে নিজের অজ্ঞাতে আনাচে কানাচে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এক একবার। কোথায় বুঝি কালো মেয়ের কালো ছায়া পড়ে একটা। উৎকর্ণ, কখন বুঝি ভীত ত্রস্ত ফিস ফিস ডাক কানে আসে চাঁদমণির, দিদিয়া! ই-দিদিয়া!

—দশ—

কন্‌ট্রাক্টার ঘোষ-চাকলাদার যেমনটি আশা করেছিল, তেমনি হ'ল না।

ক্রমশ ভিতরে ভিতরে একটু উতলা হতে থাকল তারা। রণবীর ঘোষ না হোক দ্বিজেন চাকলাদার বটেই। সপ্তাহে দু'তিনবার পালা করে হেড অফিসে আনাগোনা করছে। আশ্বাস পাচ্ছে না এমন নয়। কিন্তু সেটা খুব জোরাল লাগছে না এখন। চড়া মাশুলে এমন নিস্তেজ আশ্বাস সর্বত্র মেলে। হেড অফিস থেকে লেখালেখি চলছে। এখান থেকেও জবাব যাচ্ছে। এই মামুলী অফিসি চালের রীতি জানে।

নিরুপায় বিক্ষোভ আর অসহিষ্ণু প্রতীক্ষা। এ ছাড়া পথও নেই আর।

ইচ্ছে করলেই একটা শোরগোল তুলতে পারে তারা, হেস্তনেস্ত করতে পারে। কিন্তু তাতে করে যে জালে জড়িয়েছে, সেটা আরো জটিল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। যাতে যেতে অভ্যস্ত নয় বলেই প্রথম গর্জে উঠেছিল। কিন্তু তলিয়ে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়ে গেল একটু। অনবধানে ওই ঘা সুদূরঘাতী হতে পারে। কারণ সন্দেহের দায়ে কন্‌ট্রাক্টারি বাতিল করাটাই শেষ অস্ত্র নয় চিফ ইঞ্জিনিয়ারের হাতে। অপটু চালে তাকে ঘাঁটাতে গেলে যে ব্যবস্থায় এগোতে পারে সে, তার রাস্তা সোজাসুজি গারদের দিকে।

অবশ্য এ ধরনের ভাবনা শুধু দ্বিজেন চাকলাদারেরই। রণবীর ঘোষ অত ভাবে না। ভেজালের দায় তারও জানা আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে টাকার যাদুও জানা আছে। তা ছাড়া গো-ডাউনে এখনো আর ভেজাল নিয়ে বসে নেই সে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী চৌকস হলে গো-ডাউনে পাহারা বসাতো সর্বাগ্রে। তবু চুপ করে আছে সেও। কারণ, ব্লকের সেই ফাটলটা তো এখনো হাঁ করেই আছে তেমনি। চালে ভুল হলে ওটা যা গ্রাস করেছে, তার থেকে অনেক বেশি উগরে দিতে পারে।

গো-ডাউনে বালুর পাহাড়, পাথর-কুঁচির পাহাড় আর সিমেণ্ট-বস্তার পাহাড়গুলো যেন নিঃশব্দ অনাদরের বোঝা বইছে একটা। বিরাট অপচয়ের সম্ভাবনায় স্তব্ধ। বোবা নিঃশ্বাস ছাড়ছে যেন। সর্বত্র পরিত্যক্ত শূন্য অনুভূতি একটা। কর্মতৎপরতার সাড়াশব্দ নেই কোথাও। রণবীর ঘোষ সেখানে এসে দাঁড়ায় এক-এক সময়। দুর্জয় ক্রোধে দেহের প্রতি রন্ধ্র ভরাট হতে থাকে।

চিঠি পড়ছে। কলকাতার আড়ত থেকে চিঠি। নতুন বারতা কিছু নেই। হেড অফিসের প্রীতিবদ্ধ শুভানুধ্যায়ীদের নির্দেশ, চিফ ইঞ্জিনিয়ার নরম না হলে তদবির তদারক করে বিশেষ সুবিধে হচ্ছে না। অতএব, ইত্যাদি।

অস্ফুট কটুক্তি করে বসে বসে পাইপ টানতে লাগল। তেলতেলে মুখে লালচে আভা। দ্বিজেন চাকলাদারও চিঠি পড়ে ভুরু কোঁচকালো। চিঠিখানা আবার ছুঁড়ে ফেলে দিল তার সামনে।

পাইপ মুখে রণবীর ঘোষ অনেকটা যেন নিজের মনেই বলল, চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে নরম করবার পরামর্শ দিয়েছে।

বিরক্ত মুখে দ্বিজেন চাকলাদার জবাব দিল, তা তো দিয়েছে, কিন্তু লোকটা যে নিরেট পাথর একখানা, তাকে নরম করবেন কি করে?

ঠিক কানে গেল না বোধ হয়। অথবা শুনেও শুনল না। ঘোষ ভাবছে কিছু। আর পাইপ টানছে। অনেকক্ষণ বাদে বলল, কিন্তু সেরকম চেষ্টাও তো করি নি।

লোকটার এ ধরনের ভাব ব্যতিক্রম চেনে দ্বিজেন চাকলাদার। মগজে নতুন কিছু মতলব এসেছে বা আসছে। ও মগজের প্রতি আস্থাও প্রচুর। অবশ্য যদি সেটা নারী-বিবর্জিত পথে চলে। মুশকিল আসানের ঘ্রাণ পেল যেন।

নিজের অজ্ঞাতে চিঠিটা দুই হাতের চেটোয় তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে রণবীর ঘোষ। তালগোল পাকিয়ে চলেছে আরো। সামনে দেয়ালের গায়ে একটা টিকটিকি আটকে আছে স্থাণুর মতো। চোখ পড়ল। নিশানা করল। ছুঁড়ে মারল ঠক করে। ঢ্যাপ করে শব্দ হ'ল একটা। টিকটিকিটা মাটিতে পড়ল। গায়ে লাগে নি, আচম্‌কা আক্রান্ত হয়ে থাবা ফসকেছে।

সেই এক কথাই বলল আবার রণবীর ঘোষ, সে রকম চেষ্টাও তো করি নি আমরা তাকে নরম করার, করেছি ?

জবাবের প্রত্যাশায় নয়। নিজের মনেই পর্যালোচনা করছে কিছু। ভুল হয়েছে বৈকি। সুপারিশ করতে গিয়েও উপেক্ষা দেখিয়ে এসেছিল। নত হয় নি বরং একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে এসেছে। গোড়ায় গোড়ায় হ'ত না এমন ভুল। ভিতরের দম্ভ বিনয়ের আচে তরল করে নিতে পারত যখন তখন। মর্যাদার শিখরে বসে ড্যামের ওই অল্পবয়সী ওপরঅলাটিকে প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মান না দিয়ে ভুল করেছে। নইলে ফন্দিফিকির জানে বৈকি। পাথর নরম করারও ফন্দিফিকির জানে।

এবারে মনভিজানো আবেদন নয় আর। নিরভিমান সমর্পণ। সেও লক্ষ্যস্থলে নয় সরাসরি। মাটি চুঁইয়ে শিকড়ে পৌছানোর মতো এই সমর্পণের ধারাও চিফ ইঞ্জিনিয়ারের দরবারে পেশ করল নরেন চৌধুরীর মারফৎ। বলল, ফাঁসির আসামীও নিজের হয়ে দুটো কথা বলতে চায়, আমরা কি তাও পাব না ?

বিব্রত বোধ করল নরেন চৌধুরী। মাসের পর মাস এরকম নিরুপদ্রবে কেটে যাবে ভাবে নি। উতলা ভাবটা একেবারে যায় নি তবু। স্বচ্ছ জলের নিচে খানিকটা পঙ্কিলতা জমে থাকার মতো এই অনাবিল কর্মস্রোতের তলায় তলায় একটা গোলযোগের আশঙ্কা থিতিয়ে আছে সেই থেকে। কখন বুঝি ঘুলিয়ে ওঠে। কিন্তু তার বদলে ক'মাসের এই শান্ত প্রতীক্ষা আর তার পর এই নতি স্বীকার।

এতটা আশা করে নি নরেন চৌধুরী। আশা করে নি বলেই আবেদনও যথাস্থানে পৌছুল।

সময় অনেক ভোলায়। কোন রকম বাধা না পেয়ে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সেই রূঢ়তা গেছে। তা ছাড়া মেজাজও অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা আজকাল। জবাব দিল, কিন্তু আমি আর কি করতে পারি বলো ?

নরেন বলল, কি বলতে চায় শুনতে বাধা কি। গোড়ার দিকে লোকটা উপকারই করেছিল। এ ব্যাপারে শাস্তিও যথেষ্ট হয়েছে—এর পর কিছু করা সম্ভব হলে করবে, নয়তো সেটাই বুঝিয়ে বলে দেবে।···কার ভিতরে কি আছে বাইরে থেকে বোঝা শক্ত, দেখই না কি বলে।

বাদল গাঙ্গুলি আপত্তি করে নি আর। দিন স্থির করে নরেন রণবীর ঘোষকে জানিয়ে দিল।

শুনে মনে মনে আর একদফা কটূক্তি বর্ষণ করল রণবীর ঘোষ নিজের উদ্দেশে। স্থূল দম্ভের বশে মিথ্যেই এই ক'টা মাস এভাবে নষ্ট। যেখানে মাটি তেতে আছে সেখানে জল না ঢেলে ছুটল কি না ঠাণ্ডা হেড অফিসকে আরো ঠাণ্ডা করতে।

দিনে দিনে খুশির মাত্রা বাড়ছে নরেন চৌধুরীর। নিজেরই ভিতরে কোথায় যেন অনেকদিন ধরে একটা খুশির আলো জ্বেলে বসে আছে সে। মনের আনাচে কানাচে সর্বত্র খুশির ঝলক। বাদে শুধু সেই খুশি প্রদীপের নিচটুকু। সেখানে কি যেন এক আলো-আঁধারি সংশয়।

কিন্তু মানুষটাই ভিন্ন ধাতুতে গড়া। ভাবনাশূন্য উচ্ছলতায় ভরপুর। যেদিকে তাকালে সংশয় সেদিকে তাকিও না। ঠিক সময়ে ঠিক লগ্নটির প্রতীক্ষা করো শুধু।

গোড়ায় গোড়ায় কি মড়াই ভালো লেগেছিল এত? কাজের হাওয়ায় প্রজাপতির মতো এমন পাখা মেলেছে মন? কি জানি। কিন্তু এখন ভালো লাগার মাত্রাটা প্রায় দুর্বহ হয়ে ওঠে এক-একদিন। মড়াইয়ের ওধারে ধূসর পাহাড়ের কোল ঘেঁষে যখন সূর্য ওঠে তখন থেকে শুরু হয় ভালো লাগা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মড়াইয়ের জল বাঁধার কর্মস্রোতে মিশে থাকে সেই ভর-ভরতি ভালো লাগার উদ্দীপনা। বিকেলে যখন গলানো সূর্যের রঙ আটকে থাকে পাহাড়ী মেঘের ফাটলে ফাটলে, ওর ভালো লাগার সঙ্গে তখনকার সেই রঙটাও ভারি মেলে যেন। তার পরে ভালো লাগে মড়াইয়ের আকাশ আর মড়াইয়ের বাতাস আর মড়াইয়ের সমাহিত পাহাড় আর মড়াইয়ের তমস্বিনী রাত্রি।

যে লগ্নের প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষা, তার আভাস এখন মনোগোচর খানিকটা। অন্তত সেই রকমই ধারণা। চোখের সামনে এক মেয়ের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে একটুখানি। করছেও। প্রথম উপলব্ধি করেছে পাগল সর্দারের বাদনা উৎসবের নেমন্তন্ন রাখতে গিয়ে। তার পর ফেরার পথে পাহাড়ের ওপর সেই পাথরটায় বসে। তার পর অনেকদিন। চেতনার আলোয় হঠাৎ থমকে

যাওয়ার মতো সেই পরিবর্তন। তার পর থেকে একটু যেন ব্যবধান বাড়ছে, একটু যেন আড়ালে রাখছে, একটু যেন আগলে রাখছে। নরেন বোঝে। বুঝেও না বোঝার ভান করে। নিজেকে দেখছে দেখুক। ওই দেখাটাই লগ্নের সূচনা।

কি ব্যাপার! দিক্‌বিদিক ভুলে অমন হন্ হন্ করে চলেছেন কোথায়?

সামনের বড পাথরটার আড়ালে ঝরনা একটা শুকনো গাছের ডাল দিয়ে পাহাড়েব দেয়াল থেকে পাহাড়ী ফুল চয়নের চেষ্টা করছিল। পাথরটার পাশ কাটিয়ে নরেন আর তাকায় নি বলেই দেখতে পায় নি।

ঝরনা হেসে উঠল খিলখিল করে। হাতের শুকনো ডাল ফেলে এগিয়ে এলো। সোনালি ফ্রেমের পুরু লেন্সের ওধারে দুই সাদাটে চোখে কৌতুক উপচে তুলে বলল, দিলাম তো বাধা? চলেছেন কোথায় এভাবে?

ঝরনার হাসি আর সপ্রগল্‌ভ কৌতুক নরেন চৌধুরীর ভালো লাগে নি প্রথম থেকেই। অনেক দিন দেখা হয়েছে, অনেক দিন হালকা আলাপ করেছে। ঝরনা কথা বলেছে অনর্গল আর হেসেছে অজস্র। কিন্তু নরেনের মনে হয়েছে মেয়েটা কোথায় যেন ঠিক সুস্থ নয় খুব। সেই অসুস্থতা ক্ষয় করার চেষ্টা তার এই হাসিখুশিতে আর চলনে বলনে। সেটা স্বতোৎসারিত নয় বলেই খানিক বাদে উজাড় করা শূন্যপাত্রের মতই রিক্ত দেখায় ওকে।

জবাব এড়িয়ে নরেন ঠাট্টা করল, পাথরের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে ফুল চুরি করছেন, দেখব কি করে?

হায় রে কপাল! ঝরনা বড়সড় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল একটা, যান কোথায় যাচ্ছেন, এর পর এত বড় রাস্তাটাই হয়তো গা-ঢাকা দিয়েছে মনে হবে।

যা বললে খুশি হবে জানে, এর পর তাই বলল নরেন।—আপনি আছেন, এতটা নাও মনে হতে পারে।

ঝরঝরিয়ে হেসে উঠল ঝরনা। নরেন জানতো হাসবে। এমনি হাসতে হাসতে হঠাৎ এক সময় হাসি যেন ফুরিয়ে যাবে মেয়েটার। পুরু লেন্সের ভিতর দিয়ে দেউলে হাসির আভায় তবু চিকচিক করবে চোখের কোণ দুটো। সচকিত হয়ে সোজা প্রস্থান করবে তার পর।

হাসির মধ্যেই ঝরনা ভেবে নিল বোধ হয় কিছু। জিজ্ঞাসা করল, সত্যিই যাচ্ছেন কোথায়?

অবনীবাবুর কাছে। নরেন গম্ভীর মুখেই জবাব দিল।

ঝরনা বলল, তাহলে অ্যাবাউট-টার্ন করুন, মেন কোয়ার্টারস্-এর রাস্তা ধরে আবার নাক বরাবর হেঁটে যান সোজা—আমি গেস্ট হাউসের দিকে দেখে

এসেছি তাঁকে।

নরেন বেকায়দায় পড়ে গেল। উৎফুল্ল মুখে ঝরনা বলল, সাধে বলে কেষ্ট-ঠাকুর ছাড়া সবাই মেয়ে, যাচ্ছেন তো মড়াইকন্যা দর্শনে—বেচারী অবনীবাবুকে নিয়ে আবার টানাটানি কেন? যান, আর আটকাবো না আপনাকে।

জবাবে নরেনও গোটাকতক টিপ্পনী কাটতে পারত। কিন্তু পাল্টা রসিকতার আঁচ পেলেই চকচকিয়ে উঠবে আবার। তাছাড়া অবনীবাবুর বাড়ি না থাকার প্রসঙ্গেও গোপন দুর্বলতায় একটু ঘা পড়েছে। জেনারেল কোয়ার্টারের দিকে ওর পা বাড়ানোর সময়ের সঙ্গে অবনীবাবুর বাড়ি থাকার সময়টা প্রায়ই মিলছে না আজকাল। মিলছে কি মিলছে না আগে একবারও মনে হত না। এখন হয়।

আমন্ত্রণ জানালো, আপনারই বা এমন কি কাজ, চলুন না একসঙ্গে যাই গল্প করতে করতে।

খুব আগ্রহ ঝরনার। কিচ্ছু কাজ নেই আমার, কিন্তু সত্যি বলছেন? আসব সঙ্গে? চলুন তাহলে, সান্ত্বনাকে একদিন বলেও ছিলাম যাব। সানন্দে কয়েক পা এগিয়েই থেমে গেল আবার। বলল, থাক গে, মিছিমিছি, আপনি যান—

যেভাবে বলল, সাদা অর্থ যাবার ইচ্ছে ষোল আনা, কিন্তু উপর-পড়া হয়ে গিয়ে কারো আনন্দবিনোদনে আবার ব্যাঘাত ঘটাই কেন। নরেন বিব্রত এবং বিরক্ত হল মনে মনে। আচ্ছা ছেলেমানুষ তো আপনি! যাবেন তো চলুন—

উচ্ছল হেসে ঝরনা বলে উঠল, আমায় কেউ ছেলেমানুষ বললেই মা তাকে সন্দেশ না খাইয়ে ছাড়ে না। উৎফুল্ল নিঃশ্বাস ফেলল একটা, বলছেন যখন যাই চলুন।

জেনারেল কোয়ার্টার্সএর রাস্তা ধরে পাশাপাশি চলল তারা। ছোট মড়াইয়ে নিতান্ত ঘরবন্দী হয়ে না থাকলে সকলেই সকলের হাঁড়ির খবর রাখে। অন্তত এই মা-মেয়েকে চিনতে বাকি নেই কারো। ভিতরে ভিতরে অবিরাম একটা টাগ-অব-ওয়ার চলছে যেন মা-মেয়েতে। মা চান টেনে রাখতে, মেয়ে চায় ছিটকে বেরিয়ে আসতে। মায়ের টেনে রাখাটাও যেমন বিসদৃশ, বিপরীত ঝোঁকে মেয়ের বেরিয়ে আসার সপ্রগল্‌ভ আতিশয্যও তেমনি অশোভন মনে হয় অনেকের চোখেই। চলতে চলতে নরেন জিজ্ঞাসা করল, আপনি তাহলে এ বছরটা ড্রপ করছেন?

ড্রপ করছি মানে?

এ বছর এম. এ. পরীক্ষা দিচ্ছেন না।

ও, তাই বলুন। কি করে দেব, শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন

দেখছেন না? শরীর আগে না পরীক্ষা আগে?—হাসতে লাগল, মায়ের কাছে শোনেন নি এসব কথা?

বেগতিক দেখে নরেন চুপ। শুধু পরিহাস নয়, পুঞ্জীভূত খানিকটা ক্ষোভের মুক্তি। সব জেনেও বিস্মিত হ'ল মনে মনে। ব্যাধি মায়ের না মেয়ের!

অবনীবাবুর বাড়িতে পা দিয়েই আরো যেন বোবা হয়ে গেল সে। বাইরের ঘরে বসে অবনীবাবু পড়ছেন কি। নীরব বিস্ময়ে নরেন তাকালো ঝরনার দিকে। চশমার ওধার থেকে চাপা হাসি উপচে পড়ছে।

অবনীবাবু তাড়াতাড়ি উঠে এলেন। ঝরনা বলল, আমাকে আপনি চেনেন না বোধ হয়, তবু আপনার বাড়ি চড়াও করেছি, আপনার মেয়ে চেনে অবশ্য—

আমিও চিনি, অবনীবাবু ব্যস্ত হয়ে ডাকলেন, ওরে সান্ত্বনা, দেখে যা কে এসেছেন—

একটু আগে ছোকরা-চাকর সুন্দরীকে নিয়ে ফিরেছে। সান্ত্বনা তার তত্ত্বাবধান করছিল। ডাক শুনে তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে যেমন ছিল তেমনি বেরিয়ে এলো।

অতি অন্তরঙ্গ জনের মতো ঝরনা একেবারে জড়িয়ে ধরল তাকে।—কেমন? ভাবো নি তো? বলেছিলাম না আসব—এসে গেলাম। এখন খুশি হয়েছ কি হও নি তুমিই জানো।

বাবার সামনে নরেনবাবুর সামনে এই আচম্‌কা উচ্ছ্বাসে সান্ত্বনা হকচকিয়ে গেল প্রায়। যে ভাবে জড়িয়ে ধরেছে, ছাড়ানো শক্ত। ভিতরে এনে দাওয়ায় মাদুর পেতে বসালো তাকে। নিজেও বসল। ভাবে নি তো বটেই। খুশি হয়েছে কি হয় নি তাও জানে না!

ঝরনা দু'চার মুহূর্ত নীরবে নিরীক্ষণ করল তাকে। কি ক'চ্ছিলে এসময় বাড়ি বসে?

তার চোখে চোখ রেখেই হালকা হেসে সান্ত্বনা জবাব দিল, গোয়ালঘরে ছিলাম।

গোয়ালঘর! চশমার ওধারে দুই চোখ বড় বড় দেখালো ঝরনার। যেখানে গোরু থাকে? তোমার আছে? সাগ্রহে একেবারে উঠে দাঁড়াল সে, চলো তো দেখি!

এবারে বিস্ময়ের পালা সান্ত্বনার। হাত ধরেই টেনে আবার বসালো তাকে। আচ্ছা দেখবেন'খন পরে, বসুন। আসার সঙ্গে সঙ্গে ওখানে আপনাকে নিয়ে ঢোকালে বাবার কাছে বকুনি খেয়ে মরতে হবে।

আগ্রহটুকু এভাবে অগ্রাহ্য হতে ঝরনা বড় নিঃশ্বাস ফেলল একটা। বাবাকে বুঝি ভয় করো খুব ?

সান্ত্বনা হেসে মাথা নাড়ল, খু-উ-ব। পাশের ঘরের দিকে তাকালো একবার। কানে গেলে দু'জনেই হেসে উঠবে।

চশমার ওধারে ঝরনার চোখে হাসির ছটা কমে আসছে। দেখছে চেয়ে চেয়ে।···সেই কবে দেখা হয়েছিল তোমার সঙ্গে, আর আজ। সেই যে সাওতালদের কি উৎসব দেখতে গিয়েছিলে তোমরা—বনের ধারে নদীর পারে দেখা হ'ল মনে নেই ?

সান্ত্বনা জবাব দিল না। মনে আছে। আর তার পরেও ঝরনা ওকে না দেখুক, ও দেখেছে। রণবীর ঘোষের জিপে চড়ে হাওয়া খেতে দেখেছে আরো অনেকবার, ভুতুবাবুর দোকানের কোণে তেমনি ঘেঁষাঘেঁষি বসে গল্পগুজব করতে দেখেছে কলকাতার সেই প্রাইভেট কলেজের মাস্টারের সঙ্গে—ওর মা যাকে বোকা ভাবে, অথচ বোকা নয়। ঝরনার মতে আসলে ভালো বলেই বোকা দেখায় যাকে।

থেকে থেকে ঝরনা তেমনি নিরীক্ষণ করছে তাকে। কিছু একটা বিশ্লেষণ করার মতেই।—সেই তখন যা দেখেছিলাম তার থেকে আরো ঢের ঢের সুন্দর লাগছে এখন তোমাকে! অস্ফুট হাস্যে ঝরনা একেবারে গায়ের কাছে ঘেঁষে বসল তার।

হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না সান্ত্বনা। দিনকতক আগে চাঁদমণিও এই কথাই বলেছিল। কিন্তু সেদিন অন্তত তার চোখে নারীসুলভ প্রশংসাই ছিল। কিন্তু এ যেন ঠিক তা নয়! খানিকটা যেন পুরুষ-চোখে যাচাইয়ের দৃষ্টি। বিশ্লেষণ করে দেখা। সরে বসতে পারলে একটু সরে বসত সান্ত্বনা।

ঝরনা কথা শুরু করল আবার। নানা কথা। অবান্তর কথা। কতদিন ভেবেছে আসবে, কি রকম বিচ্ছিরি লাগে এক এক সময়, কি করে সময় কাটায় সকাল দুপুর বিকেল রাত্তির—মায়ের কত ঝক্কি তার জন্য, ইত্যাদি।

এক বর্ণও শুনছে না সান্ত্বনা। এই ফাঁকে দেখে নিচ্ছে সেও। সঙ্গোপনে যা দেখতে চাইছে। চাঁদমণির মুখে যা দেখেছিল। যে পরুষ-নির্যাতন দেখেছিল। এরকম কৌতূহল নিজের কাছেই বিড়ম্বনা। লজ্জাকর। তবু কৌতূহল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। চাঁদমণি হতচ্ছাড়ীটা প্রসাধনপটু নয় এমন।

হাঁ করে দেখছ কি ?

নড়েচড়ে বসে সান্ত্বনা তেমনি জবাব দিল, দেখছি কোথায়, শুনছি তো—আপনি এ সময় এলেন কোত্থেকে ?

জবাব না দিয়ে ঝরনা হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁক দিল, নরেনবাবু, ও নরেনবাবু!

নরেন এসে দাঁড়াতে বলল, ওখানে ক'চ্ছেন কি, এখানে বসুন। সরে বসে মাদুরে জায়গা করে দিল।—সান্ত্বনা জিজ্ঞাসা করছে এসময় কোত্থেকে এলাম, অর্থাৎ আপনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটল কি করে। বলব নাকি?

সান্ত্বনা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল তার দিকে। মাদুরে যোগাসন হয়ে নরেন হালকা জবাব দিতে যাচ্ছিল কি। কিন্তু তার আগেই আবার এক ঝলক হেসে ঝরনা বলল, জানো, নিয়ে আসতে কি চায় আমাকে, নাছোড়বান্দা হয়ে ধরে পড়ে তবে এসেছি।

আবার সেই চোখে মুখে সাদাটে উচ্ছলতা। নরেন বলল, এ রকম সত্যবাদিনীর দেখা পেলে যুধিষ্ঠির মহারাজ হয়তো একেবারে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে তুলতেন।

মুখে বিরস ছায়া ফেলে ঝরনা তাকালো তার দিকে। বলল, কলকাতায় দাদার বাড়ির চাকরটার নাম যে যুধিষ্ঠির!

সান্ত্বনা সুদ্ধ এবারে হাসল অনেকক্ষণ ধরে। সেই প্রথম দিন তার মায়ের সঙ্গে দেখে ভালো লেগেছিল। আর এই এখন লাগল। মাঝখানের যত কিছু সব মুছে গেলে আরো ভালো লাগত।

আতিথেয়তার কথাও স্মরণ হ'ল এতক্ষণে। ওঠার উপক্রম করতে ঝরনা বাধা দিল, ও কি, যাচ্ছ কোথায়?

আপনাকে চা করে দিই একটু।

বোসো! ধমকে উঠল প্রায়। তার পরেই মনে পড়ল বোধ হয় কিছু। বলল, চা খেতে যাব কেন, তোমার রান্নার যা প্রশংসা শুনি, ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হব একদিন, দেখো।

ঈষৎ বিস্ময়ে সান্ত্বনা নরেনের দিকে তাকালো একবার। কিন্তু নরেনও যথার্থই কোন দিন ওকে বলে নি কিছু। সে-ই জিজ্ঞাসা করল, প্রশংসাটা কার কাছে শুনলেন?

লোকের অভাব! এই মড়াইসুদ্ধ লোক তো ওর ভক্ত, মেয়েটা যাদু জানে—! যাদু জানে কিনা ঝরনা সেটাই যেন নিরীক্ষণ করে দেখল একটু। পরে বলল, এর মধ্যে সেরা ভক্ত দুজন।

নরেন জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে রইল। সান্ত্বনা আশঙ্কায় দুরু দুরু।

ঝরনা বলল, একজন ভুতুবাবু, আর একজন নিধুরাম।

নরেন হেসে উঠল। সান্ত্বনাও হালকা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। ঝরনা বলে গেল, ভুতুবাবু মা-লক্ষ্মী বলতে অজ্ঞান, নতুন কোন মেয়ে চা খেতে গেলে আগে মা-লক্ষ্মীর পাঁচালি শুনতে হবে তবে চা পাবে। আর ওদিকে নিধু বলে, এমন রান্নার রান্না, খেয়ে তার গুরুগম্ভীর বাবু সুদ্ধু কাবু।

হাসিভরা দুই চোখ আলতো করে নরেনের মুখেব ওপর বুলিযে নিল একপ্রস্থ। কিন্তু নরেন খেয়াল কবে নি। নিজের অগোচরে সান্ত্বনার সঙ্গেই দৃষ্টি বিনিময় ঘটল তাব। চকিতে অন্যদিকে মুখ ফেরালো সান্ত্বনা। বিরক্ত এবং আরক্ত।

ওদিক থেকে অবনীবাবু এসে দাঁড়ালেন সামনে। ঝরনা বলল, কেমন হাট বসিয়ে দিয়েছি আমরা দেখুন। তার পরেই সোজা উঠে দাঁড়াল একেবারে।—আপনার সঙ্গে আলাপই হ'ল না, আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন চলুন—গল্প করতে করতে যাব।

বেশ তো, বেশ তো।

বেশ তো না, এখুনি যাব, রাত হয়ে গেল।

তাড়া খেয়ে অবনীবাবু জামা বদলাবার জন্য ঘরে গেলেন আবার। ঝরনার দু চোখ যেন খলখলিয়ে হেসে উঠল নরেনের মুখের ওপর। তার অর্থ শুধু প্রাঞ্জল নয়, অস্বস্তিকরও।

সান্ত্বনাও লক্ষ্য করল সেটুকু। না করলে অস্বাভাবিক লাগত না কিছু। করল বলেই বাবাকে এভাবে টেনে নিয়ে যাওয়ার পিছনে স্থূল রসিকতার আভাস পেল। এতক্ষণের ভালো লাগাটুকুর ওপর যেন কালির ছিটে পড়ল একপ্রস্থ। বিরক্তিতে মুখ লাল হয়ে উঠল সান্ত্বনার।

অবনীবাবুকে নিয়ে ঝরনা চলে গেল। আর যাবার আগে ওদের দুজনার মাঝে বেশ খানিকটা অস্বস্তি ছড়িয়ে দিয়ে গেল। সেটা কাটানোর তাগিদে নরেনের পকেট থেকে সিগারেট বেরুলো, দিয়াশলাই বেরুলো, হাতীর দাঁতের কানকাঠি বেরুলো, নাকমুখ দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া বেরুলো, আর সব শেষে কর্ণ-পটহ তোয়াজ-সুলভ গলা দিয়ে সেই পেটেন্ট শব্দ বার হ'ল গোটাকতক।

সান্ত্বনা চেয়েছিল দরজার দিকে। যে দরজা দিয়ে তার বাবা আর ঝরনা বেরিয়ে গেল। মুখ না ফিরিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে বলল, অদ্ভুত!

আমি? না, ওই যে গেল? নরেনের মুখে উৎকণ্ঠার কারুকার্য।

সান্ত্বনা হেসে ফেলে তাকাল তার দিকে।—দুজনেই, নইলে ও আপনার সঙ্গে এসে জুটল কি করে?

বরাত। দীর্ঘনিঃশ্বাস।

মেয়েটার মাথায় ছিট আছে।

তা আছে। নরেন সায় দিল, ও এক ধরনের রোগ—বিষম রোগ।

শোনামাত্র আবার অন্যদিকে চোখ ফেরাল সান্ত্বনা। লাল হয়ে উঠছে, নিজেই বুঝছে।

নরেন অবাক। ঠিক তামাশা করে বলে নি। যেটুকু বলেছে তাও সুস্পষ্ট নয় খুব। কিন্তু ঝরনার রোগের স্বরূপ সান্ত্বনাও যে যথার্থই উপলব্ধি করে বসে আছে, একবারও ভাবে নি।

মনে মনে কি জানি কেন আবার সেই অকারণ খুশির স্পর্শ লাগল। কিন্তু আর মনস্তত্ত্ব নিয়ে ঘাঁটাঘুঁটির দিকে এগোলো না। ঝরনা-প্রসঙ্গ সরাসরি ধামাচাপা দিল।—যেতে দাও ওসব, সুখবর ছিল, মেয়েটার পাল্লায় পড়ে তোমার বাবাকে বলা হ'ল না।

জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালো সান্ত্বনা।

চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে ঘোষ-চাকলাদারের এবারে একটা ফয়সালা হতে পারে বোধ হয়, ব্যবস্থা করে এলাম।

কি ব্যবস্থা? ঠাণ্ডা প্রশ্ন।

রণবীর ঘোষের আবেদন এবং বাদল গাঙ্গুলির কাছে সুপারিশের বৃত্তান্ত জানাল।

অকস্মাৎ দপ করে জ্বলে উঠল যেন একমুঠো নিরুত্তাপ ছাই।—কেন, কেন আপনি সর্দারি করে এ ব্যবস্থা করতে গেলেন? কে আপনাকে করতে বলেছিল? ডেকে দুটো মিষ্টি কথা বলল, আর গলে জল হয়ে অমনি ছুটলেন সুপারিশ করতে!

নরেন হতভম্ব। এমন আর দেখে নি।—কি হ'ল?

উত্তেজনায় অধর দংশন করে রইল সান্ত্বনা। নরেনের বিস্ময়ের শেষ নেই। কি ব্যাপার? পাছে কিছু গোলমাল হয়, সেই জন্যেই তো—

মেজাজ চড়লো আরো।—ওঃ, একটা লোক এত বড় কাজের মধ্যে গোলমাল করে তো একেবারে উল্টে দেবে সব—সেই ভয়েই গেলেন আপনারা। আর ওদিকে বুক ফুলিয়ে যা খুশি করে বেড়াবে সে। কত বড় পাজী ও লোকটা জানেন? পাগল সর্দারের ওই মেয়েটাকে পর্যন্ত একেবারে—

রাগে ক্ষোভে লজ্জায় শেষ করতে পারল না। অন্যদিকে ঘাড় গোঁজ করে বসে রইল।

বিহ্বল বিস্ময়ে নরেনের মুখে কথা নেই আর। মড়াইয়ের বুক থেকে এক ভরাপ্রাণ কালো মেয়ের অন্তর্ধান হঠাৎ একটা স্থূল রহস্যের পরদা ঠেলে একেবারে চোখের সামনে তীব্র তীক্ষ্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

শুধু তাই নয়। সান্ত্বনা জানল কি করে? সর্দার বলেছে? মন বলছে, না। ওদের বলার রীতি এরকম নয়। বললে সরাসরি রণবীর ঘোষকেই বলত। আর সে বলায় মড়াইয়ের পাঁজরে ত্রাসের কাঁপুনি জাগত।

রাগ কমে আসছে সান্ত্বনার। অস্বস্তি বাড়ছে। এ নীরবতা শুধু বিস্ময়াহত নয়। জিজ্ঞাসা-মুখরও। কিন্তু মানুষটার বিবেচনার প্রশংসা না করে পারল না। আভাসেও কোন প্রশ্নের দ্বারা বিব্রত করল না ওকে। বিড়ম্বনাটুকু উপলব্ধি করেই যেন উঠে চলে গেল একসময়।

রাগ গেছে। উত্তেজনা কমেছে। পুরুষ-সন্নিধান জনিত সঙ্কোচও নেই। চুপচাপ খানিক বসে থেকে বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সান্ত্বনা। কিন্তু খুব আরামের নয় যেন। তলায় তলায় একটা অন্যায় বোধ জাগছে। অকারণে এত কথা বলল, এত কথা শোনালো। ভদ্রলোক যা করছে বা করতে গেছে সবটাই ভালোর জন্যে। তা ছাড়া ভিতরের এ সব ব্যাপার জানতোও না। কিন্তু রাগের মাথায় কি বলতে কি না বলে বসল!

শুধু অনুতাপ নয়। একটুখানি আশঙ্কাও। ওর কথা শুনে সব আবার নাকচ করে দেবে না তো! জানানানি হবে না তো কিছু? ড্যামের কাজে নতুন কিছু বিভ্রাট বাধবে না তো আবার? ছেলেমানুষির জন্য নিজের উপরেই মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হ'ল সান্ত্বনা। তবে গোলযোগের আশঙ্কাটা থাকল না বেশিক্ষণ। নরেনবাবু না হয়ে আর কেউ হলে ভাবত। বাদল গাঙ্গুলি হলেও নিশ্চিন্ত হতে পারত না।

স্বয়ং চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কোয়ার্টারে এক নাটকীয় প্রহসন ঘটে গেল সেদিন।

যেদিন রণবীর ঘোষ এলো নিজের হয়ে সওয়াল করতে। ভেজালের ফাটল জুড়তে।

নরেনকে সঙ্গে থাকতে বলেছিল বাদল গাঙ্গুলি। সময়মত আসে নি সে। স্মরণও করিয়ে দেয় নি কিছু। তাই প্রতিদিনের মত সকালের রাউণ্ডের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের প্রতীক্ষা করছিল। কি একটা কাজে তাঁরই আসার কথা।

নরেন চৌধুরী ভোলে নি। কিন্তু তার আগ্রহ স্তিমিত। ড্যামের স্বার্থে আপসের প্রয়াস। সে প্রয়োজন আছেই। তবু…। রণবীর ঘোষকে ভালই জানত। ভালই জানে। তবু…। একজনের ক্ষোভ আর বেদনা কখনো এমন করে স্পর্শ করে নি তাকে। তাই নিরুৎসাহ। আবার এর পর ও লোকটার সংস্রবে আসতেও বিতৃষ্ণা। যা করেছে ভালোর জন্য করেছে। ভালো ভেবে করেছে। এর পর যার দায়িত্ব সে বুঝুক।

কিন্তু মন বলছে তারও উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। বাদল গাঙ্গুলির রাগ জানে। কি থেকে কি হয় আবার ঠিক কি। তা ছাড়া নিজে-মুখে থাকতে বলেছিল ওকে। ঘড়ি দেখল। বেশ দেরি হয়ে গেছে। তবু বেরিয়ে পড়ল।

ওদিকে রণবীর ঘোষ এসেছে ঘড়ির কাঁটা ধরে। হাতে অবিকল বইয়ের আকারের বোতাম-আঁটা চকচকে কালো লেদারকেস একটা। চামড়া মোড়ানো শৌখীন বড় ডায়েরির মত। দ্বিজেন চাকলাদারকে অদূরে বসিয়ে রেখে সহাস্যে সাড়া দিল, গুড মর্নিং স্যর, ভিতরে আসব ?

আপিস সংক্রান্ত কাগজপত্র উল্টে দেখছিল বাদল গাঙ্গুলি। মুখ তুলে তাকালো। মনে পড়ল। আজই আসার কথা বটে। ঘড়ি দেখল। সম্ভবত নরেনের আসার কথা ভেবেই।

আসুন।

নমস্কার, ভালো আছেন বেশ ?

হ্যাঁ, বসুন।

রণবীর ঘোষ বসল। তেমনি হাসিখুশি, তেমনি সপ্রতিভ।—আপনি বেরুচ্ছিলেন নাকি ?

হ্যাঁ, আজই আপনি আসবেন খেয়াল ছিল না, নরেনবাবুরও আসবার কথা ছিল, আসেন নি…

দুর্ভাগ্যজনিত একটা বিরস ছায়া নামল ঘোষের মুখে। পরে হাসল অল্প একটু।—বরাত। যাক, আপনার শরণার্থী বটেই, তবু আজ আমি কিন্তু কোন ব্যবসার তাগিদে আসি নি আপনার কাছে।

বাদল গাঙ্গুলি নীরব, জিজ্ঞাসু।

কিভাবে ব্যক্ত করবে মনের কথাটা রণবীর ঘোষ ঠিক করে উঠতে পারছে না যেন। স্বীকৃতির বাসনার সঙ্গে অনভ্যাসজনিত সঙ্কোচ মিশলে যেমন হয়। লাজ হাসি। বলল, এসেছি একরকম প্রাণের তাগিদে। বড়র আকর্ষণ ভারী

বিচিত্র ব্যাপার।

বলতে না পারলে কটু শোনাতো। বিরক্তির কারণ হ'ত। কিন্তু রণবীর ঘোষ নিপুণ কথক।

অন্য দিকে গাম্ভীর্যের ব্যতিক্রম ঘটল না খুব। শুধু বিস্ময়ের আভাস একটু। —আপনি কি বলবেন বলুন।

কত কি বলব ভেবেছিলাম, কিন্তু কি যে বলি, ইট্ ইজ্ অল্‌সো ওয়াণ্ডারফুল। মুখের ভাব নয় শুধু, গলার স্বর পর্যন্ত বদলে গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে কাচের সার্শির ভিতর দিয়ে দূরে মড়াইয়ের দিকে চেয়ে রইল ক্ষণকাল। ফিরে এলো আবার। বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল একটা। বসল চেয়ারে। হাসল একটু। —আপনি বিশ্বাস করুন মিঃ গাঙ্গুলি, কি যে হ'ল সেদিন থেকে নিজেই বুঝতে পারছি না। এত বড় এক লোকসান, তার থেকেও বড় জিনিস, এত বড় একটা দুর্নাম কাঁধে চাপলে অনেক কিছুই করবার কথা আমাদের—আর কিছু না হোক, বড় দরের একটা গোলমাল অন্তত পাকিয়ে তুলতে পারি স্বচ্ছন্দে।

হেসে চোখে চোখ রাখল, আরো মৃদু, আরো সাদাসিধে, নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল, কিন্তু মন বলছে, তার থেকে অনেক বড় পারা হবে সোজাসুজি আপনার কাছে এসে প্রাণ খুলে হার স্বীকার করা। এ লাভটুকুর কাছে ওই লোকসান কিছুই নয়।

দম্ভ নয়, প্রার্থীর দৈন্যও নয়, আহত মর্যাদার অভিব্যক্তি। চিফ্ ইঞ্জিনিয়ারের ঋজু গাম্ভীর্য তরল হয়ে এলো। এরকম সমর্পণে বিব্রত বোধ করতে লাগল প্রায়।

ঘরে নরেন চৌধুরীর পদার্পণ। বাদল গাঙ্গুলি ঘড়ির দিকে তাকালো একবার। ঘোষ দু'হাত তুলে নমস্কার জানালো। হেসে বলল, আপনি কিন্তু অনেক লেট।

ঠাণ্ডা চোখে নরেন একবার শুধু তাকালো। প্রতি-নমস্কার না, কিছু না। একটা চেয়ার টেনে শরীর ছেড়ে দিয়ে বসল। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে চেয়ারের কাঁধে মাথা রেখে পা ছড়িয়ে ধীরেসুস্থে সিগারেট ধরালো একটা। বন্ধুর দিকে না চেয়েই সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করল, বেরোতে দেরি আছে নাকি তোমার?

না। তার অমন নিস্পৃহ হাবভাব দেখে বাদল গাঙ্গুলি অবাকই হ'ল একটু। আর তেমনি বিস্মিত রণবীর ঘোষ। প্রয়োজনে এর শরণাপন্ন হয়েছিল বটে, কিন্তু তা বলে এ লোকটাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনে নি কখনো। বক্র কটাক্ষে দেখল দুই একবার। চেয়ারের কাঁধে মাথা রেখে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে, যেন ঘরে দ্বিতীয় মানুষ নেই কেউ।

আগের কথাপ্রসঙ্গে এবারে বাদল গাঙ্গুলি সদয়কণ্ঠে বলল, আপনার সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই মিঃ ঘোষ, সিমেন্টের ব্যাপারে যা করেছি বাধ্য হয়েই করেছি—কিন্তু সত্যি এরকম করে যদি ভাবতে পারেন তাহলে তো আনন্দের কথা।

উৎফুল্ল মুখে ঘোষ জবাব দিল, ভাবতে পারতুম না কখনো, এখন শিখেছি। আপনি শিখিয়েছেন।—পরিবেশ যেন তারই আয়ত্তাধীন।—ওই ভেজালের অপকাণ্ডটি যে-ই করে থাক, দায়িত্ব যখন সব আমার দায়ীও আমিই বৈকি।—আমি—আমার মত আরো পাঁচজন। এতকাল সবাই পার পেয়ে এসেছে তেমন শক্ত কৈফিয়তের তলব পড়ে নি বলে—পড়লে ব্যাঙের ছাতার মতই সব—

শেষ না করে অস্ফুট কণ্ঠে হেসে উঠল। চকিতে নরেনকে দেখে নিল আবার। তেমনি নির্বিকার মুখে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে হাল্‌কা বিনয়ে বলল আবার, যাক কাজের সময় আর আপনাকে বিরক্ত করব না···

হাতের লেদার কেস্‌টা তার দিকে বাড়িয়ে দিল, এটা দয়া করে রেখে দিন, অবসরমত খুলে দেখবেন একটু— ·

নিপুণ স্তুতিতে দুর্বাসাও ঘায়েল হয়। আরো অনেকটাই নরম হয়ে এসেছিল বাদল গাঙ্গুলি। এবারে বিস্মিত হ'ল। কেস্‌টা উল্টেপাল্টে দেখে জিজ্ঞাসা করল, এতে কি আছে?

ও বোষ্টুমি-বিস্ময় খুব চেনে ঘোষ। সঙ্কোচ বিনম্র হাসি। যেমনটি দরকার। বলল, ও কিছু নয়, আমার জবানবন্দি···।

কিন্তু এ দেখে আমি কি করব?

কিছু না, কিছু না—আপনাদের মনে দাগ ফেলতে পারে এমন কিছু নয়। শুধু আমার নিজের মনের সান্ত্বনা একটু ··নইলে আপনাদের কাছে ওর আর কি দাম ··এতবড় এক অভিজ্ঞতার মূল্য স্বীকার না করলে···যাক, সময়মত শুধু দেখে রাখবেন একটু—

তৃতীয় লোকটির বেখাপ্পা নীরবতা প্রায় অস্বাচ্ছন্দ্যের কারণ। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার উদ্যোগ করল ঘোষ।

বাদল গাঙ্গুলি, বলল, কিন্তু এখন আর এসব দেখে আমি কি করব?

অবিমিশ্র প্রশংসাভরা দুই চোখে ঘোষ যেন সিক্ত করল তাকে দু'চার মুহূর্ত।—ইউ আর রিয়েলি ওয়াণ্ডারফুল। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কিছু আপনাকে করতে হবে না। ওই সিমেন্টের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। এর

পর যেদিন আপনি বলবেন সেদিনই আপনার সামনে ওই গুদোম ভরা সিমেণ্ট আমি মড়াইয়ের জলে ঢালব। আগেই ঢালতুম, পাছে আপনার অবিশ্বাস হয় সেইজন্য অপেক্ষা করছি।—হাসল। যদিও ওতে আর ভেজাল নেই এক কণাও, তবু যে শাস্তি দেবেন, মাথা পেতে নেব।

বাদল গাঙ্গুলি বিব্রত আবারও। নরেনের দিকে চোখ ফেরাল। চোখাচোখি হ'ল বটে। কিন্তু তেমনি নিরুৎসুক সে। একটু থেমে বলল, ও সিমেণ্ট এখন যেমন আছে থাক, ভেবে দেখি।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গোটা দেহের অণুতে অণুতে আচমকা এক বিদ্যুৎ-শিহরণ। সবেগে চেয়ার ছেড়ে একেবারে দাঁড়িয়ে উঠল বাদল গাঙ্গুলি। দুই চোখে ভয়ার্ত বিভীষিকা!

কথা বলতে বলতে বইয়ের আকারের লেদার কেস্‌এর বোতাম টেনে খুলেছে। তার ভিতরে রণবীর ঘোষের জবানবন্দি।

খাতাপত্র নয় কিছু। তিন তাড়া নোট। সব একশ' টাকার।

দেহের সব রক্ত মুখে এসে জমাট বাঁধতে লাগল। নরেন চৌধুরীও বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতই উঠে বসেছে। বিস্ময়ে তারও দু চোখ বিস্ফারিত।

এত বিস্ময় খুব যেন অনুকূল মনে হচ্ছে না রণবীর ঘোষের। আনাড়ীদের রকম-সকম অস্বস্তিকর।

নির্বাক বিমূঢ় বিস্ময়ের ঘোর কাটল বাদল গাঙ্গুলির। লেদার কেস্ হাতে তাকালো নরেনের দিকে। নরেনের দু চোখও তার মুখের ওপরই সংবদ্ধ। বাদল গাঙ্গুলি ওর দিকে চেয়েই আছে। দেখছে। অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে যেন। সহসা তার এই দেখাটুকু উপলব্ধি করল নরেন চৌধুরী। আপসের সুপারিশ সে-ই করেছিল। আর এতক্ষণ তার বসে থাকাটাও ও-চোখে বিকৃত সন্দেহ জাগিয়েছে। এবার এক ঝাঁকুনি খেয়ে সচেতন হ'ল সেও।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘোষের মুখোমুখি।

সে দাঁড়ানোর মধ্যে বোধ হয় কিছু ছিল। কারণ নিজের অজ্ঞাতে ঘোসও উঠে দাঁড়াল।

হাত বাড়িয়ে নরেন বাদল গাঙ্গুলির হাত থেকে চামড়ার কেস্‌টা নিল। নোটের তাড়া ক'টা দেখল। চামড়ার কেস্ থেকে খুলে নিল সেগুলি। খুব মোলায়েম গলায় বলল, আপনার অভিজ্ঞতার মূল্য—যে অভিজ্ঞতায় টাকার ভেজালে ভেজাল সিমেণ্ট খাঁটি হয়ে যায়, কেমন?

এমন পরিস্থিতি কল্পনা করে নি রণবীর ঘোষ। এ সাক্ষাৎ-ব্যবস্থার পিছনে

একটা অর্থই জানে। একটা অর্থই জেনে অভ্যস্ত। কিন্তু খদ্দের যে এদিকে এত কাঁচা বোঝে নি। রণবীর ঘোষও না, দ্বিজেন চাকলাদারও না।

আরো মৃদু আরো মোলায়েম ব্যঙ্গের মত শোনাল নরেনের কণ্ঠস্বর। এত-কাল সবাই আপনারা পার পেয়ে এসেছেন তেমন শক্ত কৈফিয়তের তলব পড়েনি বলে, হুঁ—?

বাদল গাঙ্গুলি নির্বাক দ্রষ্টা।

ঘোষ সামলে নিয়েছে কিছুটা। পরিস্থিতি উপলব্ধির ফলে বিনয়ের মুখোশ খসেছে। নগ্ন রূঢ়তার ছাপ সেখানে।

নির্মম বিদ্রূপ-ছটায় নরেন যেন হাসছে।—কিন্তু কৈফিয়ত যারা তলব করে তাদের জাত আলাদা। আপনার এ জবানবন্দি তারা নেবে না—মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেবে এমনি করে—আর এমনি করে—আর এমনি করে!

তিনবার তিন তাড়া নোট এবং চতুর্থবার চামড়ার কেস্। দু হাতে মুখ বাঁচিয়ে ঘোষ একেবারে ঘরের বাইরে এসে পড়ল। জিপ থেকে ছুটে এলো দ্বিজেন চাকলাদার। নিধু আড়ালে ছিল। আর আড়ালে থাকা সম্ভব হ'ল না। ওদিকে আডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন কখন।

চিত্রার্পিত সকলে।

ঘোষ-চাকলাদারের জিপ চলে গেছে অনেকক্ষণ। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারকে বিদায় দেওয়া হয়েছে। নিধু আড়াল নিয়েছে আবার। ঘরের মধ্যে গুম হয়ে বসে আছে নরেন চৌধুরী।

আর বাদল গাঙ্গুলি? তার বাড়িতে, তার ঘরে, তার সামনে এরকমটা হবার কথা নয়। কিন্তু তারও সন্দেহ করার কথা নয় চৌধুরীকে। টাকা দেখে তাই তো করেছিল। আড়ে আড়ে দেখছে বাদল গাঙ্গুলি। ছেলেবেলা থেকে এর বিপরীতই দেখে এসেছে। এরকম আর দেখে নি কখনো। দেখবে ভাবেও নি।···রাগ চণ্ডাল। কিন্তু মনে হচ্ছিল, জায়গা বিশেষে সুন্দরও।

হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে নরেনের সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিল সে। সিগারেট ধরাল। কিন্তু ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারল না তবু। জানালার ভিতর দিয়ে দূরে বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছে নিস্পন্দ মূর্তির মত। দু-চার পলক দেখল। প্যাকেট থেকে আর একটা সিটারেট বার করল। পরে নিজের সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে অন্যটা হাতে নিয়ে মৃদু একটা খোঁচা দিল তাঁর কাঁধে।

এবার নরেন চৌধুরী ফিরে তাকালো। বাদল গাঙ্গুলি নীরবে অন্য সিগারে-

টটা বাড়িয়ে দিল তার দিকে। চোখে চোখ রেখে হাসতে লাগল মৃদু মৃদু।

নিঃশব্দে দৃষ্টি বিনিময়। হাত বাড়িয়ে নরেন চৌধুরী তার হাত থেকে সিগারেট নিল। স্বচ্ছ, নির্মেঘ।

ছোট মড়াইয়ে ঘটনাটা চাপা থাকল না।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার তাঁর স্ত্রী এবং অন্তরঙ্গ দু'চারজন সহকর্মীকে বললেন। মিসেস চ্যাটার্জী ফিস ফিস করলে সমমর্যাদার গিন্নীদের কাছে। বেশ খোলাখুলি ভাবেই কানাকানি শুরু হ'ল একটা। বিস্ময়-কণ্টকিত নিধুরাম সেদিনই দুপুরে সবিস্তারে পল্লবিত করতে বসল দিদিমণির কাছে।···লরেনবাবুর কাণ্ড সর্বাগ্রে এখানে বলবে না তো কোথায় বলবে! এই বলে বেড়ানো স্বভাবের জন্য ইদানীং সান্ত্বনা মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না ওর ওপর। কিন্তু শুনল যা, দুই চক্ষু বিস্ফারিত। অধীর প্রতীক্ষা তার পর। কিন্তু লোকটার আর পাত্তা নেই পর পর ক'দিন। বাবার মুখেও সাদামাটা ঘটনাটাই শুনেছে শুধু। রণবীর ঘোষ ঘুষ দিতে এসেছিল আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি নরেন চৌধুরী, ইত্যাদি। এই মেজাজ ঠিক রাখতে না পারার পিছনে আরো যে কারণ, সে শুধু সান্ত্বনাই জানে। ভদ্রলোককে সেদিন ওভাবে বলার জন্য মনে মনে অনেক অনুতাপ করেছে। কিন্তু এই কাণ্ড ঘটবে কে জানত। ভাবল, বাবাকেই জিজ্ঞাসা করবে ভদ্রলোকের দেখা নেই কেন ক'দিন ধরে। কিন্তু বলি বলি করেও হ'ল না বলা। ছোকরা চাকরটাকে পাঠিয়ে খবর নেবে ভেবেছিল। তাও পেরে উঠল না।

ওর এই আগ্রহটুকুই অদৃশ্য বাধার মত।

প্রথম দেখে নিজের চোখ দুটোকেই সহসা যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না সান্ত্বনা।

রণবীর ঘোষের জিপ উপরে উঠে গেল হুস করে। একটা বড় পাথরের ছায়ায় পা ছড়িয়ে বসেছিল সান্ত্বনা।

ওকে কি দেখেছে? বোধ হয় না দেখলে নীল চশমা ঘাড় ফেরাতই। তার পাশে বসে আর একজন। বিচিত্র একজন।

হোপুন···।

চড়াই উৎরাইয়ের পথে এ এমন কিছু অভাবনীয় ব্যাপার নয়। জিপে হোক, ট্রাকে হোক হরদম নামতে উঠতে দেখা যায় ওদেরও। বিশেষ করে উপরে ওঠার সময়। জায়গা থাকলে সরাসরি চেপে বসে তারা। সঙ্কোচের বালাই নেই কোনো,

মাঝপথেও ডেকে থামায়, বাবু টুকচি তুলে লে না কেনে—

কিন্তু সান্ত্বনার চোখে রণবীর ঘোষের পাশে হোপুন···প্রায় ঝাঁকুনি লাগার মতই অপ্রত্যাশিত।

হোপুনের স্বভাব বদলানো একটা কালো পাথরের রং বদলানোর মতই। ভাবা যায় না। লোকটার সম্বন্ধে নিজের অজ্ঞাতে সান্ত্বনার তেমনি একটা ছাপ পড়েছিল মনে। কিন্তু দিনকতক আগেও কেমন একটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছিল। লক্ষ্য ঠিক নয়, উপলব্ধি করা। পর পর দু দিন।

প্রথম মডাইয়ে। সেদিন মাটি কাটছিল হোপুন। সহস্রের সঙ্গে, সহস্রের মতই। এরই মধ্যে তফাৎ কোথায়, সে শুধু সান্ত্বনাই দূরে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করেছে অনেক দিন। সেদিনও করছিল। এদিক ওদিক চেয়ে পাগল সর্দারকে না দেখে ওর কাছেই খোঁজ করতে এসেছিল তার পর।—সর্দারকে দেখছি নে, সে কাজে আসে নি?

কোদাল থেমে গিয়েছিল। মাটি কাটার ঝোঁকে আনত দেহে আস্তে আস্তে টান হয়েছিল। শ্রান্ত দেহপঞ্জর ভরাট করে বাতাস টেনেছিল হাপরের মত। তার পর জবাব না দিয়ে নিষ্পলক চেয়েছিল তার দিকে। থতমত খেয়ে সান্ত্বনা আবার জিজ্ঞাসা করেছে, সর্দার ভালো আছে তো?

এবারও মুখে জবাব দেয় নি কিছু, একটা হাত তুলে আঙুল দিয়ে দূরের এক দিকে দেখিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ ওই দিকে আছে সর্দার। কিন্তু চোখের পাতা পড়ে নি একবারও, আত্মবিস্মৃতের মত হাতটা আপনি উঠেছিল যেন।

তাড়াতাড়ি ওর কাছ থেকে দু'দশ পা সরে বেঁচেছিল সান্ত্বনা। সর্দারকে দরকার নেই কিছু। দেখে নি বলেই খোঁজ করেছিল। যেখানে আছে জানল, সেও কাছাকাছি নয়। হোপুন কাজ শুরু করেছিল আবার। কিন্তু একটু বাদেই মাটি কাটার সেই হিংস্র তন্ময়তায় ছেদ পড়তে দেখেছিল সান্ত্বনা। একাধিকবার তার পর সম্পূর্ণ। কোদাল হাতে হোপুন চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছিল ওকে। সেই প্রথম ব্যতিক্রম। সান্ত্বনা অবাক। আর কখনো এমন হয় নি। ওর নির্বিকার নিস্পৃহতায় এতটুকু ফাটল দেখে নি কখনো। প্রথম ভেবেছিল কিছু বলতে চায় বুঝি।···কিন্তু তা নয়। ওকে দেখার মধ্য দিয়ে দুই নিষ্পলক কালো চোখ যেন কোন্ দূরে সমাহিত।

ইচ্ছে হচ্ছিল সামনে এসে দাঁড়ায় আবার। জিজ্ঞাসা করে কিছু বলবে কি না। ভরসা পায় নি। এই এক কালো মানুষের প্রতি সম্ভ্রমের শেষ নেই। দিনে দিনে সেটা বেড়েছে। পাগল সর্দারকে আপনজন মনে করে। চাঁদমণির

আকর্ষণও সেই প্রথম থেকেই। সেই সুবাদে এই লোকটার সঙ্গেও একটা সহজ সংযোগ অবাঞ্ছিত ছিল না। কিন্তু ওর সান্নিধ্যে সহজ হতে পারল না কোন দিন। সেদিনও পায়ে পায়ে প্রস্থানই করেছিল।

কিন্তু ওর সেই নীরব আচরণ ভোলে নি।

দ্বিতীয়বারের ব্যতিক্রম এর কিছুদিন পরে। সুন্দরীর, অর্থাৎ সান্ত্বনার গোরুর অপরাহ্ণ-রোমন্থনের সেই নিরিবিলি পরিবেশ। ছোকরা চাকর সবে গোরু ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। সান্ত্বনাও উঠবে উঠবে করছিল। মড়াইয়ের ওধারে পাহাড়ের উপর ঠিক তেমনি একটা ধূসর মেঘের দিকে চোখ আটকে গিয়েছিল। পড়তি সূর্যের গলানো সোনায় ঠাসা জমকালো মেঘের বর্ণচ্ছটা।

বিষম চমক তার পর। বিশ তিরিশ হাত দূরে হোপুন। কাজের শেষে ঘরে চলেছিল সম্ভবত। ওকে দেখে দাঁড়িয়ে গেছে। কখন এসেছে, কখন দাঁড়িয়েছে সান্ত্বনা লক্ষ্য করে নি। এ পথেও পাহাড় পেরিয়ে গাঁয়ে যাওয়া চলে। তবু এ সাক্ষাৎ শুধুই যোগাযোগ বলে মনে হয় নি সান্ত্বনার। তাহলে আর কোনদিন অন্তত চোখে পড়ত।

…তেমনি নিশ্চল, নিষ্পলক চাউনি…তেমনি দূর বিস্মৃতির পথে উধাও।

চুপচাপ থাকা বিড়ম্বনা। অস্বাচ্ছন্দ্যের বোঝা ঠেলে সান্ত্বনা উঠে এসে জিজ্ঞাস করল, আমায় কিছু বলবে হোপুন?

হঠাৎ যেন আত্মস্থ হ'ল মানুষটা। চোখ থেকে দূরের ঘোর কেটে গেল। পাষাণ-মুখে চেতনার সাড়া জাগল। সঙ্গে সঙ্গে রূঢ় কঠোর ছাপ পড়ল একটা।

সেই চিরাচরিত নিস্পৃহতা নয়।

তার পর চলে গেল।

বিমূঢ় বিস্ময় কাটতে সময় লেগেছিল সেদিনও। পরে মনে হয়েছে, এ বিরূপতা হয়তো চাঁদমণির স্মৃতিবিজড়িত। চাঁদমণির রাগ ছিল সান্ত্বনার ওপর, ওটুকুই জানে। পরের খবর তো জানে না। জানানো সম্ভব নয়। হলে বলে দিত।

বিগত ওই দুদিনের ঘটনা মন থেকে মোছে নি। সর্দারের কথা ভাবতে গেলে একটা বোবা শূন্যতার নিপীড়ন। চাঁদমণির কথা ভাবতে গেলে বুকের ভিতরে এক নিটোল স্তব্ধতা, সে স্তব্ধতার পিছনে নারীর অপরাধ…। তাই সঙ্কোচ, তাই ভয়ও একটু।

তবু এমন নয়, যা কোন অনাগত সংশয়ের ছায়া ফেলে মনে। অথবা বিভ্রমের মুগুরে অতর্কিত ঘা বসিয়ে দেয় একটা। কিন্তু আজ দিনেদুপুরে জিপে রণবীর ঘোষের পাশে ওই জমাট থমথমে মূর্তি দেখে তাই হ'ল যেন। সহসা

স্থান কাল ভুল হয়ে গেল। বিভ্রান্তি আর কেমন যেন অস্বস্তি। নীল চশমার পাশে ওই কালো মূর্তি, নিষ্ঠুরতার পাশে কালো ত্রাসের মতই।

অতিকায় গহ্বরের পাশ থেকে ডাম্পার মাটির স্তূপ বয়ে নিয়ে ঢেলে দিয়ে আসছে যেখানে দরকার। বুলডোজার ঠেলে ঠেলে সমান করে দিচ্ছে সে মাটি আর মাটি কাটছে আর্থ-কাটার। সান্ত্বনা শুনেছিল, নতুন মডেলের বিশাল বিশাল দু'তিনটে মাটিকাটা যন্ত্র এসেছে আরো। সে নাকি এক ভয়ানক ব্যাপার!

শোনামাত্র সবুর সয় নি আর।

অনেক দূরে একদিকে চলেছে সেই মাটিকাটা যন্ত্র। ভয়ানক ব্যাপারই বটে। হিংস্র গর্জনে সেই যন্ত্রদানবের অস্ত্র-বিভীষিকা স্তরে স্তরে শুকনো কঠিন মাটি চেঁছে নিয়ে আসছে, খুলে নিয়ে আসছে অবলীলাক্রমে। মাটির বুক কুরে নিমেষের মধ্যে এক একটা গাড়ি বোঝাই করে ফেলছে। নিঃশব্দ আর্তনাদে মাটির বাঁধন আলগা হয়ে খুলে আসছে। ট্রাকের গহ্বরে মাটি পড়ছে না, ধরণী যেন আপনাকে উজাড় করে অঞ্জলি দিচ্ছে অজস্রধারে।

অদূরে এক জায়গায় বসে তন্ময় হয়ে দেখছে সান্ত্বনা। যন্ত্রমুখর, সৃষ্টিমুখর। দেখছে আর নিজের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে কোথায়। ধূ ধূ অতীতের ওধারে। এর পাশাপাশি আর এক যুগের আর এক মানুষদের সেই চেষ্টার ছবি। বুড়ী ঠাকুমার চোখের জলে সূর্য-ভেজানো টোটকা, পণ্ডিতদের মন্ত্রবাণে মেঘ জমানো, চাষী প্রতিবেশীদের যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ। সান্ত্বনা ঝাপসা দেখছে সব কিছু। চোখের কোল টলমল।

তন্ময়তায় ছেদ পড়ে গেল। অপ্রস্তুতের একশেষ। পাঁচ সাত হাত দূরে দাঁড়িয়ে চিফ ইঞ্জিনিয়ার।

কি ব্যাপার, এ ভাবে বসে?

মুখ ঘুরিয়ে নিতে হ'ল চট করে। বাহুতে চোখ রগড়ে নিল তাড়াতাড়ি। হেসে উঠে দাঁড়াল তার পর। হালকা জবাব দিল, আপনার ওই যন্ত্রগুলির কেরামতি দেখছিলাম, বাবা রে বাবা, এক একটা যেন মাটিগেলা রাক্ষস!

এদিকটায় এই যন্ত্রের কাজ দেখতে এসেছিল বাদল গাঙ্গুলিও। কিন্তু সেখানে এমন এক দৃশ্যও দেখবে ভাবে নি। তদারক সেরে ফিরে যাবে যাবে করেও না দাঁড়িয়ে পারে নি। এমন বিস্মৃতি-বন্দিনী মূর্তি আর দেখে নি। এখন আর তার চিহ্নমাত্র নেই। বরং বিপরীত এবং সচেতন মুখরতায় ভরপুর।

ক্ষণপূর্বের দৃশ্যটা মনের কোথাও জমা হয়ে থাকল তবু।

পাশাপাশি আসছে। এভাবে এই লোকের সামনে ধরা পড়বে সান্ত্বনা স্বপ্নেও ভাবে নি।

কিছু একটা রোমাঞ্চকর সঙ্কোচ এড়ানোর তাগিদ। আর কেমন এক অকারণ খুশির বিড়ম্বনা। নিরুপায়, তাই বেপরোয়া। প্রায় প্রগল্‌ভা।—ডাম্পার-গুলোকে দেখাচ্ছে যেন শুকনো ডাঙায় মস্ত এক একটা কচ্ছপ। নতুন আর্থ-কাটারের মাথায় স্টিয়ারিং হাতে মূর্তির মত বসে আছে ঐ যে টুপিমাথায় লোকটা—মুখখানা দেখলে মনে হয় জন্ম জন্ম ধরে কলের মত শুধু এই করে আসছে। ফাঁকা মড়াইয়ে সাদা ব্লকগুলোকে উঁচু থেকে বেদেদের তাঁবুর মত মনে হয় অনেক সময়। আর্থড্যামের ঐ ওদিকটায় কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলে বসা হাতীর পিঠের মত লাগে দেখতে। অনর্গল উপমা আর অনর্গল হাসি সান্ত্বনার।

সেদিন যেমন আজও তেমনি। মড়াইয়ের সর্বাধিনায়ক তো ওর কি! ও পরোয়া করে না। অন্তত দেখাতে চায় যে পরোয়া করে না। অস্বস্তিতে ঘেমে উঠছে ভিতরে ভিতরে। উঠলেই বা। বাইরে অটুট সহজ। দ্বিগুণ সহজ।

বাদল গাঙ্গুলি দেখছে। হালকা লাগছে। ভালো লাগছে। জিজ্ঞাসা করল, সেদিন আমার বাড়ি থেকে ওভাবে চলে এলে যে?

ঠিক বুঝে উঠল না। কি ভাবে চলে এলাম?

খাবার-টাবার তৈরি করে খাওয়ালে, তার পর নিজে না খেয়ে চলে এলে—নিধু দুঃখ করছিল।

হেসে উঠল সান্ত্বনা—আর নিধুর মনিব?

নিধুর মনিবও।

আবার সেই খুশির বিড়ম্বনা। ফলে আবার সেই উচ্ছলতা। বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল একটা। আহা, মরে যাই মরে যাই, নিধুর দুঃখ তার ওপর আবার নিধুর মনিবের দুঃখ—একেবারে জোড়া কুমীর-কান্না। আর এক দিন গিয়ে রেঁধে দিয়ে আসব!

হাসছে বাদল গাঙ্গুলিও। নিজের অজ্ঞাতে হাসছে। বলল, দিলে তো ভালোই, নিধুর রান্নার কথা মনে হলে গায়ে জ্বর আসে। তুমি এত ভালো রাঁধতে শিখলে কি করে!

গম্ভীর মুখে সান্ত্বনা জবাব দিল, ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে প্ল্যান করিয়ে ড্রাফট্‌সম্যান দিয়ে ছক আঁকিয়ে, ওভারসিয়ার দিয়ে সারভে করিয়ে, কন্ট্রাক্টার দিয়ে—। নিজের মুখরতায় নিজেই লজ্জা পেল।

দিনে বার-দুই অন্তত মড়াইয়ে টহল দিতে দেখা যায় চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে। নিঃশব্দে আসে কখন, নীরব পর্যবেক্ষণ করে, সকলের মধ্য দিয়েই সকলের পাশ কাটিয়ে যায়। কিন্তু আজ যারা দেখল বা দেখছে তারা তফাৎ কিছু উপলব্ধি করছে। গুমোট ছায়া পড়ে নি কোন। বিশ্লেষণী গাম্ভীর্যের দূরত্ব নেই।

মড়াইয়ের উপর থেকে দেখছে আর একজন। রণবীর ঘোষ। দিনের মধ্যে ক'বার তুর্যগতিতে তার জিপ ওঠানামা করছে ঠিক নেই। অকারণে। ক্ষোভে আর আক্রোশে। লাঞ্ছনার ক্ষত মুছে ফেলার তাড়নায়। দ্রুতগতির মাথায় ঘ্যাচ করে থেমে গেল জিপটা। এত উঁচু থেকেও মড়াইয়ের গহ্বরে চোখে পড়েছে কিছু। দুই মূর্তি। একজনের শাড়ির আভাস।

ঝুঁকে পিছনের আসন থেকে বায়নাকুলার হাতে নিল। কি কাজে লাগে এটা এখানে? এখন না হোক, আগে লাগত। মড়াইয়ে নিজের এলাকায় বসে দৃষ্টিসান্নিধ্য পেত। যখন খুশি, যার খুশি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চোখে উঠত' ওটা। বেছে বেছে নজরবন্দী করত কাউকে।

চোখ থেকে নীল চশমা নামল। বায়নাকুলার উঠল। ব্যবধান ঘুচল। দৃষ্টিবন্দী দুই মূর্তি। চিফ ইঞ্জিনিয়ার আর সান্ত্বনা।

নারী আর পুরুষ আর প্রসন্নতা।

কঠিন চোখে পলক পড়ে না। যতক্ষণ দেখা যায়। তার পর বিচ্ছিন্ন হ'ল ওরা। বায়নাকুলারের আওতা থেকে একজনকে ছাড়তে হয় এবার। অস্ফুট কটূক্তির সঙ্গে সঙ্গে পুরুষকে জাহান্নমে পাঠাল। নারী-প্রাচুর্য সামনে এগিয়ে আসছে ক্রমশ।

উঠে আসছে। কাছে আসছে। প্রায় হাতের কাছে যেন। তবু রণবীর ঘোষ জানে খুব কাছে নয়। চোখ থেকে যন্ত্রটা সরালে কাছের মোহ ভেঙে যাবে।

...থমকে দাঁড়াল...জিপটা দেখেছে এবং চিনেছে। নিরীক্ষণ করছে চোখ টান করে। চোখাচোখি হ'ল বায়নাকুলারের ভিতর দিয়ে। কয়েক মুহূর্ত। যন্ত্রটা সরালো রণবীর ঘোষ। বেশ দূর এখনো।

এর পরে কি হবে জানা আছে। ওই বাঁক পেরোলে আবার দেখা যাবে উঠে আসছে। উঠে আসবে। তারপর সরাসরি ঢুকে পড়বে ওই দোকানে। ভুতুবাবুর দোকানে।

স্থাণুর মত জিপে বসে প্রতীক্ষা করতে লাগল। মড়াইয়ের মিয়াদ ফুরিয়েছে তার। বোঝাপাড়া হয়ে গেছে দ্বিজেন চাকলাদারের সঙ্গে। এখানে তার এ চাল-চলন আর বরদাস্ত করতে রাজী নয় পার্টনার। স্পষ্ট জানিয়েছে। কলকাতায়

আড়ত নিয়ে থাকতে হবে তাকে। আর হেড অফিস থেকে এন্‌কোয়ারির ব্যবস্থা করতে হবে। মড়াইয়ে শুধু দ্বিজেন চাকলাদার থাকবে।

ঘাড় ফেরাল। দেখা যাচ্ছে। যা ভেবেছিল তাই। বিচলিত দৃষ্টি। ক্ষণিক দ্বিধা। তারপর ভুতুবাবুর দোকান।

রণবীর ঘোষের চকচকে মুখে হাসির আভাস। ভুতুবাবুর মা-লক্ষ্মী!

সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিল ভুতুবাবুকে। সেই জলের দিনে সন্ধ্যায় চিফ ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে তার সামনাসামনি পড়ছিল যখন। গোডাউন দেখতে আসার আমন্ত্রণের জবাবে মেয়েটা যা বলেছিল ভোলে নি। তবু সেদিন অবাক যত হয়েছিল, অপ্রসন্ন হয় নি তত। হালকা আভাসে জিজ্ঞাসা করেছিল ভুতুবাবুকে। কার বরাতে ঝুলছে? বাদল গাঙ্গুলি? নরেন চৌধুরী?

ভুতুবাবু এত জানে আর এটুকু জানে না। আধ হাত জিব কেটে সারা। কিন্তু সেদিনের সে মেজাজ গেছে রণবীর ঘোষের।

জিপ থেকে নামল। চলল ধীরেসুস্থে।

দোকান জমে উঠেছে ভুতুবাবুর। পর্দা দিয়ে ক্যাবিন করেছে মেয়েদের জন্য। নিটোল পর্দা নয় মোটেই, দৃষ্টি চলে অনায়াসে। তাও আবার অর্ধেক গোটানো। ভুতুবাবুর গোল মাথার বুদ্ধি গোল নয়।

মেন কোয়ার্টারস্‌এর আর একটি মেয়ের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছিল ঝরনা চ্যাটার্জী আর হাসি ছড়াচ্ছিল। আসলে হাফ-গোটানো পর্দার ওদিকে ছেলে ক'টার মুখের কারুকার্য উপভোগ করছিল। তারা চলে যেতে মুখে একটা বিষণ্ণ ক্লান্তির ছায়া পড়ছিল সবে। সান্ত্বনাকে দেখামাত্র কলকলিয়ে উঠল একেবারে। ভুতুবাবুর ফোলা গাল হাসি-টসটসে হয়ে উঠল চিরাচরিত অভ্যর্থনায়।

—আসুন মা-লক্ষ্মী আসুন, আমি ভাবছিলাম ভুতুর দোকান ভুলেই গেলেন!

ঝরনা হেসে উঠল আবার।—এদিকে, সোজা এদিকে চলে এসো মা-লক্ষ্মী!

এক বিপদ এড়াতে গিয়ে আর এক ফ্যাসাদ। কিন্তু ঝরনার অভ্যর্থনায় সাড়া দেবে কি ভুতুবাবুর কাছেই দাঁড়াবে ঠিক করার আগেই আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন ঘটল আবার। নীল চশমা হাতে দোলাতে দোলাতে রণবীর ঘোষ ভিতরে এসে দাঁড়াল।

সান্ত্বনা ঘাড় ফেরাল। দৃষ্টি বিনিময়। চিত্রার্পিত নিশ্চল কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই চকিত সাড়া জাগল। সবিনয়ে ভুতুবাবু তার আসন ছেড়ে মাটিতে অবতরণ করল। কলহাস্যে ঝরনাও এগিয়ে এলো তাড়াতাড়ি। কৌতুকছটা তার পার্শ্ববর্তিনী তৃতীয় মেয়েটির মুখেও। ঝরনা বলল, ভুতুবাবুরই ভাগ্য

আজ, মা-লক্ষ্মীর পা পড়তে না পড়তে একেবারে কুবেরের আবির্ভাব!

ভুতুবাবু বিনয়-বিগলিত। পলকের জন্য ঝরণা থমকে গেল। সান্ত্বনাকে দেখল। রণবীর ঘোষকে দেখল। অজগরের অমোঘ আকর্ষণী আওতায় অসহায় পশুর অব্যক্ত ধড়ফড়ানি দেখল। নির্মম উচ্ছলতায় সমস্ত ভিতরটা খলখলিয়ে উঠল যেন। সান্ত্বনার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল একটা, কি গো মড়াইকন্যা, একেবারে বোবা হয়ে গেলে যে! অনেকদিন আগে এই ভদ্রলোক দুঃখ করছিলেন, তুমি নাকি সুনজরে দেখো না—এসো আজ বোঝাপড়া করে ছাড়ব তোমার সঙ্গে। ভুতুবাবু, আমাদের চা দিন, আসুন মিঃ ঘোষ, ভুতুবাবুর লেডিজ ক্যাবিনেই চলে আসুন।

আহ্বান কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে সান্ত্বনার বিভ্রান্ত আচ্ছন্নতা কেটে গেল যেন। সবলে এক লোলুপ গ্রাস থেকে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। বলল, না, আমাকে এক্ষুনি বাড়ি যেতে হবে। ভুতুবাবুর দিকে এগিয়ে এলো একটু। —সর্দারের সঙ্গে দেখা হলে একবার আমাদের বাড়ি যেতে বলবেন তো, দরকার আছে।

কোনদিকে না চেয়ে বেরিয়ে গেল। ভুতুবাবুর গোল চোখে গোলমেলে বিস্ময়। রণবীর ঘোষ নিজের অজ্ঞাতে ঘাড় ফিরিয়েছে বাইরের দিকে। চাপা হাসিতে ঝলমলিয়ে উঠেছে ঝরনার সমস্ত মুখ। মানুষটাকে দেখছে না, তার ইচ্ছাটাকে দেখছে। দেখছে আর কৌতুকে উঠছে উপছে।—আসুন তাহলে, আমরাই আর একটু চা খাই, কি আর করা যাবে!

রণবীর ঘোষ সচকিত। ভুতুবাবুও। ছোকরা চাকরকে হাঁকডাক করে চায়ের অর্ডার দিল তাড়াতাড়ি।

হনহনিয়ে উপরে উঠছে সান্ত্বনা। বিকেলের মিষ্টি বাতাসে আরো বহু লোক উঠছে নামছে। কারো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। অসহিষ্ণু ক্ষোভে ভিতরে ভিতরে জ্বলছে। মেন কোয়ার্টারস্ ছাড়িয়ে জেনারাল কোয়ার্টারস্এর দিকে পা বাড়িয়ে কিছুটা সুস্থ হ'ল। বেজায় হাঁপিয়ে গেছে। বসলে হ'ত একটু। কিন্তু বাড়ি পৌঁছানোর অকারণ তাগিদে বসা হ'ল না।

পাগল সর্দারকে আসার জন্য বলে এলো ভুতুবাবুকে। কেন বলল? কে জানে কেন, শুধু কিছু একটা বলার জন্যেই বলা। সঙ্গে সঙ্গে হোপুনের কথাও মনে পড়ে। জিপে রণবীর ঘোষ আর তার পাশে সেই কালো পাথর মূর্তি। ভিতরে ভিতরে আবার জ্বলে উঠল সান্ত্বনা। খুব তো জিপে করে বসে ঘুরিস,

তোর চাঁদমণির খবর রাখিস? পাগল সর্দার এলে বলে দেবে, ওই লোকটার সঙ্গে যেন কক্ষনো না মেশে হোপুন। সেদিন জিপে ওদের দুজনকে পাশাপাশি দেখার বিস্ময় এবং অস্বস্তি ভুলতে পারে নি সান্ত্বনা।

বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মন খুশি। বাবা আর নরেনবাবুতে বসে গল্প করছে। সেই কটূক্তি শুনে গিয়েছিল ভদ্রলোক, আর এই এলো। অবনীবাবু ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললেন, কোথায় থাকিস সমস্ত দিন? নরেন সেই কখন এসেছে অফিস থেকে, ওর বোধ হয় খিদে পেয়ে গেছে, দেখ্ কি আছে।

কি আছে দেখার বদলে সান্ত্বনা নরেনকে দেখতে লাগল। খুব চেনা মানুষের মধ্যে অচেনা কিছু দেখলে যেমন করে দেখে। চোখে মুখে কৌতুকাভাস।

নরেন অল্প অল্প পা দোলাচ্ছে আর হাসছে।—খিদে পেয়েছে কিনা দেখছ নাকি?

জবাব না দিয়ে হাসিমুখে ভিতরে চলো এলো সান্ত্বনা। গুমোট কেটেছে। হালকা লাগছে।

কিছুদিন হ'ল হালকা লাগছে অবনীবাবুরও।

নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিয়েছেন তিনি। সান্ত্বনা জানে না। নরেনও কিছু আভাস পায় নি। সকলের অগোচরেই নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছেন অবনীবাবু। একলার জীবনে এক ধরনের দার্শনিক নির্লিপ্ততা এসেছে তাঁর মধ্যে। সংস্কারের বাঁধন শিথিল হয়েছে অনেক। সামাজিক ভ্রূকুটির অর্থ গেছে কমে। মেয়ে সুখে থাকবে। ভালো থাকবে। এইটেই বড় কথা আর সার কথা। নরেনই কথা পাড়বে হয়তো। সঙ্কোচে যদি না পারে, তিনিই বলবেন। এ ঘর থেকেই হাঁক দিলেন, আমি বেরুলাম, বুঝলি?

বিকেলে লম্বা একপ্রস্থ হাঁটা অভ্যাস তাঁর।

সান্ত্বনা হাতমুখ ধুয়ে দাওয়ায় এসে বসে ঠাণ্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাবার কথা কানে এলো। তিনি বেরিয়ে গেলেন টের পেল। ভাল লাগল না। খারাপও লাগল না। মনে মনে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল এ ক'দিন। নিধুর মুখে আর বাবার মুখে রণবীর ঘোষের নাকাল হওয়ার ব্যাপারটা শোনার পর থেকেই। নিধু বলেছিল, তাড়া তাড়া নোট দিয়ে অমন পিটুনি জন্মেতক দেখেনি। বাবা চিন্তিত হয়েছেন, কি ভাবে শোধ নিতে চেষ্টা করবে ওই কন্ট্রাক্টার ঠিক কি। সে চিন্তা সান্ত্বনাকেও স্পর্শ করে নি এমন নয়। কেমন মনে হয়েছে, তার জন্যই এতটা হয়েছে। হঠাৎ আবার জিপে রণবীর ঘোষের পাশে হোপুনের মূর্তি স্মরণ হতেই ভয়ের ছায়া নামল মুখে।

নরেন এসে দাঁড়াল। মোড়া টেনে দাওয়ায় বসল, যেমন বসে। সহজ ভাবেই বলল, আমার খাবার তাড়া নেই কিছু, খেয়ে এসেছি।

সান্ত্বনা সকৌতুকে তাকালো তার দিকে। বলল, নতুন নতুন লাগছে শুনতে।

যে ভাবে তাকাচ্ছ, মনে হচ্ছে নতুন নতুন লাগছে দেখতেও।

লাগছেই তো। আপনার আবার এত রাগ জানতুম না।

কোন্ প্রসঙ্গে বলছে বুঝেই নরেন হাসতে লাগল তার দিকে চেয়ে।···এ ছাড়া আমার আর যা কিছু সব জেনে ফেলেছ বোধ হয়?

হেসে ফেলল সান্ত্বনা, খুব ফট ফট করে কথা শোনাচ্ছেন যে—এ ক'দিন আসেন নি কেন?

অনেকবার স্থির করেছিল, দেখা হলে বলবে, সেদিন ওরকম বলাটা তার অন্যায় হয়েছে খুব। বলে উঠতে পারল না। কিন্তু যা বলল, নরেনের কানের ভিতর দিয়ে মরমে পৌঁছুলো বোধ হয়। নিস্পৃহ মুখে জবাব দিল, না এসে দেখছিলাম পেয়াদা পাঠাও কি না, আশা নেই দেখে শেষে চলে এলাম।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল সান্ত্বনা। সেখানেই বসল। চেষ্টা করেও হালকা কথা কিছু যোগালো না। বাইরের দিকে মুখ ফেরাতে হ'ল। ভদ্র-লোকের কথাবার্তার ধরনধারণ সুবিধের ঠেকছে না।

প্রসঙ্গ বদলে নরেনই জিজ্ঞাসা করে বসল আবার, মড়াইয়ে বাদল গাঙ্গুলির সঙ্গে খুব গল্প করছিলে দেখলাম—

হঠাৎ একেবারে থতমত খেয়ে গেল সান্ত্বনা। সচকিত বর্ণান্তর। নরেনের চোখ এড়ালো না কিছুই। চেয়েই আছে। হাসছে একটু একটু।

লঘু বিস্ময়ে সান্ত্বনা পাল্টা প্রশ্ন করল, ওমা, আপনি আবার কোত্থেকে দেখলেন?

গা-ঢাকা দিয়ে তো আর ঘুরছিলে না, সব জায়গা থেকেই দেখা গেছে···তা কি কথা হ'ল?

আবার লাল হয়ে উঠছিল সান্ত্বনা, শেষের প্রশ্নটার আশ্রয় নিয়ে বাঁচল। ছদ্ম গাম্ভীর্যে বলল, কথা হ'ল আমি খুব ভালো রাঁধি আর নিধুর রান্নার কথা মনে হলে গায়ে একেবারে জ্বর আসে। আচ্ছা কেপ্পন আপনাদের চিফ ইঞ্জিনিয়ার—এত টাকা মাইনে পায়, দেখেশুনে একজন রাঁধুনী রাখলেই হয়!

শুধু টিপ্পনী নয়। নিজে এ বিদ্যেয় পটু বলে করুণাও। নিধুর রান্নার বহর স্বচক্ষে দেখেছে।

সঙ্গে সঙ্গে নরেন ঠাট্টা করল, তা পছন্দমত রাঁধুনীর খোঁজে যদি এ বাড়ির

দিকেই চোখ দেয়, তাহলে ?

ধেৎ, আপনি যাচ্ছেতাই লোক। ভ্রূকুটি সত্ত্বেও আরক্ত হয়ে উঠল। এ কথার জবাবে ভদ্রলোক এরকম ঠাট্টাই করবে জেনেও বলা। তবু বিকেলে মড়াইয়ের অনুভূতিটুকু নিজের অজ্ঞাতে মিষ্টি আনন্দের মত যেন ভিতরে ভিতরে ছড়িয়ে আছে। সেই খুশিটুকুই প্রকাশ পেল আবারও। হাসিমুখেই জিজ্ঞাসা করল, ভদ্রোলোককে সবাই এত ভয় করে কেন বলুন তো ? ক'দিন তো কথা বলে দেখলাম, মেজাজপত্র দিব্যি ঠাণ্ডা !

নরেন চুপচাপ চেয়ে ছিল। মুচকি হেসে বলল, তোমাকে সে মেজাজ দেখাতে যাবে কেন ?

অন্য লোককে ? হালকা আগ্রহ।

অন্য লোককেও মেজাজ ঠিক দেখায় না, তবে কাজের বাইরে নিজের মনে একা থাকতে থাকতে এমন হয়েছে যে ভরসা করে কেউ বড় ঘেঁষে না কাছে।

বলার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল। একটুখানি বেদনার ছায়া পড়ল সান্ত্বনার মুখে। কিছু না ভেবেই জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, ভদ্রলোকের আপন বলতে আর কেউ কোথাও নেই, না ?

আবার হাসতে লাগল নরেন চৌধুরী। নিঃশব্দ হাসি আর সকৌতুক নিরীক্ষণ। সান্ত্বনা বিব্রত বোধ করতে লাগল কেমন। বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে নরেন জবাব দিল, আছে, তেমন কেউই আছে, তবে ভদ্রলোক সেটা এখনো ঠিক জানে না বোধ হয়।

এক ঝলক রক্ত উঠে আসছে সান্ত্বনার মুখে। সেটা টের পেয়েই জিজ্ঞাসু বিস্ময়ের ভান করতে হ'ল যথাসম্ভব। কিন্তু সেও আর কতক্ষণ। ভদ্রলোকের চোখেমুখে গা-জ্বালানো হাসি।

উঠে চট করে রান্নাঘরে চলে গেল। সেদিকে চোখ রেখে নরেন তেমনি হাসছে মৃদু মৃদু।

সান্ত্বনার সামলে নিতে সময় লাগল বেশ একটু। ওই ভাবে না তাকালে আর ওই ভাবে না হাসলে সেও রাগ দেখাতে পারত বা যাহোক কিছু বলতে পারত। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে করতেও হবে সেরকম কিছু—বা বলতে হবে। কিন্তু আয়না ছাড়াও নিজের মুখের অবস্থা অনুমান করতে পারছে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। সুন্দরীর ছোকরা চাকর উনুন ধরিয়ে রেখে গেছে। বেশ শব্দ করে কেটলি ধুয়ে চায়ের জল চড়ালো। শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে মুছতে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এলো তার পর। বিমূঢ় পরক্ষণে।

নরেন চৌধুরী চলে গেছে।

শ্লথ পায়ে যেন কোয়ার্টারস-এর দিকে চলেছে নরেন চৌধুরী। অনেকটা নিরুদ্দিষ্টের মত। অল্প অল্প হাসিটুকু মুখে লেগে আছে তেমনি।...হাসি ঠিক নয়। তবু হাসি বৈকি!

মূর্তির মত দাওয়ায় বসে আছে সান্ত্বনা। রান্নাঘরে কেটলির জল ফুটে উনুন নিবেছে, খেয়াল নেই।

—এগারো—

অন্ধকার শাল গাছের নিচে সাইকেল হাতে নিরাপদ ব্যবধানে দাঁড়িয়ে দুই চোখ বিস্ফারিত করে ভুতুবাবু দেখছে আর দবদব করে ঘামছে।

তারই দোকানের এক ঘরে টিম টিম করে আলো জ্বলছে একটা। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে খাটিয়ার ওপর বসে আছে লোকটা আর ক্রমাগত পাইপ টানছে। পাইপ নিবে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। দেশলাই জ্বেলে পাইপ ধরাচ্ছে আবার। তার আভায় চকচকে মুখ লাল দেখাচ্ছে থেকে থেকে। ভুতুবাবুর চোখ জানে, সে লালিমা সুবাসিক্ত।

ভুতুবাবু কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর দেখে চেয়ে চেয়ে। মনে হয় তারই দোকানে বাসা নিয়েছে এক মূর্তিমান বিভীষিকা। মড়াইয়ের বাতাসে গাছের পাতা মড়মড়িয়ে ওঠে। ভুতুবাবুর কানের ভিতর দিয়ে একটা অজ্ঞাত শঙ্কার স্রোত পা বেয়ে নামতে থাকে।

রাতের পর রাত কাটিয়েছে দোকানে, কখনো এমন হয় নি।

শলাই জ্বলে উঠল পাইপের মুখে। তেলতেলে লাল মুখ ঢুলু ঢুলু টুসটুসে দেখালো আবার। দোরগোড়ায় মেঝেতে দ্বিতীয় মূর্তি। অন্ধকারের মতই কালো আর থমথমে। ক্রমাগত মদ গিলছে সেও। ঘরের টিমটিমে আলোয় বাইরের দিকে বিরাট একটা ছায়া পড়েছে তার। সেই ছায়ার নড়াচড়া দেখে ভুতুবাবু বুঝতে পারে, থেকে থেকে বোতল উবুড় করে গলায় ঢালা হচ্ছে।

পর পর চারদিন...। ভুতুবাবু ভয়ে কাঠ। আরো এগারো দিন বাকি।

কোথা দিয়ে কি ঘটে গেল এখনো যেন ঠাওর করতে পারছে না। কেন রাজী হ'ল? টাকার লোভে? এক পাঁজা নোট যখন লোকটা নাড়তে লাগল তার চোখের সামনে, ভুতুবাবুর পায়ের নিচে মাটি দুলছিল। একেবারে গোল আর

স্থির হয়ে গিয়েছিল তার গোল গোল দুই চোখ। নাকের ডগায় টাকার বাতাস লেগে গোটা শরীরটাই সিড়সিড় করে উঠেছিল। তবু টাকার লোভেই শুধু রাজী হয় নি। রাজী হয়েছে ভয়ে। অজ্ঞাত ভয়ে। কি করে যেন বুঝেছিল রাজী না হলে তার দোকানের পাট বরাবরকার মত তুলতে হবে এখান থেকে। লোকটা তার নাকের ডগায় টাকা দুলিয়েছে মতামতের প্রত্যাশায় নয়। মুখ বন্ধ করার জন্য আর কৌতূহল দমন করার জন্য। টাকার দোলানিতে সেটা সম্ভব না হলে আরো উপায় আছে হাতে। সে উপায়টিও আড়ে আড়ে দেখেছে ভুতুবাবু, উপলব্ধি করেছে।

নোটের তাড়া দুলছিল রণবীর ঘোষের হাতে আর ড্যাবডেবে মড়া চোখে নির্নিমেষে চেয়েছিল হোপুন।

কেউ তারা ভয় দেখায় নি। তবু ভয় পেয়েছিল ভুতুবাবু। রণবীর ঘোষের হাতে টাকা আছে, টাকায় না হলে হোপুন আছে। একবার টাকার দিকে তাকাও। তার পরে হোপুনের দিকে। ওই ঠাণ্ডা মড়া চোখের সঙ্গে দ্বিতীয়বার আর চোখোচোখি করার সাধ হবে না। চেয়ে থাকো টাকার দিকে। নাকের ডগায় টাকার বাতাস মিষ্টি লাগবে। টাকা নাড়ার ফরফর শব্দটা মিষ্টি লাগবে কানে। বিহ্বল হাত বাড়িয়ে টাকা নাও তার পর। মড়া চোখের দিকে তাকিও না আর।

হাত বাড়িয়ে টাকাই নিয়েছে ভুতুবাবু।

কিন্তু ওই টাকাই অস্বস্তির কারণ, ভয়ের কারণ, বিভীষিকার কারণ। এত টাকা না পেলে অত ভাবত না ভুতুবাবু, অত ভয়ও পেত না। অত টাকা পেয়েছে বলেই গোলমেলে ঠেকছে সব কিছু। গোলমেলে ঠেকছে বলেই ভাবছে। আর যত ভাবছে তত ভয় বাড়ছে।

দুদিনের মধ্যে সব কিছু যেন ওলটপালট হয়ে গেল ভুতুবাবুর চোখের সামনে। অথচ ব্যাপার সামান্য। গোড়ায় গোড়ায় তো টাকা নিয়ে দু'পাঁচ জনের এক-একটা দলকে এমন ঘর ছেড়ে দিয়েছে কতবার। বিদেশে বেঘোরে এসে পড়েছে। রাতে মাথা গোঁজার আস্তানা নেই। টাকা ফেলো, থাকো এক রাত দু' রাত। ভুতুবাবু অন্য ঘরে সব পুরে তালাবন্ধ করে সাইকেল ঠেঙিয়ে চলে যাবে চৌদ্দ মাইল দূরে নিজের বাড়ি। ভাঙা কাচের আলমারি তেলচিটে আসবাবপত্র বা ব্যবহার করা হাঁড়ি কড়াই চুরি করার জন্য অত টাকা দিয়ে দল বেঁধে বাসা করতে আসবে না কেউ ভদ্রলোক সেজে। মুখ দেখে লোক চিনতে পারে ভুতুবাবু। তাছাড়া ছুটবো চুরির ভয়ও নেই কিছু।

আদিবাসীরা আর যাই হোক, চুরি শেখে নি।

কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারটাই অসম্ভব ত্রাস সঞ্চার করেছে ভুতুবাবুর মনে। পনের দিনের জন্য তার দ্বিতীয় ঘরটি দখল করেছে রণবীর ঘোষ। দিন নয়, শুধু রাতের জন্য। মড়াই ছেড়ে চলে যাচ্ছে বরাবরকার মত। দিনকতক থাকা দরকার এখনো। পার্টনারের সঙ্গে বনছে না বলেই এই ব্যবস্থা নাকি। পনের রাত্রির জন্য হলেও যে কোনদিন চলে যেতে পারে।

কিন্তু পনের রাত্রির জন্য অত টাকা কেন? এর পনের ভাগের এক ভাগ হলেও তো ভুতুবাবু রাজী হয়ে যেত। অত টাকা কেন আর অত থমথমে গোপনতা কেন? সেই গোপনতার সঙ্গী এই মড়া-চোখো লোকটা কেন?

দোকানের শুরু থেকেই হোপুনকে চেনে ভুতুবাবু। তার আসুরিক কীর্তি-কলাপ জানে। মনে মনে সমীহ করে। কিন্তু এরকম ভয় কখনো করে নি। কিছুদিন ধরেই লোকটার কথা ভাবছিল ভুতুবাবু। বিগত ক'টা দিনের মধ্যে ওর সঙ্গে নীরব যোগাযোগ ঘটেছে বারকতক।

নিরিবিলিতে ফস ফস করে আনেকোরা নোট বার করছে দুটো তিনটে করে। মুখ ফুটে কখনো বলে নি বিশেষ কিছু। সামান্য ইঙ্গিতে ভুতুবাবু বুঝে নিয়েছে। হাড়িয়া বা পচাই নয়, খাঁটি বিলিতি চাই। হাড়িয়া পচাই তো ওদের ঘরে সর্বদাই মজুত থাকে। ওর মুখের দিকে চেয়েই ভুতুবাবু পরিষ্কার বুঝতে পারে, লেবেল-আঁটা বিলিতির স্বাদ লোকটা ভালো করেই জেনেছে।

ভুতুবাবু কি এই ব্যবসা করে নাকি? মোটে না। বিশ মাইল দূরে শহরের দোকান সকলের জন্যেই খোলা। তুমি গেলে তুমিও নিয়ে আসতে পারো। কিন্তু তোমার যাওয়ার ফুরসত নেই বা সঙ্গতি নেই। আমি এনে দিই তোমার হয়ে। বোতলের দাম নিই আর পরিশ্রমের দাম নিই। ব্যস, বিবেকের কাছে পরিষ্কার ভুতুবাবু। যার দরকার, যেমন করে হোক আনাবেই সে, ভুতুবাবু উপলক্ষ মাত্র।

কিন্তু তা বলে হোপুন! হোপুনের জন্য! ভুতুবাবু অবাক। অবশ্য এ অর্থের যোগানদার কে ভুতুবাবু অচিরে জেনেছে। কিন্তু জেনে বিস্ময় চতুর্গুণ বেড়েছে। তবু মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারে নি কিছু। জিজ্ঞাসা করবে কাকে। লোকটার বোবা চাল-চলনের ব্যতিক্রম নেই কিছু। বরং আরো শান্ত আরো নিষ্প্রাণ মনে হয়েছে। কিছু জিজ্ঞাসা করলে এই জমাট কালো পাথর মূর্তি যে ভাবে মুখের দিকে চেয়ে থাকবে সে অস্বস্তি। ভুতুবাবু জিনিস এনে দিয়ে খালাস।

তার পর সরাসরি এই ঘর ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব, নাকের ডগায় রণবীর ঘোষের টাকা দোলানো এবং সেই সঙ্গে হোপুন! ভুতুবাবু ভড়কে গেছে, ভাবনা-

চিন্তার অবকাশ বড় পায় নি।

দূরে শালগাছের নিচে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গেছে ভুতুবাবুর। যেতে পারলে বাঁচে। কিন্তু পা যেন পাথর হয়ে গেছে। নড়তেও পারছে না।

সন্ধ্যে হতে না হতে মড়াইয়ের হট্টগোল থেমে যায়। কর্মচারীরা ওপরে উঠে যায়। আদিবাসীরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘরের দিকে ছোটে হাড়িয়ার টানে। ভিনদেশি কুলীকামিনের আস্তানা এদিকে নয়। একটু রাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভুতুবাবুর দোকানের আশেপাশে জনমানবের চিহ্ন বড় থাকে না। রাত আটটা বাজতে না বাজতে দু'দশ খর বাঁধা খদ্দেরের রাতের খাবার উপরে চলে যায় শেষবারের ট্রাকে। তার পরেই রাত্রির স্তব্ধতা। ধীরেসুস্থে তখন দোকান গোটাবার ব্যবস্থা করে ভুতুবাবু। আর ছোকরা কর্মচারী দুটোর সঙ্গে গল্পগুজব করে।

কিন্তু দু দিন ধরে রাতের খাবার উপরে পাঠিয়েই ওদের বিদায় দিতে হচ্ছে। একটা ঘর তালাবন্ধ করে ফেলে দুরু দুরু প্রতীক্ষা। জিপে করে রণবীর ঘোষ আসে এক সময়। বাক্যব্যয় না করে সাইকেল নিয়ে প্রস্থান করে ভুতুবাবু। দূরে অন্ধকারে শালগাছের নিচে এসে দাঁড়ায় তার পর। খাটিয়ায় বসে পাইপ ধরায় রণবীর ঘোষ। ক্রমাগত পাইপ টানে। পাইপ নিবে যায়। দেশলাই জ্বেলে ধরায় আবার। পিচ্ছিল লালিমায় চকচকিয়ে ওঠে গোটা মুখ।

সাইকেল হাতে ভুতুবাবু দাঁড়িয়ে থাকে নিস্পন্দের মত। কতক্ষণ ঠিক নেই।

তার পরে, অনেক পরে শ্লথ গতিতে পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আসে হোপুন। খানিকটা নিটোল অন্ধকারের মত।

ভুতুবাবু জানে, অর্থ দিয়ে সহজে কেনা যায় না ওদের। কিন্তু মদের বশ প্রায় সকলেই।

সমস্ত রাত তা বলে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না এভাবে। কতদূর যেতে হবে ঠিক নেই। গোলগাল দেহ সত্ত্বেও সাইকেলে চেপে অনায়াসে চলে যাওয়া অভ্যেস আছে। কিন্তু ক'দিন ধরে শরীরটা যেন কাঠ। নড়তে-চড়তে সঙ্কট।

আরো এক রাত। একই ব্যাপার দেখল ভুতুবাবু।

সিমেন্ট ভেজাল সংক্রান্ত সমস্ত অঘটন জানে। প্রথমে ভাবল, সেই ব্যাপারেই প্রতিশোধের চক্রান্ত কিছু। কিন্তু ভুতুবাবু নির্বোধ নয়। হঠাৎ মনে হ'ল তা নয়। একেবারেই নয় তা। আর কেউ না জানুক, ভুতুবাবু তো জানে ঘর দখলের কথা। জানে যখন, ওখানে মারাত্মক কিছু সংঘটনের সম্ভাবনা নেই। তা ছাড়া প্রতিশোধ নিতে হলে এভাবে ঘর দখলের দরকারই বা কি?

তাহলে কি? তাহলে কেন?

ভুতুবাবুর গোল চোখে পলক পড়ে না প্রায়। দম বন্ধ করে ভাবতে থাকে ...তাহলে এমন কিছু, যার জন্য ঘর দরকার। এমনি নির্জনে, এমনি গোপনে। কোনো একজনের আসার প্রতীক্ষা। কেউ একজন আসবে।

...যেই হোক সে, পুরুষমানুষ নয়।

একটা রোমাঞ্চকর উত্তেজনায় হঠাৎ যেন চাঙ্গা হয়ে উঠল ভুতুবাবু। সঙ্গে সঙ্গে এক উচ্ছল চপল মেয়ের মূর্তি ভেসে উঠল চোখের সামনে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের মেয়ে ঝরনা। ভারী ভাব দেখেছে এই লোকটার সঙ্গে। যখন তখন যেখানে সেখানে ঘোরে জিপে করে। মেয়েটাকে ভালো মনে হয় নি কোন দিন। তবু খুশি ছিল মনে মনে। দোকানের খদ্দের বাড়িয়েছে অনেক। একবার এসে চা খেতে বসলে টানে টানে অনেকে আসে।

কিন্তু তা বলে এই ব্যাপার! খাপ্পা হয়ে উঠতে লাগল ভুতুবাবু। কিন্তু সেই সঙ্গে এক ধরনের নির্মম উষ্ণতাও উপলব্ধি করছে যেন। পরিবেশটা নিজের দোকানঘর না হলে...

কিন্তু সহসা যেন বিদ্যুতের ঘায়ে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেল আবার। সমস্ত চেতনাসুদ্ধ বুঝি পুড়ে ছাই হয়ে গেল এক নিমেষে। দেহের সব রক্ত জল।

—তাই যদি হবে, সঙ্গে এ হেন অনুচরটি কেন? এই চক্রান্ত কেন? মদে এই দুর্দম লোকটাকে বশীভূত করা কেন?

দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগল ভুতুবাবুর। সাইকেলটা পড়ে যাবার মত হ'ল হাত থেকে। রণবীর ঘোষের চালচলন অনেক দিন লক্ষ্য করেছে। লক্ষ্য করছে।...এবারে সব বুঝেছে ভুতুবাবু। সব জেনেছে। ঝরনা চ্যাটার্জী নয়। আর কেউ, যে স্বেচ্ছায় আসবে না। জোর করে আনা হবে। সেই জন্যে এই চক্রান্ত। সেই জন্যেই হোপুন। সেই জন্যেই তাকে মদ গেলানো।

সাইকেল নিয়ে টলতে টলতে প্রস্থান করল ভুতুবাবু।

মনে মনে এক ধার থেকে জল্পনা-কল্পনা করে চলেছে সান্ত্বনা। এক-একবার এক-একটা যুক্তির জাল বুনছে। কিন্তু খানিক বাদেই সেটা জোরালো লাগছে না তেমন। আবার ভাবছে। কোন অজুহাতেই জুতসই লাগছে না খুব।

মাসির চিঠি এসেছে। মাসতুতো বোনের বিয়ে। অবিলম্বে তাকে যেতে হবে। বিয়ের প্রায় মাসখানেক দেরি এখনো। কিন্তু মাসির জোর তাগিদ, ওর বাবা যেন পত্রপাঠ দুই-একদিনের ছুটি নিয়ে ওকে রেখে আসে। সান্ত্বনা

বেশ বুঝছে, একবার গিয়ে পড়লে দু'তিন মাসের ধাক্কা।

বেরোবার আগে অবনীবাবু চিঠি পড়ে গেছেন। ফিরে এসে যা হয় ভেবে ঠিক করবেন বলেছেন। সান্ত্বনা খুব জানে বাবাও রেখে আসতে চাইবে। কারণ মড়াইয়ে এসে পর্যন্ত আর একবারও যায় নি, তাতেই মাসি ক্ষুণ্ণ মনে মনে।

সান্ত্বনা যাবে তো নিশ্চয়ই। এত দিনে সেই মাসতুতো বোনের বিয়ে। আনন্দও কম নয়। মেয়ে দেখা নিয়ে সেই দু'দুবারের বিভ্রাট। বোনের বদলে ওকেই নিতে চাওয়া। রাগ আর সঙ্কোচে ওর সেই কেঁদে ফেলার উপক্রম। মনে পড়লে এখন কিন্তু খারাপ লাগে না খুব। বরং কেমন যেন খুশির আমেজ লাগে একটু।

সান্ত্বনার যেতে আপত্তি নেই। দু'চার দিনের জন্য গিয়ে হৈ-হুল্লোড় করে আসার আগ্রহই বরং ষোল আনা। কিন্তু ওই দু'চার দিনের জন্য। সময়-সময় কালে বাবার সঙ্গে যাবে আর বাবার সঙ্গে ফিরে আসবে। কিন্তু মাসি দূরের কথা, বাবাও রাজী হবে না তাতে। ওই জন্যেই রাগ হয় বাবার ওপর। লিখে দিলেই হয়, সান্ত্বনা না থাকলে খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে—আরো কত কি অসুবিধে। কিন্তু সে বেলায় ঠিক উল্টো বলবে। যেন ওর কোন দরকার নেই। তা ছাড়া ও না থাকলে ছোকরা চাকরটার হাতে সুন্দরীর কি হাল হবে কে জানে। আসলে মড়াই ছেড়ে যাওয়ার চিন্তাটাই প্রায় দুঃসহও।

বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ। বিস্মিত হ'ল সান্ত্বনা, এই ভরা দুপুরে আবার কে! কণ্ঠস্বর শোনা গেল সঙ্গে সঙ্গে।—মা-লক্ষ্মী আছেন নাকি, আমি ভুতু।

তাড়াতাড়ি এসে দরজা খুলে দিল সান্ত্বনা। খুশি হয়ে বলল, কি ব্যাপার, আসুন, ভিতরে আসুন—এতকাল বাদে সুন্দরীর কথা মনে পড়ল বুঝি?

ভুতুবাবুর ঘামে-ভেজা ফোলা গাল অমায়িক হাসিতে টসটসে দেখালো। কাপড়ের খুঁটে ঘাম মুছতে মুছতে কাঠের চেয়ারে বসে বড় একটা দম নিল।—আসতে তো মন চায়, সময় পাই কোথা মা-লক্ষ্মী, আপনাদের আশীর্বাদে দোকান ছেড়ে নড়তেই পারি নে মোটে। তা ভালো আছেন তো?···ক'দিন দেখি নি, দোকানেও তেমন লোকজন নেই এখন, ভাবলাম এই ফাঁকে টুক্ করে মা-লক্ষ্মীকে দেখে আসি একবার।

দু চোখ গোল করে মা-লক্ষ্মী দর্শনে মন দিল ভুতুবাবু। হাসি চেপে সান্ত্বনা পাশের ঘর থেকে একখানা হাতপাখা এনে তার হাতে দিয়ে অদূরে বসল।

ভুতুবাবুর হাতে পাখা নড়তে লাগল আর মুখে কথা ঝরতে লাগল। এলো-মেলো কথা। রাজ্যের কথা। গোরুর প্রসঙ্গ তুলল না মোটে। সান্ত্বনার মনে হ'ল

শুধু দর্শনাভিলাষে আসে নি লোকটা, কিছু দর্শনতত্ত্বালোচনার বাসনাও আছে। কথার তোড়ের মাঝখানে হঠাৎ থেমে যাচ্ছে এক একবার, দেখছে ওকে নিরীক্ষণ করে, আবার সচেতন হয়ে যে কোন একটা প্রসঙ্গ ধরে নতুন করে দর্শনপথ পাড়ি দিচ্ছে একটা। সান্ত্বনা মনে মনে অবাক হ'ল একটু। শ্রোতা পেলে ভুতুবাবু বক্তা ভালো জানে। কিন্তু সে বক্তৃতায় সব সময়েই আত্মগত বা স্বার্থগত সুর থাকে একটা। অথচ আজ প্রায় দুর্বোধ্য লাগছে। সান্ত্বনা শুনছে মন দিয়ে, সেটা বোঝাবার জন্যেই মাঝে মাঝে মুখ টিপে হাসছে একটু, আর সকৌতুকে চেয়ে আছে।

হাতপাখা হাঁটুর ওপর রেখে ভুতুবাবু অনর্গল বলে চলেছে। এবারের প্রসঙ্গ বোধ হয় আবহাওয়াগত।—বেজায় গরম পড়েছে, আবার এ সময়ে প্রচণ্ড জলও হয়ে গেল বার দুই। জল হয়ে গেল অথচ গরম কমল না' আকাশ সারাক্ষণ মেঘে থম-থম, ওদিকে বাতাসের দেখা নেই। মড়াইয়ের সমস্ত বাতাস যেন পাহাড়ের ভিতর গিয়ে সেঁদিয়েছে। মড়াইয়ের সবই উল্টোপাল্টা ব্যাপার এখন। কখন যে কি হবে কিছু ঠিক নেই। কিছু একটা হবেই এ বছরটা, আকাশের দিকে চাইলেই বোঝা যায় কিছু হবে। মা-লক্ষ্মীর কি মনে হয়, হবে না কিছু?

জবাব এড়িয়ে সান্ত্বনা হাসে তেমনি।

—মড়াইয়ের মানুষগুলোও কেমন যেন উল্টোপাল্টা রাস্তায় চলেছে এখন। মা-লক্ষ্মী কি সেটা লক্ষ্য করেছে? করে নি তো? কিন্তু ভুতু লক্ষ্য করেছে। ভুতু দোকান নিয়ে থাকে সারাক্ষণ কিন্তু চোখ এড়ায় না কিছু। বাতাস শুঁকে হালচাল বলে দিতে পারে। না, মানুষগুলোও এখন সোজা রাস্তায় চলছে না ঠিক। সবাই নয়, কেউ কেউ! শরীরের কোথাও একটা ফুসকুড়ি হলে গোটা দেহে যন্ত্রণা। তেমনি কেউ কেউ সোজা পথে না চললে সমস্ত পথই ঘুলোতে কতক্ষণ? দুনিয়ায় ভালো পড়ে আছে, মন্দও পড়ে আছে। যার সঙ্গে যার যোগ, তেমনি হবে। ওই যোগটুকু না হলে ভালো মন্দ কোনোটারই কোন দাম নেই। তীর আর ধনুক আলাদা আলাদা পড়ে থাকলে তার পাশ দিয়ে হরিণ লাফিয়ে বেড়াবে—ও দুটো একসঙ্গে হলে তবেই না কিছু ঘটতে পারে।

সান্ত্বনার হাঁফ ধরে যাচ্ছে প্রায়, আর উপমার বহরে বিস্ফারিত হয়ে উঠছে থেকে থেকে।

—ওই অত বড় মেঘটার গায়ে হাওয়া লাগছে না বলেই না গরমে সেদ্ধ! আবার তেমন হাওয়া লাগলে প্রলয় হতে কতক্ষণ? যেমন যোগ তেমনি। কথার

ঝোঁকে ভুতুবাবুকে উত্তেজিত দেখাচ্ছে প্রায়।—শুকনো মড়াইয়ে ভালো যোগা-যোগ ঘটেছিল বলেই ড্যাম হতে চলেছে। অমনি ভালো যোগাযোগ হলেই নিশ্চিন্দি। কিন্তু না হলে? উল্টো হলে? তখন? তখন সমঝে চলা ছাড়া আর উপায় কি? উল্টো যোগাযোগ কি হচ্ছে না? খুব হচ্ছে। যার সঙ্গে যার মেলার কথা নয় তার সঙ্গে সে মিলছে। যার সঙ্গে যার মেশার কথা নয় তার সঙ্গে সে মিশছে। ওই যেমন ধরুন, সাঁওতাল মাঝির ওই আধক্ষ্যাপা ছেলেটা আমাদের কনট্রাক্টার ঘোষবাবুর সঙ্গে এসে ভিড়েছে। ঘোষবাবুর পয়সায় মদ গেলে, তার জিপে করে ঘুরে বেড়ায় আর সকাল-সন্ধ্যে গুজগুজ করে। আমি নিন্দে কার কচ্ছি না মা-লক্ষ্মী, দুজনে আলাদা আলদা থাকলে নিন্দেরই বা কি ভয়েরই বা কি! কিন্তু দুজনে একসঙ্গে হয়েছে বলেই না মেয়েদের যত দুর্ভাবনা! সকাল দুপুর বিকেল রাত্তির এখন তাদের বাড়ির বাইরে পা বাড়াতে হলেই দশবার ভাবতে হবে! ঝড় এলে তার আর সময় অসময় কি, সব সময়ই সমঝে চলতে হয়। অবশ্য দশ পনেরো দিনের মধ্যেই ঘোষবাবু চলে যাচ্ছে মড়াই ছেড়ে—কিন্তু দশ পনেরো দিনই বা কি কম কথা? কখন কার বরাতে অভিশাপ লাগে ঠিক কি। পা বাড়িয়ে অভিশাপ কুড়োনোর থেকে ঘর-বন্দী হয়ে থাকাও ভালো। ভালো নয় মা-লক্ষ্মী? আপনিই বলুন—অভিশাপের ভয় কে না করে, অভিশাপের ভয়ে স্বয়ং অমন লক্ষ্মী ঠাকরুণকেই বলে সমুদ্দুরের গর্ভে আশ্রয় নিতে হয়েছিল, হুঁ :...।

মস্ত একটা দম নিল ভুতুবাবু। জোরে জোরে হাতপাখা চালালো কিছুক্ষণ। ঘামে জবজবে হয়ে গেছে থলথলে মুখ।

কার অভিশাপে বা কোন অভিশাপের ভয়ে সমুদ্রগর্ভে বন্দিনী দশা ঘটেছিল লক্ষ্মী ঠাকরুণের, ভুতুবাবু যেমন জানে, সান্ত্বনাও তেমনিই জানে প্রায়। কিন্তু সবটুকু শোনার সঙ্গে সঙ্গে নিস্পন্দ কাঠ একেবারে। কি বলতে চায় বা কি বলতে এসেছে আর অস্পষ্ট নয় একটুও। স্থান কাল ভুলে বিমূঢ়নেত্রে সান্ত্বনা চেয়ে রইল ভুতুবাবুর মুখের দিকে।

ভুতুবাবু হাসতে চেষ্টা করল এতক্ষণে।—যাক, অনেক গল্প করা গেল মা-লক্ষ্মী। মন খুলে দুটো কথা বলি তার জো আছে, দোকানের ভাবনা ভেবেই অস্থির। তা বলে গল্প করতে বসলে ভুতুর মনে আগল নেই, যা ভাববে তাই বলবে! চলি এবার মা-লক্ষ্মী, ওই ভূত দুটো এতক্ষণে কি দিয়ে কি করছে ঠিক নেই—ভালো করে গেলাস না ধুয়েই হয়তো চা দিয়ে বসেছে কাউকে...।

থপ-থপ চরণে তরতর করে পাহাড় থেকে নেমে আসছে ভুতুবাবু। এবারের

ঘাম ঝরাটা কায়িক পরিশ্রমের দরুন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সারা মুখে একটা প্রসন্নতার তৃপ্তি।

গোটা হৃৎপিণ্ডটাই হঠাৎ বুঝি স্তব্ধ হয়ে গেছে সান্ত্বনার। লজ্জা নয়, ঘৃণা নয়। অনুভূতিশূন্যতা। সেটা গেল একসময়। ভুতুবাবুর কথাগুলো তলিয়ে ভেবে দেখতে লাগল আবার। আরো স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করল। বরাবরই ভয় করত হোপুনকে। কিন্তু সে ভয়ের মধ্যে আর যাই থাক, অবিশ্বাস ছিল না। দুর্বোধ্যতার বিস্ময় ছিল, সম্ভ্রমের শুচিতা ছিল। ওই কালো মূর্তিতে কালিমার আভাসমাত্র দেখে নি কখনো। কিন্তু আজ এক মুহূর্তে সব বিশ্বাস সব সম্ভ্রম এক নগ্ন পঙ্কিলতার স্পর্শে একেবারে বিকৃত হয়ে গেল বুঝি। জিপে রণবীর ঘোষের পাশে হোপুনের সেই নিশ্চল পাষাণ মূর্তি ভেসে উঠল চোখের সামনে। শুধু ভুতুবাবু কেন, সান্ত্বনাও দেখেছে। শিউরে উঠল। মড়াইয়ের গহ্বরে বা সুন্দরীর অপরাহ্ণ রোমন্থনের পরিবেশে লোকটার সেই বিসদৃশ চাউনি, বিসদৃশ আচরণের মধ্যে আজ যেন বিভীষিকা দেখতে পেল।

কিন্তু সেদিনই আর একটা ব্যাপার ঘটে গেল। সান্ত্বনা আরো বিহ্বল, আরো বিভ্রান্ত।

বিকেলে পাগল সর্দার এসে হাজির। চাঁদমণি নিখোঁজ হবার পরে এতদিনের মধ্যে এই প্রথম পদার্পণ। ভাবনা-চিন্তা স্থগিত রেখে সান্ত্বনা এগিয়ে এলো। কিন্তু খুশির অভ্যর্থনায় মুখর হয়ে উঠতে পারল না আগের মত।

খানিক তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে সর্দারই কুশল প্রশ্ন করল. প্রথম, তু ভালো আছিস দিদিয়া ?

ভালো আছি সর্দার। তুমি ভালো তো ? এসো ভেতরে এসো।

সর্দার দাওয়ায় এসে বসল। অদূরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সান্ত্বনা। দেখছে। আরো শীর্ণ আরো শুকনো দেখাচ্ছে লোকটাকে। বার্ধক্যের স্পষ্ট ছাপ পড়েছে। কিন্তু সব থেকে আগে চোখে পড়ে একটা কর্কশ রুক্ষতা। কোটরাগত দুই চোখে খরখরে অসহিষ্ণুতা কেমন। চোখে চোখ রাখাও সহজ নয় খুব।

উবাসির বাবু ঘরে নাই ?

এখনো ফেরেন নি। তুমি কাজ থেকে এলে ?

সর্দার ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ কাজে যায় নি আজ। অন্য দিন বা অন্য সময় হলে সান্ত্বনা এই নিয়ে পাঁচ কথা জিজ্ঞাসা করত বা অনুযোগ করত। কিন্তু ভুতুবাবু ওকে বোবা করে দিয়ে গেছে একেবারে। চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল। মনে হ'ল, পাগল সর্দার এতদিন বাদে হঠাৎ এমনি আসে নি, কিছু যেন বলবে

বলবে করছে।

তু ব'স দিদিয়া, দাঁড়িন থাকলি কেনে ?

সান্ত্বনা দেয়াল ঘেঁষে বসল উবুড় হয়ে। দেয়ালে ঠেস দিল তার পর।

সর্দার আবার বলল, তুর সঙতে দুটো কথা ছেল।

দু'টো ছেড়ে আস্তে-ধীরে অনেক কথাই বলতে লাগল তার পর। অনেকটা নিজের মনে। সান্ত্বনা চুপচাপ চেয়ে আছে। শুনছে। আর অবাক হচ্ছে। ভুতুবাবুর গোড়ার দিকের বক্তৃতার মত এও প্রায় দার্শনিক গোছের শোনাচ্ছে। তবে অত ঘুরিয়ে বা রেখে ঢেকে বলতে জানে না। যা বলে মোটামুটি সোজা এবং স্পষ্ট।—কত যুগ বাদে মড়াইয়ে পুণ্যির যুগ এসেছে। সেই পুণ্যিতে শুকনো মড়াইয়ে জল হবে। কিন্তু সেই পুণ্যির সঙ্গে কিছু পাপও এসেছে। 'মুনিষের মূর্তিতে' পাপ এসেছে, পুণ্যিকে 'খুঁতো' করে দেবার মতলব আঁটছে। গোটা 'গেরামে' সে পাপের হল্‌কা লেগেছে, গোটা মড়াইয়ে সে পাপের 'ছেঁয়া' পড়েছে। কিন্তু ওরা 'ধম্ম' মানে 'শাস্ত' মানে। যত 'ভেষণ' যত 'পেচণ্ড' হোক সে পাপ, তার 'পিতিবিধেন' হবেই, 'মিত্যু' হবেই। কিন্তু যতক্ষণ না তা হচ্ছে ততক্ষণ হুঁশিয়ার থাকা দরকার। খুব দরকার। নইলে 'রনখ' হতে পারে, 'দুগগতি' হতে পারে। পাগল সর্দার সেই জন্যেই এসেছে, দিদিয়াকে সাবধান করতে এসেছে। হোপুন বলেছে। হোপুন কখনো বাজে কথা বলে না—'তু আতবিরেতে একা কুথাও যাস না দিদিয়া, দিনদুকুরেও না। ও পাপ বড় স্যায়না, চি-লোকের দিকে তার লজর।' পাপ 'নেবারণ' হয়ে গেলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, আবার সকলে হেসেখেলে বেড়াবে। পাপের 'আশ্চয়' আর ক'দিন ? 'ভগবানের কোধে' সে ছারখার হবেই হবে।

অনুচ্চ একটানা বলে গেল পাগল সর্দার। ঠাণ্ডা একটা যান্ত্রিক রেশে খানিকক্ষণ যেন আচ্ছন্ন হয়ে রইল সান্ত্বনা। সচকিত হয়ে তাকালো তার পর। হোপুন বলেছে! হোপুন সাবধান করেছে! সান্ত্বনা ঠিক শুনল কি ? ঠিক বুঝল কি ? সে যে নিজের চোখে দেখেছে তার বিসদৃশ চাউনি, বিসদৃশ আচরণ! নিজের চোখে দেখেছে তাকে জিপে রণবীর ঘোষের পাশে। তাছাড়া ভুতুবাবুও দেখেছে। অনেক কিছুই দেখেছে। পরোক্ষে ওই লোকটার ত্রাসই ভুতুবাবু বিশেষ করে ছড়িয়ে রেখে গেছে ওর মনে।

কিন্তু বলতে গিয়েও বলা হ'ল না কিছু। বিমূঢ় নেত্রে চেয়েই রইল শুধু। কেমন করে যেন উপলব্ধি করে নিল, ওই লোকটার সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহের আঁচে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে পাগল সর্দারের সমস্ত ভিতরটা। শোনামাত্র

মরীয়া হয়ে ছুটবে ভুতুবাবুর কাছে, ছুটবে হোপুনের কাছে। হোপুন দু'দুবার প্রাণ দিয়েছে ওকে, ওর সহ্য হবে কেমন করে? মেয়ে হারিয়ে আরো নিবিড় করে পেয়েছে ওকে, কেমন করে হবে সহ্য?

কিন্তু হোপুনই বা সর্দারকে বলতে গেল কেন? সর্দারের মুখ দিয়ে দিদিয়াকে সাবধান করতে গেল কেন?

ছলনা? চাতুরী? ষড়যন্ত্র?

সান্ত্বনা বোবা। পাগল সর্দার উঠলে বাঁচে এখন। নিঃসঙ্গ হতে পারলে বাঁচে। হোপুনের প্রশ্নটা বড় নয় এখানে। বড় যেটা, তার লজ্জা আর ধিক্কার অপরিসীম।

কেন এসেছিল ভুতুবাবু?

ওকে সাবধান করতে।

কেন এসেছে পাগল সর্দার?

ওকে সাবধান করতে।

দুজনের কেউই ওর কথা বলে নি বিশেষ করে। সাধারণ ভাবে বলেছে। সাধারণ ভয়ের কথাই বলেছে। সে ভয় মড়াইয়ের সব মেয়েরই। কিন্তু এরই মধ্যে বিশেষ ইঙ্গিতটুকু অপ্রচ্ছন্ন নয়। সান্ত্বনা বুঝতে পারে কাকে নিয়ে দুজনেরই ভয় এদের। অন্যথায় ভুতুবাবুর মত মানুষ দোকান ফেলে আসত না। পাগল সর্দারের বুকে আবার এক মেয়ে হারানোর ঝড় উঠত না।

চোখে চোখ পড়তেই নিজের অজ্ঞাতে হঠাৎ দু চোখ যেন ছল ছল করে উঠল সান্ত্বনার।

সর্দার চলে গেল।

সান্ত্বনা উঠল একসময়। সমস্ত দেহে বিষাক্ত জ্বালা। অশুচি স্পর্শ। দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়াল চুপচাপ। দেয়ালের ধারে আকাশ দেখা যাচ্ছে এক ফালি। আকাশ নয়, আকাশ-ঢাকা ঘন মেঘ খানিকটা। হঠাৎ মনে হ'ল, চাঁদমণির জীবনেই বীভৎস শকুনির ছায়া পড়ে নি শুধু। সমস্ত মড়াইয়ের ওপর পড়েছে। ওর ওপরেও। মন মেঘের তলা থেকে পড়ন্ত সূর্যের লাল আভা যেন ঠিকরে বেরুতে চাইছে খানিকটা জায়গা জুড়ে। দগদগে একটা ঘায়ের মত লাগছে দেখতে।

রাত্রিতে বাবার কাছে সরাসরি প্রস্তাব করল, কালই মাসির বাড়ি যাবে, তাকে রেখে আসতে হবে।

অবনীবাবু অবাক। মুখের দিকে চেয়ে একবারও মনে হ'ল না বোনের

বিয়ের আনন্দে যাবার জন্য মন নেচে উঠেছে। বললেন, বেশ তো যাবি'খন, এত তাড়া কিসের, বিয়ের তো এখনো ঢের দেরি।

না বাবা, যাব ঠিক করেছি—কালই যাব, তুমি রেখে এসো আমাকে। কতকাল যাইনে, মাসি কি ভাবছে ঠিক নেই, এর পর দেরি করলে কথা শুনতে হবে। ক'দিন আগে যাওয়াই ভালো।

মেয়ের এ ধরনের সুমতি বিস্ময়ের কারণ। মুখের দিকে চেয়ে বুঝে উঠলেন না ঠিক। কিন্তু এই এক বেলার মধ্যে ওর মনে বিশেষ কিছু একটা পরিবর্তন ঘটেছে সুস্পষ্ট। কিছু একটা যাতনা যেন চেপে আছে। তবু জিজ্ঞাসাবাদ করতে ভরসা পেলেন না খুব। ওর যাওয়া নিয়ে তাঁরই বরং দুভাবনা ছিল। ভেবেছিলেন যেতে চাইবে না সহজে। গেলেও থাকতে চাইবে না। যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে যখন, মতিগতি বদলাবার আগে রাজী হওয়াই ভালো। তবু বললেন, আগে যাওয়া তো ভালই, কিন্তু কালই কি করে হয়, অফিস থেকে ছুটি নিতে হবে তো, পরশু যাস।

না বাবা না, প্রায়ই অসহিষ্ণু হয়ে উঠল সান্ত্বনা, যাব তো কালই যাব নইলে যাবই না বলে দিলাম। ভারি তো একদিনের ছুটি, ও তুমি কাল সকালে গিয়ে ব্যবস্থা করে এসো।

ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলো। বাবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা শক্ত হচ্ছিল। ভিতর থেকে একটা উদ্‌গত কান্না যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সকলের ওপর ক্ষোভ সকলের ওপর অভিমান। যেতে চায় না তবু যেতে হবে বলে। কারো ওপর ভরসা করে এখানে থাকতে পারছে না বলে।

রাত্রির মধ্যেই গোছগাছ করল সব। নিজের নয়, যিনি থাকবেন এখানে তাঁর। ওর বাবার। বাক্স-বিছানা জামা-কাপড় থেকে কুকার পর্যন্ত। নিজের ব্যবস্থায় অনভ্যস্ত নয় তার বাবা। থেকে থেকে তবু টন টন করে উঠছে সান্ত্বনার ভিতরটা। ভয়ে সব ফেলে-ছড়িয়ে এভাবে এখান থেকে পালাতে হচ্ছে…।

পরদিন সকাল থেকেই মনে মনে একটা আশা পোষণ করেছিল সান্ত্বনা। বাবার মুখে নরেনবাবু তাদের যাবার কথা শুনবে। শুনে একবার আসবে। সেই যে গেছে আর আসেনি। সাত আট দিন হয়ে গেল। লজ্জার সীমা পরিসীমা ছিল না এ ক'দিন। সেদিনের কথা যখনই মনে হয়েছে, লাল হয়ে উঠেছে সান্ত্বনা। কি করে এর পরে ভদ্রলোককে মুখ দেখাবে ভেবে পায় নি।

কিন্তু আজ ভাবছে অন্য কথা। আসুক। পারতপক্ষে ও কথাই বলবে না। ওকে যেতে হচ্ছে বলে ক্ষোভ আর অভিমান তার ওপরেই বেশি যেন। কথা বলবে না, কথার জবাব দেবে না—তবু আশা করছে। আর সেই সঙ্গে মনে পড়ছে আরো এক জনকে। চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলিকে।

ছোকরা চাকরকে দশবার করে সুন্দরীর সম্বন্ধে আর বাড়ির সম্বন্ধে সব ব্যবস্থা বুঝিয়ে দিচ্ছিল। একটু এদিক ওদিক হলেই বাবার কাছ থেকে সে খবর পাবে, সে কথাও বার বার করে সমঝে দিচ্ছিল। এমন সময় বাবা ফিরলেন।

সঙ্গে আর কেউ না।

এখান থেকে দশ বারো মাইল দূরে স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেন। স্টেশন পর্যন্ত ট্রাকে যাবে। আপিসের ট্রাক নিয়েই এসেছেন অবনীবাবু।

ট্রাক যেন কোয়ার্টারসএ পড়তেই উৎসুক নেত্রে চারদিকে তাকালো সান্ত্বনা। নিচে নামছে ট্রাক। মড়াই দেখা যায়। মড়াইয়ের কর্মস্রোত দেখা যায়। সেদিকে চেয়ে চেয়ে একটা কান্না যেন গুমরে উঠতে লাগল। ইচ্ছে হ'ল চিৎকার করে বলে, ট্রাক থামাতে বলো বাবা, আমি যাব না।

নিশ্চল বসে রইল মূর্তির মত।

ওই ভুতুবাবুর দোকান। দেখা যাচ্ছে···গোলগাল লোকটা বসে আছে ক্যাশ বাক্স সামনে নিয়ে। সাগ্রহে সান্ত্বনা আবার তাকালো সেদিকে। ট্রাক থামিয়ে তার সঙ্গে অন্তত দেখা করবে একটিবার! দেখা করে বলবে, ভুতুবাবু আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে। ভুতুবাবুর টাকার লোভ। ভুতুবাবুর দোকানে সব কিছুর দাম বেশি। কিন্তু সান্ত্বনার মনে হ'ল, ভুতুবাবু ভারি আপন লোক তার। এই মুহূর্তে এত আপন বুঝি আর কেউ নয়। তার মা-লক্ষ্মী ডাকটা আর একবার শুনে গেলে হয় না?

ট্রাক ভুতুবাবুর দোকান ছাড়িয়ে গেল।

সান্ত্বনার মনে হ'ল আর কিছুই থাকল না। নিজের অজ্ঞাতে চোখে জল এসেছে কখন টের পায় নি। বাবার কথায় সচকিত হ'ল। অনেকক্ষণ ধরেই নিঃশব্দে লক্ষ্য করছিলেন তিনি।—কি হ'ল বল্ দেখি? এভাবে সাত তাড়াতাড়ি কে তোকে আসতে বলেছিল?

সান্ত্বনা বাইরের দিকে ঘুরে বসল প্রায়।

না যাস তো বল্, গাড়ি ঘোরাতে বলি।

সান্ত্বনা ঘাড় নাড়ল, না—।

এইটুকু তো পথ এখান থেকে, ভালো না লাগলে চলে আসতে কতক্ষণ।

ক'টা দিন আর, বিয়েটা হয়ে গেলে যখনই লিখবি আমি গিয়ে নিয়ে আসব'খন —মন খারাপের কি আছে।

ভিজে চোখেও সান্ত্বনা বাবার দিকে ফিরে না চেয়ে পারলো না। ঠিক এই মুহূর্তে এই সান্ত্বনাটুকুই মস্ত সম্বল যেন।

সকালে দোকানে এসে ভুতুবাবুর চক্ষু স্থির। ঘরের দরজা হাঁ করা খোলা। লোক নেই। সমস্ত ঘর জলে জলমগ্ন। জলে কাদায় সপ সপ করছে মেঝে। জলের ড্রামের মুখ খোলা, ড্রাম প্রায় খালি। ত্রস্ত চোখে চারিদিকে চেয়ে দেখে নিল ভুতুবাবু। আসবাব তছনছ হয়ে আছে। কিন্তু যায় নি কিছু, সবই আছে। এমন কি খোলা দরজার গায়ে তালাচাবিও ঠিকঠাক ঝুলছে। কিন্তু ঘরের দুর্দশা দেখে রাগে দুঃখে ভুতুবাবুর চোখে জল আসার উপক্রম। নিশ্চয় ওই দুজনের একজন মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে এমন যে, অন্যজনকে ঘড়া ঘড়া জল ঢালতে হয়েছে মাথায়।

নিজের মনে সমানে গালাগাল দিয়ে চলল ভুতুবাবু। সাতপুরুষ উদ্ধার করতে লাগল দুজনেরই। আর কক্ষনো ঘর ছাড়বে না, এই শেষ। মিয়াদ শেষ হতে এখনো সাত আট দিন বাকী। এই সাত আট দিনের টাকা সে ফেরত দেবে। ওই মড়াচোখো ডাকাতটাকে বলতে পারবে না কিছু। বলা নিরাপদও নয়। কিন্তু রণবীর ঘোষকে বলবেই। বলবে আর টাকা ফেরত দেবে। দু'তিনটে দিন নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পেরেছিল ভুতুবাবু। সান্ত্বনার সঙ্গে দেখা করে আসার পর থেকেই আর চিন্তা-ভাবনা ছিল না। গাছতলার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আর দেখেও নি মাতাল দুটো কি করছে না করছে। মনে মনে ভেবেছে, ওরকম মোটা টাকা পেলে পনেরো দিন ছেড়ে এখন আরো পনেরো দিনের জন্য ছেড়ে দিতে পারে ঘর। কারণ আসল উদ্দেশ্যে ওদের ছাই দিয়ে এসেছে।

কিন্তু আবার? মিয়াদ বাড়ানো দূরের কথা, এই বাকি সাত দিনও দেবে না সে থাকতে। এরকম মাতালের পাল্লায় পড়লে সর্বস্বান্ত হতে কতক্ষণ!

ঘর-দোর সংস্কার হ'ল। দৈনন্দিন দোকানপর্ব। সকাল গেল, দুপুর গড়ালো, বিকেল পেরুল। সন্ধ্যা। তার পর রাত্রি। উষ্ণতা কমছে ভুতুবাবুর। কড়া কথা বলতে গেলে কি হতে কি হবে কে জানে। বরং বুঝিয়েসুঝিয়ে বলবে রণবীর ঘোষকে। আর যেন দোকানপাট খোলা রেখে দুজনেই চলে না যায় ওরকম। আর, ঘরের দুরবস্থা না করে। তবু যত রাত বাড়ছে তত

অস্বস্তি বাড়ছে। ছোকরা চাকর দুটোকে আজ আর ছাড়ে নি। বুঝিয়ে বলতে গেলেও অনর্থ বাধবে কি না বিশ্বাস কি।

রাত বাড়ছে। মড়াই নিস্তব্ধ নিঝুম আবার। কিন্তু দুজনের একজনেরও দেখা নেই। না রণবীর ঘোষের, না হোপুনের। কি করবে ভুতুবাবু বুঝে উঠছে না। কখন চৌদ্দ মাইল সাইকেল ঠেঙিয়ে বাড়ি যাবে এর পর? চাকর দুটোকেই বা আর কতক্ষণ ধরে রাখবে? বসে বসে ঝিমুচ্ছে ওরা। ঝিমুনি আসছে ভুতুবাবুরও। সমস্ত দিনের পরিশ্রম আর ক্লান্তি।

হঠাৎ উঠে বসে দু চোখ রগড়াতে লাগল ভুতুবাবু। বিস্ময়, বিভ্রম। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগল চারিদিকে। না ঠিকই দেখছে। সকাল হয়েছে। পাখি ডাকছে দূরে। মুরগী ডাকছে কোথায়। চাকর দুটো মেঝেতে পড়েই ঘুমুচ্ছে অঘোরে।

কি কাণ্ড! খাটিয়া থেকে নেমে ভুতুবাবু গজগজ করতে লাগল আবার। চাকর দুজনকে ডেকে তুলল। সমস্ত রাত্রির মধ্যে কেউ না আসার দরুন মনে মনে খুশি হবে কি হবে না ঠিক বুঝে উঠছে না।

সেদিন রাত্রিতেও এল না কেউ। তার পরদিন শুনল, রণবীর ঘোষ পাত-গুটিয়েছে মড়াই থেকে। যে কোনদিন চলে যেতে পারে শুনেছিল। তবু যথার্থ গেছে জেনে ভুতুবাবু খুশিতে আটখানা। আর ঘর ছাড়তে হবে না, টাকাও ফেরত দিতে হবে না।

একদিন একদিন করে দেড়মাস কেটে গেল মাসির বাড়িতে।

যত খারাপ লাগবে ভেবেছিল সান্ত্বনা, প্রথম প্রথম তত খারাপ লাগে নি। এক আচমকা ত্রাসের বিভীষিকা থেকে ঢালা নিশ্চিন্ততার মধ্যে এসে দিনকতক বরং হাঁফ ফেলে বেঁচেছিল। তাছাড়া হঠাৎ সে এসে পড়ায় বিয়ে-বাড়িও জমে উঠেছিল অনেক আগে থেকেই।

বিয়ের মেয়ে মাসতুত বোনের মুখ খুলেছে আরো। এখন আর আভাসে ইঙ্গিতে ঠাট্টা নয়। সান্ত্বনাকে একলা পেয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেছে, তোমার সেই নরেনবাবুর খবর কি সান্ত্বদি?

আগের মত সান্ত্বনা আর ভেতরে ভেতরে উত্যক্ত হয় নি এতটুকু। বরং হাসিঠাট্টার এদিকটাকে যেন মেনে নিয়েছে খুশি মনে। উল্টে টিপ্পনী কেটেছে, সে খোঁজে তোর দরকার কি, তুই বরং তোর গদাধরবাবুর খোঁজখবরটা ভালো

করে নেওয়া শেষ কর আগে।

ভাবী জামাইয়ের নাম শুনেছে গঙ্গাপদ।

তারপর বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ে-বাড়ি শান্ত হয়েছে আবার। মাসতুত বোন শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। দিন কাটছে একটা দুটো করে। এবারে যেন একটু একটু করে হাঁপিয়ে উঠছে সান্ত্বনা।

অবনীবাবু আগেও একদিন এসেছিলেন। বিয়ের দিনও এসেছেন। কিন্তু খুব বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করার অবকাশ তেমন পায় নি সান্ত্বনা। তবু এরই মধ্যে পাঁচবার করে সুন্দরীর খোঁজ করেছে। বাবার সুবিধে অসুবিধের কথা জিজ্ঞাসা করেছে। পাগল সর্দার, ভুতুবাবু, এমন কি নিধুরামের প্রসঙ্গও তুলেছে। কিন্তু তার পর বোবা।

বাবার চিঠিপত্র পায়। মোটামুটি সংবাদও। কিন্তু তাতে মন ভরে না। মড়াইয়ের পাহাড় ধূসর মেঘের মত দেখা যায় এখান থেকে। চেয়ে থাকে। মড়াই যেন ডাকছে তাকে। ক্রমাগত ডাকছে।

সুন্দরী কি করছে এখন? ভরা দুপুরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঝিমুচ্ছে নিশ্চয়। ছোকরাটার হাতে ওর কি হাল হয়েছে কে জানে? বাবাকে ফাঁকি দিতে আর কি?...পাগল সর্দার কি জানে ও চলে এসেছে? আর ভুতুবাবু? নরেনবাবু জানেই।...কিন্তু কি ভাবছে? আর যদি ফিরে না-ই যায় সান্ত্বনা ওখানে, তাহলে? তাহলে যে কি নিজেও উপলব্ধি করতে পারছে না। কিন্তু সংগোপনে চেষ্টা করছে অনুভব করতে।...আর সেই ভদ্রলোক? চিফ ইঞ্জিনিয়ার? সে কি টের পেয়েছে ও ওখানে নেই? মড়াইয়ে সেই থেকে আর দেখা যায় নি ওকে, লক্ষ্য করেছে? করে থাকলেও বাবাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না নিশ্চয়ই। ইচ্ছে থাকলেও করবে না—চিফ ইঞ্জিনিয়ারের দেমাকে বাধবে। ভারি তো...মানুষ খুব চিনেছে সান্ত্বনা। তবে, নরেনবাবুর কাছে জেনে থাকতে পারে বা নিধুর মুখেও শুনতে পারে। সচকিত হয়ে ভাবনার লাগাম থামিয়ে নিজেকেই চোখ রাঙায় এক একসময়। কি লাভ এসব জেনে? হেসেও ফেলে আবার নিজের মনেই। লাভ-লোকসান আবার কি? জানতে ইচ্ছে করছে তো করছে, ব্যস—

অবনীবাবু আবার একদিন এলেন মেয়েকে দেখতে। বিয়ে-বাড়ি এখন একদম ফাঁকা। বাবাকে এবার অনেকটাই নিরিবিলিতে পেল সান্ত্বনা।

সেই ভেজাল সিমেন্টের কি হ'ল বাবা, সব মিটে গেছে?

জবাবে অবনীবাবু জানালেন, গোলযোগের সম্ভাবনা বরং বেড়েছে। কলকাতা থেকে বে-সরকারী কমিটি আসবে ড্যাম দেখতে। তারা ড্যাম দেখবে আর সেই

সঙ্গে সিমেন্টের ব্যাপারও ফয়সালা করে যাবে। এই সব কিছুর তলায় তলায় ঘোষ-চাকলাদারের কারসাজি কিছু আছে বলেই অবনীবাবুর ধারণা। অবশ্য কবে পর্যন্ত আসবে কমিটি ঠিক নেই কিছু।

বাবার মুখের ওপর সান্ত্বনার দু চোখ ঘুরে এলো এক চক্কর।—ওই কন-ট্রাক্টাররা এবারে খুব উঠে পড়ে লেগেছে বুঝি ?

তা লাগবেই তো, যার যেখানে স্বার্থ। ওদের একজন এখানে আছে আর একজন তো সেই সব কাণ্ড করে কবেই গা-ঢাকা দিয়েছে।

সান্ত্বনা অবাক। কাণ্ড করে! কই সে তো কিছুই জানে না। বাবার মুখের ওপর আর একপ্রস্থ বিচরণ করে স্থির হ'ল দু চোখ। মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, দুজনের কে আছে ওখানে ?

ঘোষের পার্টনার—দ্বিজেন চাকলাদার।

সন্তর্পণে একটা রুদ্ধ নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল যেন। শান্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল আবার, আর ওই লোকটা কি করে গেছে বলছিলে···?

একটু থমকে গেলেন অবনীবাবু। বিব্রত মুখে তাকালেন মেয়ের দিকে। খেয়াল হ'ল, সান্ত্বনা আগেই মাসির বাড়ি চলে এসেছিল বটে, জানার কথা নয়। দু'চার কথায় সমাচার যা বললেন, শুনে কিছুক্ষণের জন্য সান্ত্বনার বাহ্যজ্ঞান লোপ পেল যেন। রণবীর ঘোষ মড়াই ছেড়ে গেছে সেও প্রায় মাস দেড়েক হ'ল, সান্ত্বনা চলে আসার পরেই। ঠিক তার তিন দিন বাদে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের মেয়ে ঝরনা নিখোঁজ হয়েছে। আজ পর্যন্ত তার কোন খবর নেই। মড়াইয়ে এই নিয়ে মন্দ গণ্ডগোল হয় নি। কলকাতায়ও খোঁজখবর করা হয়েছে অনেক। দুজনের কারো পাত্তা মেলে নি। এমন কি দ্বিজেন চাকলাদারও রণবীর ঘোষের কোন হদিস দিতে পারেননি। হয়তো বা জেনেও ইচ্ছে করেই দেননি।

আত্মস্থ হওয়া মাত্র সান্ত্বনা চলে এলো বাবার সুমুখ থেকে। যা শুনল দুঃখের কথা, লজ্জার কথা। কিন্তু সেই সঙ্গে ওর ভিতরের একটা কালো ত্রাসও যেন অপগত। লোকটা বিদায় হয়েছে। আর হয়তো মড়াইয়ে আসবেও না। ঝরনার জন্য দুঃখ করবে ? কয়া উচিত। কিন্তু দুঃখ হচ্ছে না ও তার কি করবে ? বরং হঠাৎ এক মুক্তির আনন্দ উপছে উঠচে। সেটা গোপন করার জন্যই বাবার কাছ থেকে চলে আসা। দেড় মাস মড়াই ছেড়ে এসেছে। দেড় মাস ? দেড় বছর। দেড় যুগ।

পরদিন বাবার সঙ্গে মড়াইয়ে রওনা হ'ল সে। মাসি অবাক, বাবা অবাক। প্রথমবারেও যেমন কেউ ধরে রাখতে পারে নি ওকে, এবারেও কারো নিষেধ বা

অনুরোধে কান দিল না।

…মড়াই!

দূর থেকে চোখ পড়ামাত্র উচ্ছল আনন্দে ট্রাকের ধারে ঝুঁকে পড়ল প্রায়। ছেড়ে আসার সময় মনে হয়েছিল ভিতরটা বোবা শূন্যতায় ভরে উঠেছে। আজ তার উল্টো। এত আনন্দ ধরছে না। নির্নিমেষে দেখছে। এই দেড় মাসের পরিবর্তন যাচাই করে নিচ্ছে। এ সৃষ্টি-সমারোহে দেড় মাস দেড় পলকের মতই। তার ওপর শুনেছিল, অসময়ে প্রায়ই বৃষ্টি হওয়ার দরুনও কাজ-কর্মে ছেদ পড়েছে। তবু যাও হয়েছে তাই উপলব্ধি করার একাগ্রতায় উন্মুখ হয়ে উঠল। পারলে আজই একবার মড়াইয়ে নামে। কিন্তু বাবা তাহলে দেবে'খন" ঘাড় ফিরিয়ে ঈষৎ কৌতুকে বাবাকে একবার দেখে নিল।

অফিস কোয়ার্টারস্।

উৎসুক চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সান্ত্বনা। কিন্তু এই ভরা দুপুরে কে আর বাইরে বসে আছে? ওই দূরে কোণের ঘরটা একজনের। আর উঠোনের এদিকেরটা আর একজনের। ঘরে বসে কাজ করছে না মড়াইয়ে নেমেছে কে জানে। মনে মনে লজ্জা পেল একটু। ভিতরে ভিতরে ভাবছে কি না, সে যে এসেছে যদি ওই দুজনকে এক্ষুনি জানানো যেত।

ভুতুবাবুর দোকান।

বাবা, ট্রাক থামাতে বলো একবারটি। এই, থামাও একটু। নিজেই বলে উঠল ড্রাইভারের উদ্দেশে। অবনীবাবু কিছু বলার বা বোঝার আগেই গাড়ি থামল এবং সান্ত্বনা নেমে পড়ল।

তুমি ট্রাক নিয়ে বাড়ি চলে যাও বাবা, আমি আসছি একটু বাদেই।

অন্তর্ধান। অবনীবাবু দেখলেন, মড়াইয়ে প্রথম আসার আগে যা ছিল, রাতারাতি তার থেকেও যেন মেয়ের বয়স কমে গেছে অনেক।

মা-লক্ষ্মী!

খালি গায়ে কাঠের ক্যাশ বাক্সের সামনে বসে ঝিমুচ্ছিল ভুতুবাবু। সহসা চোখের সামনে তার আবির্ভাব বিস্ময় আর আনন্দে উদ্ভাসিত। দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসতে লাগল সান্ত্বনা।

এস মা-লক্ষ্মী, এসো। জিব কাটল, আসুন মা-লক্ষ্মী আসুন—বসুন—কবে এলেন?

সান্ত্বনা হাল্কা জবাব দিল. এখনো ভালো করে আসি নি. ট্রাক থেকে এখানে নেমে পড়েছি।

উঠে ভুতুবাবু একমাত্র টিনের চেয়ারটা ঝেড়েমুছে বসতে দিল।—ভুতুর ভাগ্য, বসুন মা-লক্ষ্মী, ওরে এই ছোঁড়ারা, চা কর না ভালো করে, বেশ করে সাবান-জলে গেলাস ধুয়ে নিস্ আগে।

হুকুম দিয়ে হৃষ্ট বদনে ক্যাশ বাক্সের সামনে সমাসীন হ'ল আবার, আপান ছিলেন না এতদিন, গোটা মড়াই অন্ধকার।

সান্ত্বনা মুখ টিপে হাসছে তেমনি। কোনদিনই খারাপ লাগে নি, আজ তো কথাই নেই।

বোনের বিয়ে হ'ল ?

মাথা নাড়ল।

মাসির বাড়ি এবং বোনের বিয়ের খবরাখবর নিতে লাগল ভুতুবাবু। সংক্ষেপে একটা ফিরিস্তি দিয়ে সান্ত্বনা জিজ্ঞাসা করল, তার পর এখানকার সব খবর বলুন।

পা গুটিয়ে আঁটসাট হয়ে বসল ভুতুবাবু।—খবর খুব ভালো মা-লক্ষ্মী, কিছু গণ্ডগোল নেই আর, খালি জল-বিষ্টি একটু বেশি হচ্ছে এই যা। এদিক ওদিক চেয়ে কণ্ঠস্বর একেবারে সমে নামিয়ে আনল হঠাৎ, সেই যে সেই বলেছিলাম মা-লক্ষ্মী মনে আছে ? আপদ বিদেয় হয়েছে একেবারে, আর আসতে হচ্ছে না বাছাধনকে—যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই, বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ একদিন গা-ঢাকা—তিন দিন বাদেই ওদিকে আর এক মেয়েও মড়াই থেকে একেবারে যেন উবে গেল—চ্যাটার্জী সাহেবের সেই মেয়েটা মা-লক্ষ্মী—সাট ছিল আগের থেকেই, বুঝলেন না ?

সান্ত্বনা বুঝেছে আগেই। বুঝে চায়ের গেলাসে মনোনিবেশ করেছে।

তেমনি নিচু গলায় সোৎসাহে বলে গেল ভুতুবাবু, সে এক হৈ-হুলুস্থুলু ব্যাপার মা-লক্ষ্মী, ওই তো শরীর ভদ্রমহিলার, নড়তে চড়তে কষ্ট, তায় আবার সেজেগুজে থাকেন অষ্টপ্রহর—তা কোথায় গেল সাজপোশাক কোথায় কি—দিনে সাত বার করে ওই দেহ নিয়ে ওপর নিচ করা—যাকে দেখেন তার কাছেই কি কান্না কি কান্না—আমার মেয়েকে খুঁজে বার করে দাও. তোমরা—তা খুঁজতে কি বাকি ছিল কোথাও। কোলকাতায় পর্যন্ত ঝেঁটিয়ে খোঁজা হয়েছে—ভদ্রমহিলার কথা ভাবলে রীতিমত কষ্ট হয় এখন।

মুখের দিকে চেয়ে কষ্টের কোন লক্ষণ দেখল না সান্ত্বনা। মহিলা, অর্থাৎ ঝরনার মায়ের দুঃখ ওর মনেও যে রেখাপাত করল খুব, তাও নয়।

বাড়ি ফিরেই সুন্দরী-দর্শনে গোয়ালঘরে ঢুকল সর্বাগ্রে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

দেখে নিল আগে। অনেক দিনের অদর্শনের পর মা যেমন করে ছেলেকে দেখে। গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। মাথা নেড়ে শিং দুলিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল গোরুটা। সান্ত্বনার মনে হ'ল, আনন্দ করছে আর সেই সঙ্গে অভিমানও জানাচ্ছে।

পরদিন কথায় কথায় বাবার মুখে শুনল, নরেনবাবু নেই এখানে, আপিসের কি কাজে কোলকাতায় গেছে পাঁচ-সাত দিনের জন্য। ভালো লাগল না। এ ক'দিনে ওর আসাটাই খানিকটা পুরানো হয়ে যাবে।

দুপুরে বাইরের দরজায় শিকল তুলে দিয়ে সান্ত্বনা মড়াইয়ের উদ্দেশে পা চালিয়ে দিল। এরই প্রতীক্ষায় ছিল। দিনটাও ভালো। মেঘলা, ছায়া-ছায়া।

কাল লক্ষ্য করে নি। কিন্তু উপর থেকে আজ মড়াইয়ের দিকে চোখ পড়তেই অবাক। পরিবর্তন হয়েছে বৈ কি। মড়াইয়ের এক দিকের রূপ বদলে গেছে একেবারে। মাটির দেয়ালের ওদিকটা। সেই কোন্ তলায় পড়েছিল নোংরা দু'চার হাত আবর্জনা-গোলা জল। তাকালেও গা ঘিন ঘিন করত। সেই জল কি করে এরই মধ্যে ওই বিশাল উঁচু মাটির দেয়ালের প্রায় আধাআধি উঠে এসেছে। আর সেখান থেকে পিছনের দিকে যতদূর চোখ যায়, জল আর জল। বর্ষার লাল জল। গাঢ়-গৈরিক। থকথকে অপরিশ্রুত, তবু অপরূপ। মেঘলা আকাশ, ধূসর পাহাড়, আর পারিপার্শ্বিক সবুজের সঙ্গে ঠিক যেমনটি মেলে।

চোখে পলক পড়ে না সান্ত্বনার। এত বড় সাময়িক মাটির দেয়াল তোলার অর্থ এখন বুঝছে।

মড়াই। সান্ত্বনা নেমে এলো। আগের মত তরতর করে নয়। জলে জলে পিছল হয়ে আছে। নিচে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বাতাস, সেই মুক্তি আর সেই রোমাঞ্চ। গঠন সমারোহের পরিবর্তন কিছু চোখে পড়ে না বটে, তবু তফাৎ কি উপলব্ধি করা যায়। কাজের তাড়া বেড়েছে, নিবিষ্টতা বেড়েছে, আবহাওয়ার একটা অলক্ষ্য তাগিদের ইঙ্গিত। সম্ভবত জলের দরুন। যতক্ষণ আকাশ সদয় যতটা পারো এগিয়ে যাও। ভুরু কুঁচকে সান্ত্বনা আকাশের দিকে তাকালো একবার।—এখনই এই, ভরা বরষায় কি হবে কে জানে।

এ ছাড়াও তফাৎ কিছু দেখছে। হাজার হাজার লোক কর্মরত। ক'জনকে আর বিচ্ছিন্ন করে চেনা। কিন্তু ওর অনুপস্থিতি যেন প্রায় সকলেই অনুভব করছিল। যেখানে দিয়ে পাশ কাটালো সেইখানেই মানুষগুলোর চোখে নীরব

অভ্যর্থনার আভাস দেখল। খুশিতে আনন্দে ভরে ভরে উঠতে লাগল সান্ত্বনা। ওর যাওয়াও সার্থক, ফিরে আসাও সার্থক।

নিজের হাতে কাজ করে না পাগল সর্দার, কাজের তদারক করে। তাই করছিল। দূর থেকে সান্ত্বনাকে দেখে এগিয়ে আসতে লাগল। সান্ত্বনা দাঁড়িয়ে পড়ল। কাছে আসতে সর্দারের ঘামে ভেজা কালো মুখ খুশিতে চকচকে হয়ে উঠল। দেখতে লাগল নিরীক্ষণ করে।

সান্ত্বনাও হাসছে। কি দেখছ সর্দার?

তুকে।···তেমনি জবাব দিল সর্দার, তু চলে যেয়েছিলি কেনে দিদিয়া?

বাঃ রে, বোনের বিয়ে, যাব না? বলল বটে, কিন্তু ওর খুশিভরা চোখের দিকে চেয়ে বিব্রত বোধ করতে লাগল। স্পষ্ট বলছে যেন, বোনের বিয়ে আর কতদিন ধরে হয় বাপু, তোর ডর লেগেছিল দিদিয়া। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কেমন ছিলে সর্দার—

ভালো ছিলাম। ভালো থাকার ছোটখাটো একটা ফিরিস্তি দিল সর্দার। আজকাল আর কাজে কামাই করছে না। তবে জলের জন্য মাঝে মাঝে আপনি কামাই হয়ে যায়। নয়তো রোজ আসে। অনুযোগ করল, যাবার আগে দিদিয়ার ওকে বলে যাওয়া উচিত ছিল। তাহলে তার সুন্দরীর এত কষ্ট হ'ত না। জানার পরে অবশ্য প্রায়ই গিয়ে সে সুন্দরীর দেখাশুনা করে এসেছে, ইত্যাদি।

সান্ত্বনা বাবার মুখে শুনেছে সে কথা। কৃতজ্ঞ নেত্রে তাকালো তার দিকে। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ফেলল সর্দার, হালকা প্রশ্ন করল, উবাসীর বাবু তুর বিয়া কবে দিবে?

দিনেদুপুরে এই পরিবেশে এমন বেখাপ্পা প্রশ্ন শুনলে কার না হাসি পায়। সান্ত্বনা হেসে উঠল খিলখিল করে। বলল, দিলে কি হবে? একেবারে তো চলে যাব এখান থেকে!

সর্দার মাথা নাড়ল, তা বটে। সত্যতাটুকু উপলব্ধি করল যেন। বিষণ্ণ ছায়া নামল মুখে। আর তক্ষুনি ভিতরের দগ্ধ মানুষটাকে দেখতে পেল সান্ত্বনা। রিক্ততা দেখতে পেল। ওকে দেখে যত খুশি হোক, যত ভালো আছে বলুক, এক নিঃসীম বেদনার জরায় মানুষটাকে বরাবরকার মত আচ্ছন্ন করে দিয়ে গেছে চাঁদমণি। পাগল সর্দার বরাবরকার মতই বুড়িয়ে গেছে।

সর্দারের দোসরটিকেও দূর থেকে লক্ষ্য করেছে সান্ত্বনা। সেদিন নয়, পরদিন। কোদাল দিয়ে পাহাড়ের গা-ঘেঁষে মস্ত একটা পাথরের তলা থেকে মাটি সরাচ্ছে।

ওর আশেপাশে আরো অবশ্য কাজ করছে কেউ কেউ। তবু মনে হয়, চারপাশে একটা রূঢ় বিচ্ছিন্নতার গণ্ডি টেনে দিয়ে নির্মম একাগ্রতায় ওই অটল পাথরটার সঙ্গে যুঝতে নেমেছে। চোখে চোখ পড়তে সান্ত্বনা দ্রুত প্রস্থান করল সেখান থেকে। পিছন ফিরে তাকালো না একবারও।...ভাবছে। ঝরনার নিখোঁজ হওয়ার ষড়যন্ত্রে সত্যিই কি এই লোকটাও জড়িত? বিশ্বাস হয় না যেন। বিশ্বাস করতে মন চায় না। কিন্তু ফিরে তাকাবে আবার এমন সাহসও নেই।

পা থেমে গেল।

অদূরে ওই প্রেসার-গেট সংলগ্ন ব্লকের দিকে এগোচ্ছে তিন-চারটি লোক। একজন চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি। ওকে দেখেছে। সকলেই দেখেছে। এখানে এলে দেখা হবেই জানে।...গত কালই আশা করেছিল। আর, সংগোপন প্রত্যাশায় দু চোখ সজাগ ছিল আজও।

দলছাড়া হয়ে ভদ্রলোক এদিকেই আসছে। বাকী ক'জন কাজের দিকে এগোচ্ছে। সান্ত্বনা না দেখার ভান করল প্রথম। কিন্তু সেও এক বিড়ম্বনা। দাঁড়িয়ে পায়ে করে আঁচড় কাটতে লাগল আধভেজা পাথুরে বালিতে, আর হাসতে লাগল সোজাসুজি তাকিয়ে। এই বরং সহজ।

কাছে এসে বাদল গাঙ্গুলি হাসিমুখে বলল, পরশু এসেছ শুনলাম?

খবর রাখে। নিধুর মুখে শুনেছে বোধ হয়। নিধু কাল এসেছিল। খুশির লালিমায় সান্ত্বনা তার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল শুধু।

আজ এখানে আসতে আসতে ভাবছিলাম দেখা হবে, ঠিক ভেবেছিলাম, দেখো।

সাধারণ কথা। কিন্তু তাতেই লাল। এ রকম ভেবেছিল জানলে সান্ত্বনা আসতই না কক্ষনো। সে কথা আর বলে কি করে। চুপ করে থাকাও কাজের কথা নয়। বলল, ভেবেছিলাম এই দেড় মাসে কত কি না জানি হয়ে গেছে, এসে দেখি যেমন কে তেমনি, কিছুই হয় নি।

সাদা কথায়, কি-ই বা এমন কাজের লোক আপনারা!

বাদল গাঙ্গুলি প্রচ্ছন্ন কৌতুকে চুপচাপ দেখল একটু। ড্যামের ব্যাপারে ওর এই আগ্রহের কারণ কিছুটা জানে এখন। জলবরা এক সন্ধ্যায় নয়েন আর সে বসেছিল কোয়ার্টারে। সেদিন কেমন মনে পড়েছিল ওর কথা। পর পর অনেক দিন দেখেনি বলেই হয়তো। কথায় কথায় তখন শুনেছিল। আভাসে অনুমানে নয়েন যতটুকু জানত।

ছদ্ম-গাম্ভীর্যে প্রায় কৈফিয়ত দেবার মত করেই জবাব দিল, তুমি ছিলে না এখানে, যার যেমন খুশি ফাঁকি দিয়েছে।

হেসে ফেলল। এ প্রসন্নতা নিজের কাছেই প্রায় বিস্ময়ের কারণ। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, সঙ্গী অফিসার ক'জন অনেকটা এগিয়ে গেছে। আর কিছু না বলে ফিরে চলল।

উৎফুল্ল চোখে সেদিকে চেয়ে সান্ত্বনা দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। বাবার মুখে শুনেছিল, জল-বৃষ্টির ব্যাঘাতে ভদ্রলোকের নাকি মেজাজ বিগড়ে আছে। তার ওপর বে-সরকারী কমিটি আসছে কাজ দেখতে আর সিমেন্টের ফয়সালা করতে, সে উদ্বেগও কম নয়। এই দেড়মাসে বেশ শুকনোই দেখাচ্ছিল ভদ্রলোককে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও ওকে দেখে অন্য সকলের মত এরও চোখে মুখে সেই খুশির অভ্যর্থনা উপলব্ধি করেছে সান্ত্বনা।

বাড়ির উদ্দেশে পা চালিয়ে দিল। দেরি হয়ে গেছে। হোক গে। তৃপ্ত, প্রসন্ন। এই কর্মপরিসরের প্রতি একাত্ম অনুভূতির আস্বাদন একটা। অপরিসীম মমতা। বেশ হ'ত, এই মানুষদের মত সেও যদি কাজে লাগতে পারত কিছু। বেশ হ'ত, পুরুষমানুষ হলে। এ সময়ে ড্যামের ভালো মন্দ নিয়ে ভাবতে পারত, আলোচনা করতে পারতো চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গেও।

ধেৎ! সপ্রগল্‌ভ লজ্জায় সমস্ত মুখে যেন আবির লাগল একপ্রস্থ।

…পুরুষমানুষ হলে কেউ আমলই দিত না ওকে।

দিন দুই গেছে আরো।

কোন কাজে মন বসছিল না সান্ত্বনার। সন্ধ্যা পার হতে চলল। খানিক আগে বাড়ি ফিরেছে আর ঘুরেফিরে ঝরনার মায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের কথাটাই ভাবছে।

মেন কোয়ার্টারস্‌-এর এক পাথরের আড়ালে হাত পা ছড়িয়ে বসেছিলেন মিসেস চ্যাটার্জী। প্রসাধন-পারিপাট্য নেই, শিথিল বেশবাস। ভারী মুখে বিষণ্ণ কালচে ছাপ। উদাসীন বিষাদে এই দুনিয়ার প্রতিকূলতার কথাই ভাবছিলেন বোধ হয়। একেবারে সামনাসামনি পড়ে হকচকিয়ে গিয়েছিল সান্ত্বনা। পালিয়ে আসত। কিন্তু মহিলার অপ্রসন্ন দুই চোখ যেন কাঁচপোকার মত আটকে ফেলল ওকে। মনে হ'ল, ঠাণ্ডা ইশারায় ডাকছেন। পায়ে পায়ে কাছে আসতে আবার খানিক বিশ্লেষণ করে দেখলেন ওকে। পরে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করলেন, এতদিন কোথায় ছিলে?

বলল। সে যে ছিল না এখানে সেটা এঁরও আগোচর নয় জেনে অবাক।

আর একদফা উষ্ণ পর্যবেক্ষণ। ঠিক ওকে নয় যেন। ওর ভিতর দিয়ে এই বয়সের সকল মেয়ের ওপর বিরূপ ভ্রূকুটি একটা। কিন্তু কণ্ঠস্বর বদলে গেল হঠাৎ। মুখভাবও। গলা নামিয়ে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যাবার আগে ঝরনার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল একদিনও?

চট করে জবাব দিয়ে উঠতে পারে নি সান্ত্বনা। শেষ দেখা হয়েছিল ভুতুবাবুর হোটেলে। ওকে দেখে এবং একটু পরেই রণবীর ঘোষকে দেখে ব্যঙ্গ-কৌতুকে ঝরনা ঝলমলিয়ে উঠেছিল যে দিন। তার পর আর জানবে কি করে, সান্ত্বনা নিজেই পালিয়ে এসেছিল।

জবাব শুনে মিসেস চ্যাটার্জী বিস্মিত। তোমাদের বাড়ি গিয়েছিল? কবে? কেন? আমাকে বলে নি···

কান্নার মত শোনালো প্রায়। সামলে নিলেন। দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলার ক্ষোভে দ্বিগুণ বিরক্ত। মুখ ঘুরিয়ে রূঢ় মনযোগে ওপারের আকাশ-ঘেঁষা পাহাড় দেখতে লাগলেন তিনি।

সেই থেকে মনটা ভারী হয়ে আছে সান্ত্বনার। ভদ্রমহিলা যেমনই হোন, মেয়ের ভালো ছাড়া মন্দ তো কখনো চান নি। বরং একটু বেশি ভালো চা-তেন বলেই অমন করতেন।

বাইরের ঘরে বাবার সঙ্গে আরো একজনের সাড়া পেয়ে খুশিতে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল সান্ত্বনা। কিন্তু যত খুশি তত লজ্জা। যত আনন্দ তত সঙ্কোচ। হঠাৎ যেন অভিভূত হয়ে রইল দু'চার মুহূর্ত। দাওয়া ছেড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল তাড়াতাড়ি।

বাবা ডাকলেন, কই রে সান্ত্বনা, নরেন এসেছে!

এসেছে তো জানে। কিন্তু যায় কি করে! সেই থেকে প্রতীক্ষাও করছে মনে মনে। কিন্তু সামনে গিয়ে দাঁড়ানো দায়।

নরেনই সহজ করে দিল ওর আসাটা। অবনীবাবুর সঙ্গে সঙ্গে গলা চড়িয়ে জানান দিল, দেড় মাসে মাসির কাছে রান্নাঘরের নতুন কি শিখে এলে হাতে-কলমে পরীক্ষা চাই—একটু এদিক ওদিক হলেই গোল্লা!

আগের দিনের একটা সুর কানে লাগছে। এ ঘরে এসে দরজার কাছে দাঁড়াল সান্ত্বনা। এতদিন পরে সাক্ষাতের আনন্দ থেকেও মানুষটাকে দেখে নেওয়ার কৌতূহল বেশি।

নরেনের দু চোখ তার মুখের ওপর আটকে রইল দু'চার মুহূর্ত। তারপর হালকা অনুশাসনের সুরে জিজ্ঞাসা করল, যা বললাম কানে গেলো?

সান্ত্বনা জবাব দিল না। দেখছে তেমনি। হাসছেও।

অবনীবাবু মেয়ের দিক টেনে ঠাট্টা করলেন, কানে গেলেই বা করবে কি, এই দেড় মাসের মধ্যে দেড় দিনও কি মড়াই ছেড়ে ছিল ভাবো নাকি।

হাসি চেপে ভ্রূভঙ্গি করে বাবার দিকে তাকাল সান্ত্বনা। নরেন সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে দাবি প্রত্যাহার করে নিল যেন। বলল, তা বটে, এত বড় দুশ্চিন্তার বোঝা মাথায়, গেলেও বা নিশ্চিন্তে থাকে কি করে!

আবারও দৃষ্টি বিনিময়। দেখাটাই শেষ হয় নি যেন সান্ত্বনার। মৃদু হাসি, সকৌতুক নিরীক্ষণ।

অবনীবাবু উঠে এলেন। অফিসের পোশাক বদলে হাতমুখ ধোবেন। নরেন সামনের দিকে ঝুঁকে এলো তৎক্ষণাৎ। গলা নামিয়ে বলল, এতদিন দেখা নেই দেখে ভাবলাম মাসি এবার হাতের মুঠোয় পেয়ে বোনঝিকেও একেবারে ঝুলিয়ে দিয়ে তবে ছাড়বেন।

হাসি স্পষ্টতর হ'ল। সাদা দাঁতের আভাসও দেখা গেল প্রায়। কিন্তু তবু কথা বলবেই না সান্ত্বনা।

নরেন সোজা হয়ে বসল। চোখে চোখ রাখল আবার। হালছাড়া গলায় বলে উঠল, কি ব্যাপার, চিড়িয়াখানার জীব ঠাওরালে নাকি আমাকে?

নিরীক্ষণের কৌতুকগঞ্জনা শেষ হ'ল এতক্ষণে। সান্ত্বনা জোরেই হেসে উঠল।

—বারো—

নরেন এবং সান্ত্বনা দুজনারই ভিতরে ভিতরে কিছু একটা আপোস হয়ে গেছে যেন। চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে কথায় কথায় একদিন যে অস্বস্তির মুখোমুখি হয়েছিল, মনে মনে তার জন্য দুজনেই কুণ্ঠিত তারা। সেটুকু মুছে ফেলার ব্যগ্রতাও তাই দুজনারই সমান। হাসিখুশি চপলতার মধ্যে পরস্পরের মনোরঞ্জনের সূক্ষ্ম আগ্রহটুকুর প্রকাশ নেই, অনুভূতি আছে।

সান্ত্বনা ভাবে, ভাগ্যে মাসির বাড়ি গিয়েছিলাম, নইলে কি লজ্জা, কি লজ্জা! ও লজ্জা বুঝি আর জীবনে কাটিয়ে ওঠা যেত না। মনে মনে সঙ্কুচিত নরেনই বেশি। কি না কি কথা একটা, তাই শুনে একেবারে দেউলের মত ওদের বাড়ি থেকে উঠে এসেছিল। নিজের সেই দৈন্য ওরও বিষম লজ্জার কারণ।

কিন্তু মাসির বাড়ি গিয়েছিল বলে আজ নরেনই মনে মনে খুশি বেশি। এই

বাঞ্ছিত আপসের দরুনই নয় শুধু। দেড়মাসে মেয়েটা বদলেছে অনেক। নতুন সবুজের মত ফিরে উচ্ছল হয়ে উঠেছে আবার। গোড়ার যে মেয়ে মড়াইয়ে এসেছিল তেমনি। বরং তার থেকেও বেশি। মাঝখানে ওই উচ্ছল প্রাচুর্য নারীচেতনার কানায় কানায় বাঁধা পড়ে আসছিল। কাম্য তাইই। কিন্তু ওই থেকেই এক ধরণের বিচ্ছিন্নতা এসেছিল। সংশয়ও।

কিন্তু সে অধ্যায় একেবারে মুছে গেছে এখন। চেতনার বাঁধ ভেঙেছে। নিজেকে আগলে রাখার কারিগরি ভুলেছে। দেড় মাসের শূন্যতা ভরাতে তিন-গুণ উপচে উঠেছে। হাসে, গল্প করে, হৈ-চৈ করে। রাগালে রাগে, চোখ রাঙালে ডবল চোখ রাঙায়। বেড়াতে বেরোয় দুজনে। পুরোনো জায়গায় নতুনের ছাপ লাগে। শালমহুয়ার দিকে যায়, পাহাড়ের দুর্গম কোনো পাথরে ওঠার ভীরু চেষ্টায় হেসে আটখানা হয় নিজেই, একসঙ্গে চা খেতে আসে ভুতু-বাবুর দোকানে। নরেনবাবু কত প্রশংসা করে ভুতুবাবুর, তার কাল্পনিক ফিরিস্তি দেয় গম্ভীর মুখে। লজ্জায় সুখে গলে থাকে ভুতুবাবু। তাই দেখে হাসি চাপা দায় হয়ে ওঠে নরেনের।

সান্ত্বনার অগোচরে নরেন চেয়ে চেয়ে দেখে এক এক সময়। নতুন করে আবার কাঁচা বয়সের যাদু লেগেছে ওর মধ্যে। যা এই মড়াইয়ে আর এই মড়াইয়ের পাহাড়ী পরিবেশেই শুধু মানায়। বলেও ফেলে, ভাগ্যে জায়গাটা এরকম, অন্য কোথাও হলে ঢি ঢি পড়ে যেত।

নিরীহ মুখে পাল্টা প্রশ্ন করে সান্ত্বনা, ধিঙ্গী মেয়ে বলত? জবাব না পেয়ে হেসে ওঠে।—আগে যা ছিলুম জানেন না, তড়তড়িয়ে গাছে উঠতাম বলে মায়ের হাতে কম কিল খেয়েছি!

চেষ্টা করলে এখনো পারো বোধ হয়ে উঠতে।

না, এখন আর পারিনে, মোটা ধুমসী হয়ে গেছি।

নিজের সম্বন্ধে অমন একটা বিশেষণ প্রয়োগের আনন্দেই আবার হেসে সারা। কতটা মোটা হয়েছে নরেন পরীক্ষাসূচক চোখে তাই যেন দেখে চেয়ে চেয়ে। তৃষ্ণার্ত একটা অনুভূতি হাসি-চাপা দিতে হয় তাকেও।

নরেনের খুশি হওয়ার আরও একটু কারণ আছে। সম্প্রতি অবনীবাবুর মধ্যেও কিছু পরিবর্তনের আভাস পাচ্ছে সে। প্রথম থেকেই এই বাড়িতে তার অবারিত আনাগোনা। অবনীবাবু বাড়ি থাকুন আর নাই থাকুন, যখন খুশি এসেছে, যতক্ষণ খুশি থেকেছে। কিন্তু বিবেকের আঁচড় পড়তই একটা দুটো। ভদ্রলোক কিছু ভাবেন কি না, মনে মনে অসন্তুষ্ট হন কি না কে জানে। কিন্তু নরেনের মন

থেকে এখন সে সংশয়ও গেছে। কোন কারণ নেই তবু গেছে। ওর এবারের এই আসা যাওয়া এবং মেয়ের সঙ্গে অবাধ মেলামেশায় ভদ্রলোকের একটুখানি সস্নেহ প্রশ্রয়ও আছে। কেমন করে নরেন যেন সেটুকু উপলব্ধি করেছে।

অনুকূল অবকাশ পেলে সান্ত্বনাকে ও নিজেই হয়তো বলত। কিন্তু এ উচ্ছলতার মুখে বলাটা না হালকা হয়ে ভেসে যায়। সময় আসুক বলবে। সান্ত্বনা থামুক, শান্ত হোক একটু। তখন বলবে। সদ্য-অবরোধ-ভাঙা তটিনীর সঙ্গে ওর তুলনা চলে এখন।

কিন্তু বেজায় রাগ হয় নরেনের এই অকালবৃষ্টির ওপর। জলের দরুন ড্যামের কাজে বিঘ্ন হচ্ছে বলে চিন্তিত হয়তো হয়েছে, কিন্তু রাগ হয় নি এখনো। এ যেন এক গদ্যকারের অমিল। দিনকতক ছিল বেশ। আবার শুরু হয়েছে। সময় নেই অসময় নেই ঝমঝমিয়ে নামলেই হ'ল। অফিসের পর বর্ষাতি নিয়ে অবশ্য হাজির দিতে পারে। দিচ্ছে না এমনও নয়। কিন্তু সান্ত্বনাই হয়তো চোখ বড় বড় করে বলে ওঠে, এই জলে কি কাণ্ড! কি কাণ্ডর সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে না উঠতে জলের ছিটেফোঁটা কোথাও লাগল কি না অবনীবাবুর হাতে আবার সেই পরীক্ষার সঙ্কোচ। তাছাড়া বেড়ানো বন্ধ। দিনকতক ওটাই মস্ত আকর্ষণ ছিল।

সকাল থেকেই সেদিন আকাশ নির্মেঘ। রোদ উঠেছে। কান্নাভেজা মুখে একপ্রস্থ হাসির মত। দুপুরে রোদ থাকল না বটে, কিন্তু শীতকালের পড়ন্ত আলোর মত ভারি একটা মিষ্টি ছায়া পড়ল সর্বত্র। যে আলো আর যে হাওয়া ঘরকুনো মনকেও বাইরে টেনে আনে।

অফিস ঘরের টেবিলে আঁকার সাজ-সরঞ্জাম কাগজপত্র ছড়িয়ে রেখেই নরেন উঠে পড়ল শেষ পর্যন্ত। অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করছে ভেতরটা। বিকেলে আবার শুরু হবে কি না এক পশলা কে জানে। কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। আসলে ওই আকাশ, ওই বাতাস আর এক নিভৃতের দিকে টানছে ওকে।

সরাসরি এসে ট্রাকে চাপল। মেন কোয়ার্টারস্-এ উঠে ট্রাক ছেড়ে দিল। তার পর পা চালালো জেনারেল কোয়ার্টারস-এর দিকে।

বেশিদূর যেতে হ'ল না। মুখোমুখি দেখা। সান্ত্বনা অবাক। কি ব্যাপার, এ সময়ে এদিকে কোথায়?

সব ব্যাপারে ওর এই সহজ বিস্ময় নরেনের বাঞ্ছিত নয় খুব। ছদ্ম বিস্ময় হলে বরং খুশি হ'ত। অত্যন্ত হালকা সুরেই জবাব দিল, এদিকে অবনীবাবু নামে এক ভদ্রলোক থাকেন, যাচ্ছিলাম তাঁর বাড়ি। তা তুমি কি সুপারভিশানে বেরিয়েছ?

জবাব না দিয়ে সান্ত্বনা তেমনি হালকা করেই পাল্টা প্রশ্ন করল আবার, অবনীবাবু নামে ভদ্রলোকের বাড়ি এখন যাচ্ছেন, আপিস নেই ?

আছে। নরেন ঘটা করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল একটা। দিনটা দেখে ভাবলাম ভদ্রলোকের কন্যার হাতে এক পেয়ালা চা খেয়ে আসি।

হেসে উঠল সান্ত্বনা। বলল, হাতের নাগালে ভুতুবাবুর দোকান ছাড়িয়ে এ পর্যন্ত আসছিলেন চা খেতে ?

যে অবকাশের প্রতীক্ষা মনে মনে, তারই একটা হাতছাড়া হয়ে গেছে। আর কিছু না হোক, শুধু বলতে পারত, ভুতুবাবুর দোকানে ভুতুবাবু আছে, ওই ভদ্রলোকের কন্যাটি নেই বলেই এত পরিশ্রম আর পণ্ডশ্রম।

বলি বলি করেও বলা হ'ল না। সান্ত্বনা তড়বড়িয়ে উঠল, আমি কিন্তু এখন আর ফিরছি না, পাঁচ দিন ঘরে বসে দম বন্ধ, সেই সকাল থেকে বেরুব বেরুব করছি—ভুতুবাবুর দোকানে চলুন আপনাকে চা খাওয়াচ্ছি।

চা আর না হলেও চলে। সানন্দ প্রত্যাবর্তন এবং অবতরণ। সান্ত্বনারও খুশি ধরে না। বলল, চমৎকার দিন করেছে, না ? চলুন মড়াইয়ে নামব, চট করে চা খেয়ে নেবেন, আমি ভুতুবাবুর পাল্লায় পড়ে গেলে ডাকবেন জোর করে। হেসে উঠল।

ভুতুবাবুর দোকানে ঢোকা হ'ল না। চা-প্রার্থীর ভিড় সেখানে। এ আবহাওয়ায় চায়ের অজুহাতে অনেকেই বেরিয়ে এসেছে। ওরা ঢুকতে পারত। আপ্যায়ন করে ভুতুবাবু বসার ব্যবস্থাও করে দিত। কিন্তু অফিস টাইমে স-সঙ্গিনী ওদের মধ্যে গিয়ে ঢোকা পদস্থ অফিসারের সাজে না। সান্ত্বনাও বোঝে, বলে, আপনার কপাল মন্দ আমি কি করব।

জবাব না দিয়ে মন্দ-কপালজনিত মুখখানা করে তুলতে চেষ্টা করে নরেন। লোক না থাকলেও এ সময় ভুতুবাবুর দোকানে গিয়ে ঢুকতে ভালো লাগত না। এগিয়ে চলল। মড়াইয়ে নামাটা অফিসের কাজের অন্তর্গত। নৈতিক না হোক বাহ্যিক কৈফিয়ত আছে।

মড়াইয়ের ধারে এসে সান্ত্বনা চ্যালেঞ্জ করল, নামুন, কে আগে নামতে পারে দেখি।

নরেন দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, দেখ মেয়ে ভালো হবে না, জলে জলে যা হয়ে আছে, পড়লে তখন ?

সে সম্ভাবনা আছে। তবু ছাড়ার পাত্রী নয় সান্ত্বনা। ঠেস দিয়ে বলল, আচ্ছা, ভীতু আপনি, হাত ধরে নামাবো ?

নরেন হাত বাড়িয়ে দিল, ধরো না।

সান্ত্বনার উৎফুল্ল দুই চোখ মুহূর্তের জন্য আটকে গেল তার মুখের ওপর। অননুভূত এক রোমাঞ্চকর স্পর্শের মত লাগল নরেনের। ততক্ষণে দু'চার পা নেমে গেছে সান্ত্বনা। ফিরে দেখল আবার। বলল, তার থেকে হাত-পা না ভেঙে আপনি বরং একটা আছাড় খান, লোকে দেখুক। নামবেন তো নামুন।

মড়াইয়ের সেই একটানা কর্মস্রোত। কিন্তু রোজই নতুন মনে হয় সান্ত্বনার। আজকের দিনটা আরো অদ্ভুত লাগছে। মড়াইয়ের গহ্বরে মেঘলা দিনের সর্বাঙ্গ-জড়ানো ঠাণ্ডা বাতাসের ছড়াছড়ি। আর সান্ত্বনার মন তার থেকেও হালকা।

অনর্গল কথা বলছে। এখানে দাঁড়াচ্ছে, ওটা দেখছে, পাঁচ কথা জিজ্ঞাসা করছে। জবাব পেল কি পেল না খেয়াল নেই, প্রত্যাশাও নেই। মড়াইয়ে নেমেই পাগল সর্দারকে একবার খোঁজা অভ্যাস। কাছে দূরে দু চোখ ঘুরে এলো আজও। দেখতে পেল না। দূরে কোথাও আছে। আজ আর কারো কাছে যাওয়া নয়, কারো কাছে দাঁড়ানো নয়। মড়াইয়ের বাতাসের মতই হালকা হয়ে শুধু ভেসে বেড়ানো।

খেয়াল হতে দেখল, চার্নিং মেসিন চলছে যেখানে সেদিকটায় এগোচ্ছে তারা। ও আর এখন রণবীর ঘোষের আওতা নয়। আর কোনো কন্‌ট্রাক্টারের হাতে গেছে। অদূরে একদল কামিন ঝুড়ি মাথায় পাথরকুচি সরাচ্ছে। এরই মধ্যে এক নজর দেখে নিল সান্ত্বনা। পাঁচমিশালি বয়সের মেয়ে সব। ওদের দিকে চেয়ে চাঁদমণির কথা মনে পড়ে যায় তবু। রণবীর ঘোষের পাশাপাশি ওকে দেখে অমনি দূরে দাঁড়িয়ে মেয়েটা একদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু চোখে ভস্ম করেছিল ওকে। আজ অন্তত এসব আর মনে করতে চায় নি সান্ত্বনা। কিন্তু চাঁদমণি ওর মনে দাগ কেটে আছে। না চাইলেও মনে পড়ে।

ছোট নিঃশ্বাস ফেলে এগিয়ে চলল। পাশের লোকটা কথাবার্তা বিশেষ বলছে না, সেদিকেও খেয়াল নেই খুব।

চার্নিং মেশিন চলছে না এখন। লোকজনও বিশেষ নেই। কনভেয়ারের শেষ মাথায় অনেক উঁচুতে সেই ঘরের মত জায়গাটার দিকে চোখ গেল। ক্রেনে ওঠার সুযোগ না পেলে ওই মইয়ের মত খাড়া সিঁড়ি বেয়েই যেখানে উঠবে একদিন ঠিক করেছিল।

সাগ্রহে বলল, ওখানে উঠি চলুন না?

কোথায় ?

ওই যে উঁচু ঘরের মত—

নরেন বলল, ওখানে উঠতে গেলে পা হড়কে একেবারে বিশ্বরূপ দেখতে হবে।

যেন ছোট মেয়ের এক অসম্ভব আব্দার নাকচ করে দিল এক কথায়। ভুরু কুঁচকে সান্ত্বনা মাটি থেকে কতটা উঁচু হতে পারে এবং ওঠাটা একেবারেই অসম্ভব কি না তাই দেখতে লাগল।

ওদিকে নরেন দেখছে, মড়াই আজ ছোট বড় অনেক অফিসারকেই টেনেছে। অদূরে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার এবং আরও দু'তিনজনের সঙ্গে চোখোচোখি হ'ল। সান্ত্বনাকে বলল, তুমি এখানে দাঁড়াও একটু, এঁরাও সব হাওয়া খেতে নামলেন কি না দেখে আসি।

সান্ত্বনাও এক নজর দেখে নিল তাঁদের। বিশেষ করে ঝরনার বাবাকে। কিন্তু এতদূর থেকে মানুষটাকে দেখা যায় এই পর্যন্ত। পায়ে পায়ে নরেন তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

দশ মিনিটও নয়। ফিরল আবার। কিন্তু এদিক ওদিক চেয়ে সান্ত্বনাকে দেখল না কোথাও। বিস্মিত নেত্রে চারদিকে তাকাতে লাগল সে। মেয়েটা গেল কোথায় !

টুপ করে কাছেই ছোট একটা পড়ল কি। চমকে উঠল নরেন। উপরের দিকে চেয়ে বিমূঢ়। কন্‌ভেয়ারের সেই মাথা থেকে সহাস্যে উঁকি দিচ্ছে সান্ত্বনা।

নরেন ভয়ে দিশেহারা। চিৎকার করে উঠল, ওখানে কি কচ্ছ ?

তেমনি চিৎকার করে জবাব পাঠালো সান্ত্বনা, বিশ্বরূপ দেখছি।

শীগ্‌গির নেমে এসো। যথার্থ রেগে গেছে।

শীগ্‌গির উঠে আসুন। বেপরোয়া জবাব।

কি দস্যি মেয়ে রে বাবা ! তুমি নামবে কি না ?

আপনি উঠবেন কি না ?

হতাশ হয়ে হাল ছাড়ল নরেন। কাঁধের কোটটা আছড়ে মাটিতে ফেলল সে। ভয়ে দুশ্চিন্তায় ঘেমে উঠেছে। কিন্তু চকিতে আরো একটা ভয়ের কথা মনে হ'ল। এই খাড়া সিঁড়ি ধরে ওঠা যত সহজ নামা তত নয়। ওঠার থেকেও নামার সময় বিপদের সম্ভাবনা দ্বিগুণ। ওর কথা শুনে সান্ত্বনা যে নেমে আসতে চেষ্টা করে নি রক্ষা। তাড়াতাড়ি একজন কর্মচারীকে ডেকে নির্দেশ দিল ক্রেন-কেজ

লাগানোর ব্যবস্থা করতে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল তার পর।

ওপর থেকে সান্ত্বনা হাসতে লাগল প্রচুর। এক্ষুনি নামতে হবে, তাড়াতাড়ি চারদিক দেখায় মন দিল সে। দু চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। বিশ্বরূপ না হোক অপরূপ বটেই। অত উঁচু থেকে কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি দেখাচ্ছে এত বড় সৃষ্টি। ওপরে আকাশ। নিচে বিজ্ঞান-পথে যুগ-যুগান্তের সাধনার বিচিত্র রূপ। সেই মহিমার সামনে হঠাৎ যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল সান্ত্বনা।

এত উঁচু থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে কিছু দেখার দিকে খুব মন ছিল না। নইলে দেখত, একটা মেয়ে কোথায় উঠেছে তাই চেয়ে চেয়ে দেখছে নিচের অনেকেই। আর মড়াইয়ের গহ্বরে দাঁড়িয়ে দূর থেকে দেখছে চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলিও। দেখছে না ঠিক, শাড়ির আভাসে বুঝতে পারছে শুধু দুঃসাহসিকাকে।

কোনরকমে ওপরে উঠে জিব বার করে হাঁপাতে লাগল নরেন। তাই দেখে আর একদফা হেসে উঠল সান্ত্বনা। নরেন ধমকে উঠল, থামো। আর হাসতে হবে না, এতটুকু ভয়-ডর নেই তোমার?

অন্য সময় হলে প্রত্যুত্তরে তেমনি করেই কিছু বলত। কিন্তু যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার স্তব্ধতার ঘোর কাটে নি এখনো। নিচের দিকেই চোখ গেল আবার। বলল, এত বড় অভয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজের এক ফোঁটা ভয়ের কথা ভাবতেও লজ্জা।

নরেন হাঁ করে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে। সেটুকু উপলব্ধি করে সান্ত্বনা লজ্জা পেল যেন। বলল, দেখছেন কি?

দেখছি তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু!

হেসে উঠল সান্ত্বনা। দুইই খাসা। চলুন।

ক্রেন-কেজ্ আসতে দেখে আবারও ছেলেমানুষের মতই খুশি হয়ে উঠল সে। ওতে করে নামবে ভাবতেও রোমাঞ্চ। হাত ধরে নরেন কেজ্‌এ ওঠালো তাকে। ক্রেন ঘুরতে লাগল। যেন বাতাস সাঁতরে চলেছে তারা। সান্ত্বনার মনে হ'ল শরীরের রক্ত সব সড়সড়িয়ে পা বেয়ে নামছে।

ছোট কেজ্। ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে নরেন। হাতে হাত লাগছে। কাঁধে কাঁধ ঠেকে যাচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে চপল আনন্দে এটা সেটা জিজ্ঞাসা করছে যখন ওর নিঃশ্বাস এসে লাগছে গালে মুখে।

একটা সবল ইচ্ছাকে দ্বিগুণবলে নরেন ভিতরে ভিতরে নিষ্পেষণ করে রাখল সারাক্ষণ।

কেজ্ ভূমি স্পর্শ করল।

বিফল আরো এক নিবিড় মুহূর্ত।

কেজ্ থেকে মাটিতে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে এক বিপরীত ধাক্কায় স্তব্ধ দুজনেই। হঠাৎ দূরের একদিকে সামাল সামাল রব উঠল একটা। লোকজন যে যার কাজ ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল সেই দিকে। চিৎকার, চেঁচামেচি, হট্টগোল। এত লোক ছড়িয়ে ছিল মড়াইয়ে, এমনিতে বোঝা যায় না। ওপর থেকেও লোক ছুটে আসছে।

সম্বিৎ ফিরতে নরেন আর একটি কথাও না বলে প্রায় দৌড়েই চলল সেদিকে।

সান্ত্বনা সেখানেই দাঁড়িয়ে। মড়াইয়ের এই বিভ্রান্ত ব্যতিব্যস্ততা চেনে। এই কোলাহল জানে।

অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।

সান্ত্বনা আড়ষ্ট। আর্ত আকৃতি। কি হ'ল? কার সর্বনাশ হ'ল? কিন্তু এক পা নড়ার ক্ষমতা নেই। যতবার যত দুর্ঘটনার কথা শুনেছে, একই অবস্থা। চোখে দেখা দূরে থাক, নির্মম কিছু কানে এলেও ভিতরটা ঘুলিয়ে ওঠে থেকে থেকে। কিছু না দেখুক, না জানা বা না শোনা পর্যন্ত শান্তি নেই।

কি হ'ল? কে গেল? ক'জন গেল?

পিলপিল করে লোক জমছে এখনো। মড়াইয়ের ওদিকটা কালো মাথায় কালো হয়ে গেল। তবু লোক আসছে। হট্টগোল বাড়ছে।

দুর্ঘটনার বিবরণ জেনে আবার ফিরেও যাচ্ছে কেউ কেউ। পায়ে পায়ে এগোলো সান্ত্বনা। জনা-দুই লোক ওর সামনাসামনি আসতে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখের দিকে চেয়েই লোক দুটো বুঝল, জানতে চায় কি হয়েছে। তারা জানাল, পাথর চাপা পড়েছে একজন। পেল্লায় পাথর—সঙ্গে সঙ্গে শেষ।

সান্ত্বনার চোখে বোবা ত্রাস, বোবা প্রশ্ন। অর্থাৎ, কে? আমি দেখেছি? আমি চিনি?

—হোপুন। নিজে থেকেই জানাল তারা, জলে জলে ধারের পাথর আল্‌গা হয়েছিল, বোঁকার মত তারই তলার মাটি কাটছিল লোকটা। সবাই বলছে, ইদানীং মাথা ঠিক ছিল না ওর—ওদের বুড়ো সর্দারটা কপাল ঠুকে রক্তারক্তি করছে একেবারে।

ভিড় সরিয়ে, মরণাহত পাথর নড়িয়ে, দলাপাকানো দেহটা সরিয়ে ফেলার পর এক ফাঁকে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে এসে ওই এক কথাই বলল কুলিবাবু।

—নিজের দোষেই গেল স্যার লোকটা, ওই পাথরের নিচে বসেই তলাকার মাটি সরাচ্ছিল…

চুপচাপ দাঁড়িয়ে বাদল গাঙ্গুলি অন্যমনস্কের মত ভাবছিল কিছু। ভাবছিল সেই প্রথম দিনের কথা। বহু স্বজাতি পরিজনের সেই জিঘাংসু বিক্ষোভের জবাবে পাষাণ-গাম্ভীর্যে এই একজনের সামনাসামনি বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানো। সেদিন মড়াই ঘেরা গোটা পাহাড়টার মতই শক্ত নিটোল মনে হয়েছিল ওকে। আজকের এই শেষ দেখলে কে বলবে একখানিও হাড় ছিল ও দেহে।

ছোটখাটো এমন দুর্ঘটনা মড়াইয়ে আরো অনেক ঘটেছে। কাজের তাড়ায় সে বিষণ্ণতা কাটিয়ে ওঠাও শক্ত হয় নি খুব। কিন্তু চারদিকে চেয়ে আজ বাদল গাঙ্গুলির কেমন মনে হ'ল এই একটা অপঘাত অজস্রের উদ্যমকে যেন থেঁতলে দিয়ে গেল। বাদল গাঙ্গুলি নয়, চিফ ইঞ্জিনিয়ার সচেতন হয়ে উঠল তৎক্ষণাৎ। কুলিবাবুকে আদেশ করল, দোষের কথা পরে হবে, জটলা বন্ধ করে ওদের সব কাজে যেতে বলুন, অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, আর এক মিনিটও নয়।

কিন্তু শুনছে কে? কাজ যারা করবে তারা ভ্রূক্ষেপও করল না। বরং ক্ষুব্ধ হ'ল। অসন্তুষ্ট হ'ল। জাতের অর্ধেক লোক মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে। যারা আছে, তারাও জায়গায় জায়গায় গোল হয়ে মূর্তির মত বসে। কুলিবাবুদের মৃদু অনুশাসনে কাউকে নড়ানো গেল না। উল্টে এই সময়ে এভাবে কাজের তাড়া দেওয়াটা প্রায় নির্মম মনে হ'ল ওদের সকলের কাছে।

সান্ত্বনার কাছেও।

অদূরে এসে দাঁড়িয়েছে কখন। আচ্ছন্নতার ঘোর কাটে নি। স্তব্ধ, বিবর্ণ। নিজের অগোচরে দু চোখ খুঁজছে কাকে। খুঁজছে পাগল সর্দারকে। তাকে দেখল না। দেখল এদের। দেখল কলের মানুষ চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে। বেদনা-বিহ্বল মুহূর্তে এ নিষ্প্রাণতা নির্দয় মনে হ'ল শুধু।

চোখে চোখ পড়তে সোজা ফিরে চলল।

দুর্ঘটনার প্রসঙ্গে অবনীবাবু দুঃখ করলেন। নরেনও অনেক কথা বলল। কিন্তু সান্ত্বনার মুখে কথা নেই একটিও। পাগল সর্দারের কাছে যাবে ভেবেছিল। যায় নি। যেতে পারে নি। চাঁদমণির অঘটনের পরে গিয়েছিল। কিন্তু এবারে পারল না। শেষের দিকে সান্ত্বনার মন বিরূপ হয়ে উঠেছিল হোপুনের ওপর। ওর বিসদৃশ আচরণ দেখে ভয় পেয়েছিল। আরো ভয় পাইয়ে দিয়েছিল ভুতুবাবু। কিন্তু…

থমকে গেল। নিজের ভিতরটাই দেখতে চেষ্টা করল যেন। এই কি চেয়েছি?

আর্ত আকুতিতে শিউরে উঠল প্রায়। না, এ সে চায় নি, কোনদিন চায় নি।

পাগল সর্দারের কাছে যেতে পারে নি। কিন্তু মড়াইয়ে এসেছে পর পর দু দিনই।

সর্দার আসে নি। ওর সঙ্গে আরো বিশ-ত্রিশজন আসে নি। কাজ শুরু হয়েছে আবার। সান্ত্বনার মনে হয়েছে এই কালো মানুষদের কাজের মধ্যে যেন প্রাণ নেই আর। চিফ ইঞ্জিনিয়ার এসে তত্ত্বাবধান করে যাচ্ছে, কুলিবাবুরা তাগিদ দিচ্ছে। তাই ওঠা, তাই কাজে লাগা।

তৃতীয় দিন পাগল সর্দার এলো। বাকি সকলেও। ওর আসার সঙ্গে সঙ্গে দলের মধ্যে যেন নতুন করে শোকের ছায়া নামল আবার। কাজে ছেদ পড়ে গেল। যারা কাজে লেগেছিল, কাজ ফেলে তারাও আস্তে আস্তে এসে জড়ো হ'ল।

অদূরে দাঁড়িয়ে চুপচাপ দেখছে সান্ত্বনা। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের অসন্তোষ দেখছে। কুলিবাবুদের তাড়া দেখছে। তারা বলছে, যারা কাজ করবে না তারা বাড়ি যাও, যখন কাজ করবে তখন এসো। এখানে এসে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার অর্থ কী?

সান্ত্বনার ইচ্ছে হ'ল চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে গিয়ে বলে, যে লোকটা গেছে সে ওদের গাঁয়ের মাঝির ছেলে আর পাগল সর্দারের বুকের পাঁজর। ওদের এত বড় শোকে একটু ব্যতিক্রমে ড্যামের কাজের এমন কিছু ক্ষতি হবে না।

কিন্তু ক্ষতি হোক না হোক তাগিদ দিয়ে ফল কিছু হ'ল না। বরং ক্ষোভ বাড়ল ওদের। এক জায়গায় ভিড় না করে বিচ্ছিন্ন ভাবে কাছে দূরে যে যার দাঁড়িয়ে রইল বা বসে রইল চুপচাপ। দূরে একদিকে টহল দিচ্ছে চিফ ইঞ্জিনিয়ার। সঙ্গে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার আছেন, আরো কেউ কেউ আছে। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের চাপা অসহিষ্ণুতা তাঁদের উদ্বেগের কারণ।

পায়ে পায়ে পাগল সর্দারের দিকে এগোলো সান্ত্বনা। এ দু দিনে তার ভিতরেও পরিবর্তন এসেছে একটা। উচ্ছলতার বদলে আবার সেই অন্তর্মুখী মনের গতি। স্থির, শান্ত, পরিণত।

সর্দার ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। পরে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল একেবারে। ওকে আর কখনো কাঁদতে দেখে নি সান্ত্বনা। মেয়ে হারিয়েও না। বোবা পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল।

খানিক বাদে শান্ত হ'ল পাগল সর্দার। উপুড় হয়ে হাঁটুর ওপরের আধখানা কাপড়ে চোখের জল মুছে ফেলল। পরে একটা ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলে বলল, হোপুন চলে গেল দিদিয়া—

সান্ত্বনা বলতে পারল না কিছু। একটা সান্ত্বনার কথাও না। চুপচাপ তার পাশে বসল শুধু। কাছাকাছি যারা ছিল, দূরে সরে গেল আর একটু।

সর্দার আবার বলল, বাবুরা সকলে বলতে লেগেছে, হোপুন বোকা ছেল—পাথরের লিচে বসে মাটি কাটতে যেয়েছিল—কিন্তুক হোপুন মরদ ছেল, কুছুতে তার ডর লাগত না।

আমি জানি সর্দার। একটু থেমে প্রায় মুখোমুখি ঘুরে বসল সান্ত্বনা। কিন্তু তোমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে আছ কেন? কাজ কচ্ছ না কেন?

মুখ দেখেই বোঝা গেল, এই ব্যথার মুহূর্তে ওর মুখে এরকম কথা আশা করে নি সর্দার। মুহূর্তের জন্য তার চোখে যেন অবিশ্বাসের ছায়া নামল একটা। বলল, তু উদের মতন আমাদেরকে কাজের তাড়া দিস না দিদিয়া।

না, ওদের মত দেব না। কিন্তু যে কাজ করতে করতে হোপুন মরে গেল, সেই কাজটাই তোমরা বন্ধ করে বসে আছ?

দিদিয়ার এমন শান্ত কণ্ঠস্বর পাগল সর্দার আর শোনি নি কখনো। কিন্তু আজ তার এই ক্ষতর সঙ্গে খানিকটা খেদও মিশে আছে। জবাব দিল, তুরা ভদ্দজন আছিস দিদিয়া, আমাদিগের দুঃখ তুরা বোঝতে লারবি—এই ড্যাম হবে কিন্তুক হোপুন আর ফিরবে লা—উ চলে গেল—উ মরে গেল— আমাদিগের দুঃখ তুরা বোঝবি লা দিদিয়া।

চুপচাপ অনেকক্ষণ। তার পর তেমনি আস্তে আস্তে সান্ত্বনা বলল আবার, দুঃখ না বুঝলে তোমার কাছে এলাম কি করে সর্দার!···এই তিন দিন তোমরা কাজ বন্ধ করেছ, এই তিনদিনই হোপুন মরে আছে—তোমরা কাজ শুরু করলেই সে বেঁচে উঠবে। এই ড্যাম হয়ে গেলে চিরকাল বাঁচবে হোপুন, কোনদিন মরবে না। গলা ধরে আসছিল সান্ত্বনার। একটা উদ্‌গত অনুভূতি চেপে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। বলল, হোপুনের আগে আরো অনেকে এখানে জীবন দিয়েছে ··হয়তো আরো দেবে, কিন্তু কেউ তারা মরবে না সর্দার, যতকাল এখান দিয়ে জল যাবে ততকাল বাঁচবে তারা। কাজ করো গে যাও সর্দার।

পায় পায় ফিরে চলল সান্ত্বনা। কিন্তু পাগল সর্দার বিহ্বলের মত দেখছে ওকে। দু চোখ টান করে দেখছে। নিজের জরা সরিয়ে আর মর্মচ্ছেদী বেদনা সরিয়ে দেখছে। তার কালো মুখ চকচকে দেখাচ্ছে আবার। নিজের অগোচরেই উঠে দাঁড়াল। তাকালো চারিদিকে।

—আই! হু-ই—কামি চালা কানা!

সমস্ত শক্তি উজাড় করা কণ্ঠস্বর। মড়াইয়ের খোলা বাতাস পর্যন্ত গমগমিয়ে

উঠল যেন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে লাগল কাছের লোক, দূরের লোক, নাজেহাল কুলিবাবুরা। সহকর্মী পরিবৃত বাদল গাঙ্গুলিও।

বিকেল। বাবা ফেরে নি এখনো। একটু বাদেই ফিরবে হয়তো। নরেন বাবুও আসতে পারে। কিন্তু ঘরে আর ভাল লাগছে না। বাইরেও লাগবে না জানে। একটা গুমোট ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছে সান্ত্বনা। অনেকবার। ভাবতে চেষ্টা করেছে। এমন লাগছে কেন? হোপুন মরে গেল তাই? মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়। মনে সারাক্ষণই পড়ছে। কিন্তু দুর্ঘটনার বেদনাই নয়। আরো কিছু। আরো কি।

পিছনের দিকের নতুন পাহাড়ী রাস্তা ধরে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে সান্ত্বনা। দাঁড়িয়ে পড়ল এক জায়গায়। ছ'সাত বছরের একটা পাহাড়ী ছেলে আপন মনে খেলছে বেশ। মস্ত একটা সুপুরির খোলে দড়ি বেঁধে সড়সড় করে টেনে নিয়ে আসছে। মানুষের অভাবে বড় বড় গোটাকতক ইট চাপিয়েছে খোলের মধ্যে।

হঠাৎ এই-ই ভালো লাগল সান্ত্বনার। অন্যমনস্ক হতে চেষ্টা করল ওর সঙ্গে সঙ্গে। সহজ হওয়া বা সহজ কিছু করার তাড়না। সোৎসাহে এগিয়ে গিয়ে বলল, দাঁড়া, আমি টানছি তোকে।

নিজের হাতে ইট ফেলে দিয়ে বলল, নে, বোস্।

দড়ি ধরে টেনে নিয়ে চলল তার পর। ছেলেটা হাসতে লাগল হি হি করে। সান্ত্বনাও হাসছে।

বেশিক্ষণ নয়। অদূরে মানুষটিকে দেখেই হাসি মিলিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে সকৌতুকে দেখছে চেয়ে চেয়ে। বাদল গাঙ্গুলি। কাছাকাছি হতে বলল, দৃশ্যটা ভালই লাগছে দেখতে।

সান্ত্বনা থমথমে গম্ভীর। একে দেখার সঙ্গে সঙ্গে যেন পরিষ্কার হয়ে গেছে কেন বিগত ক'টা দিনের এই অস্থিরতা আর অসহিষ্ণুতা। হোপুনের এই মর্মঘাতী মৃত্যুর স্তব্ধতাকে প্রায় অসম্মান করেছে এই মানুষ—এই কলের মানুষ। ফস করে জবাব দিল, পরিশ্রম সার্থক হ'ল তাহলে!

এগিয়ে চলল। মুহূর্তের জন্য থমকে গেল বাদল গাঙ্গুলি। সঙ্গ নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি বললে?

বললাম, আপনার ভালো লাগছে যখন আমার এ পরিশ্রম সার্থক হ'ল। পিছনে ফিরে তাকিয়ে রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠল, এই ছোঁড়া, অত নড়িস কেন? বসে

থাক না চুপ করে, দেব উল্টে ফেলে !

দেখল আড়চোখে। মানুষটা হাঁ করে চেয়ে আছে মুখের দিকে। কিন্তু আরো কিছু বলতে চায় সান্ত্বনা। আরো কিছু বলতে পেলে মন ঠাণ্ডা হয়। এমন কিছু যাতে লোকটার মনে হয় তাকে গ্রাহ্য করে না ও। ঝাঁজের মাথায় আর কিছু হাতড়ে না পেয়ে তার কথাই টেনে আনল আবার। বলল, আপনার ভালো লাগলে আপনিও গিয়ে ওখানে বসতে পারেন, আমি স্বচ্ছন্দে টানতে পারি।

এইবার হয়েছে খানিকটা। দু'চার পা এগিয়ে গেল সান্ত্বনা।

নিজের অজ্ঞাতে যেন পা ফেলছে বাদল গাঙ্গুলি। বিস্ময়ে, কৌতুকে নির্বাক খানিকক্ষণ। আমি···ওখানে বসব ?

কণ্ঠস্বর বদলে ফেলল সান্ত্বনা। গম্ভীর মুখে জবাব দিল, মুখফসকে বলে ফেলেছি, দয়া করে অপরাধ নেবেন না।

অর্থাৎ আমার যা বলার বলেছি, এবারে আপনি পথ দেখতে পারেন। কিন্তু পথ দেখার বদলে ওকেই দেখছে বাদল গাঙ্গুলি। নারী-রোষের মহিমা দেখছে। বিব্রত মুখে হাসল একটু, কি ব্যাপার ?

জবাব না দিয়ে সান্ত্বনা এগোতে লাগল। সুপুরির খোলে বাঁধা দড়িটা দু হাতে পিছনে ধরা। সড়-সড় সড়-সড় শব্দ হচ্ছে। ছেলেটা বসে আছে ধ্যান-গম্ভীর মুখে। ঢালু পথ, টানতে কষ্ট নেই। আর টানছে যে খেয়ালও নেই বোধ হয়। লোকটার মুখে হাসির আভাস দেখে উষ্ণ হয়ে উঠেছে আবার।

একটু অপেক্ষা করে বাদল গাঙ্গুলি অন্য প্রসঙ্গ তুলল। যাক, তোমাকে একটা কথা বলব ভেবেছিলাম। সেদিন মড়াইয়ে ওই এলিভেটারের ওপরে গিয়ে উঠেছিলে কেন ?

ঈষৎ রুক্ষ কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করল, অন্যায় হয়েছে ?

হয়েছে। বিপদ হতে পারত।

কি বিপদ ?

ওখান থেকে পড়লে তোমার আর চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যেত না।

এরকম সুযোগই চাইছিল সান্ত্বনা। প্রচ্ছন্ন শ্লেষে জবাব দিল তৎক্ষণাৎ, না গেলেই বা। ওর একটু পরেই তো পড়েছিল আর একজন, তারও আর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না—কিন্তু কার কতটুকু ক্ষতি হ'ল তাতে ? অন্তত আপনার মনে কতটুকু দাগ পড়ল তার জন্যে ?

বীতরাগের হেতু স্পষ্ট হ'ল এতক্ষণে। মড়াইয়ে বিগত তিন দিনের

ঘটনাবলী মনে পড়ল। বিশেষ করে আজকের দুপুরের ব্যাপারটা। হাসতে লাগল অল্প অল্প।—এই ব্যাপার!···তোমাকে আজ ওই সর্দার লোকটার কাছে বসে থাকতে দেখেছিলাম বটে, কি যেন বলছিলে···কি বলছিলে?

বলছিলাম, তোমার লোক মরেছে তাতে কি হয়েছে, তাকে তো সরিয়েই ফেলা হয়েছে চোখের সামনে থেকে—এখন বড় সাহেবের মেজাজ গরম হবার আগে তাড়াতাড়ি সব কাজে লাগো গে যাও।

যাই বলুক, সদলবলে সর্দার কাজে লেগেছে, নিজের চোখে দেখেছে। বাদল গাঙ্গুলি মৃদু মৃদু হাসছে তেমনি। ঘাড় ফিরিয়ে সকৌতুকে তাকালো দুই এক বার, দেখল। পরে বলল, বুঝলাম।

রাস্তার ওপর আড়াআড়ি বড় একটা শুকনো গাছের ডাল পড়ে আছে। খেয়াল না করেই সান্ত্বনা পেরিয়ে গেল সেটা। বাদল গাঙ্গুলিও। দড়ি বাঁধা সুপুরির খোল আটকে যেতে ছেলেটা কাত হয়ে পড়ল। দুজনেই ওরা ঘুরে দাঁড়াল। ছেলেটার হাতে লাগল বোধ হয় একটু, হাত ঘষতে ঘষতে সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল তার সারথির দিকে। সান্ত্বনা অপ্রস্তুতের একশেষ। কিন্তু ছেলেটাকে ধরার অবকাশ পেল না, তার আগেই ছুটে পালালো সে।

বাদল গাঙ্গুলির মজা লাগছে বেশ। নিঃশব্দ দৃষ্টি-বিনিময়। শুকনো ডালটা সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে দিল। দু'চার হাত টেনেই দড়িটা হাত থেকে ফেলে দিল সান্ত্বনা।

দেখলে?

মুখ তুলে সান্ত্বনা তাকালো শুধু।

ওই শুকনো ডালটা পথ আটকে ছিল!

তাতে কী?

বলছিলাম, এখন ওটা শুধু একটা বিঘ্ন ছাড়া আর কিছু নয়।

ঈষৎ উত্তপ্ত কণ্ঠে সান্ত্বনা বলে উঠল, তা বলে মানুষও তাই?

মানুষের শোকটাকে যদি অমনি করে চোখের সামনে ফেলে রেখে দিই, তাহলে তাই।

সক্ষোভে প্রতিবাদ করে উঠল সান্ত্বনা, লোকটা মাটিকাটা কুলি-মজুর বলেই ওরকম বলছেন, ভদ্রলোক হলে বলতেন না।

দু'চার পা চুপচাপ অগ্রসর হয়ে বাদল গাঙ্গুলি এবারে শান্তমুখে জবাব দিল, আমি নিজে হলেও বলতাম। ওই লোকটার মত আজ যদি আমিও অমনি থেমে যাই, একবারও চাইব না সকলে মিলে আমায় নিয়ে একটা শোকের

দেয়াল গড়ে তুলুক।···গাছটা হাতে করে সরিয়ে দিলাম, কিন্তু শোকটাকে তো আর হাতে করে সরিয়ে ফেলা যায় না—যায় কাজে ডুবে থেকে। কিন্তু তোমার সর্দার সেটা বুঝবে কি করে বলো, বোঝে না বলেই এ সময় কাজের তাগিদটাকে এত নির্মম বলে মনে করে। হাসল একটু, কিন্তু তুমিও তো দেখছি তার দলেই!

ফিরে ফিরে দেখছিল সান্ত্বনা। মনের সেই গুমোট চাপ এবারে যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। হালকা লাগছে, ভালো লাগছে, আর ফাঁক বুঝে এবারে রাজ্যের লজ্জা যেন চড়াও করছে ওকে।

একটু এগিয়েই রাস্তাটা যেন কোয়ার্টারস্-এর দিকে ঘুরে গেছে, দুজনেই দাঁড়াল তারা। মুখ তুলে সান্ত্বনা হেসেই ফেলল। বলল, আমার মাথাও ওই সর্দারের থেকে বেশি উর্বর নয়।

নিজের কথাগুলো নিজের কাছেই ভালো লাগছিল বাদল গাঙ্গুলির। মেজাজ প্রসন্ন আরো। বলল, রাগটা একটু পড়েছে দেখছি, যা বলছিলাম শোনো তাহলে—ওই ওসব জায়গায় আর কক্ষনো উঠবে না।

শেষের ছদ্ম অনুশাসনের জবাবে পাল্টা প্রশ্ন করল সান্ত্বনা, উঠলে কি করবেন?

ফের উঠলে এই ড্যামে আসাই বন্ধ করে দেব।

সান্ত্বনাও তেমনি জবাব দিল, এই ড্যাম করা ছেড়ে আপনাকে দিনরাত তাহলে আমাকেই পাহারা দিতে হচ্ছে।

বলেই অস্বস্তির একশেষ। ভদ্রলোকের হাসিভরা দুই চোখ যেন ওর মুখের ওপর আটকে আছে। সহজ কথার জবাবে সহজ কিছু বলার ঝোঁকেই বলা। অতশত ভেবে বলে নি। কিন্তু শুনেই মানুষটা দু চোখে পাহারার কাজ শুরু করেছে প্রায়।

আসন্ন সন্ধ্যার নজিরে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে বাঁচল। আকাশের দিকে একবার চেয়ে কোন কথা না বলে চপল পায়ে সোজা বাড়ির পথ ধরল সে।

যতক্ষণ দেখা গেল ওকে, দেখল বাদল গাঙ্গুলি। তার পর গন্তব্য পথ ধরল সেও।

অনেকটা এগিয়ে সান্ত্বনা পিছন ফিরে তাকালো একবার। ধীরে সুস্থে এগোতে লাগল তার পর। কিন্তু খুব সচেতন মনে নয়।···ভাবছে আর লজ্জা পাচ্ছে। কিন্তু আরো বেশি লজ্জা পাচ্ছে আর কিছু ভেবে। হোপুনের অমন আকস্মিক মৃত্যু মনে দাগ কেটে বসার মতই। কিন্তু সেই মৃত্যুর বেদনা ছাড়াও সান্ত্বনা আর এক অসহিষ্ণু ক্ষোভে এমন করে কাটালো কেন এ ক'দিন?

কাটালো চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সেই যান্ত্রিক কর্তব্যপরায়ণতা বরদাস্ত করতে পারছিল না বলে, সেই নিষ্প্রাণ রূঢ়তা অসহ্য হয়েছিল বলে ?

…চিফ ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে আর কেউ হলে এমন হ'ত ?

সলাজ বিড়ম্বনায় ভ্রূকুটি করে উঠল মনে মনে, হ'তই তো।

কিন্তু ভিতরে কেউ বলছে, হ'ত না।

মেজাজ আজ অন্তত মোটেই প্রসন্ন থাকাব কথা নয় চিফ ইঞ্জিনিয়ারের। ছিলও না। দুপুবে মড়াই থেকে উঠে অফিসে এসেই হেড অফিসের চিঠি পেয়েছে। এক্সপার্ট কমিটি আসার দিনক্ষণের নির্দেশ। মাঝে দিন পনের বাকী।

এক্সপার্ট কমিটি ড্যামেব গঠন পরিদর্শন করবেন। আলাপ আলোচনা করবেন। মতামত জানাবেন। আর, ঘোষ-চাকলাদারের সিমেণ্ট সংক্রান্ত গোলযোগের ব্যাপারটারও নিষ্পত্তি কবে যাবেন।

সরকারী কাজে এই পরিদর্শন-নীতি জানা আছে। কিন্তু আনঅফিসিয়াল এক্সপার্ট কমিটির হাতে এই শেষেব দায়িত্ব অর্পণ মনঃপূত নয়। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সততা এবং কর্তব্যপরায়ণতা ডিপার্টমেণ্টই ভালো জানে। বাইরের কারো জানার কথা নয়। আর, এজন্য এক্সপার্ট ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যস্থতা নিষ্প্রয়োজন।

যাই হোক, ও গোলযোগের মুখোমুখি দাঁড়ানো আছেই একদিন, জানে। নরেনের সঙ্গে দেখা হলে তাকে বলেছিল, বিকেলে বাড়ি আসতে, পরামর্শ আছে।

কিন্তু একেবারে ভুলে গেল।

সচরাচর হয় না এমন ভুল। নিজের কোয়ার্টারের দিকে পা চালিয়েও ঠিক মনে পড়ে নি। আপন মনে হাসছে তখনো। রোমন্থন করছে কিছু। মিষ্টি কিছু। আগে এ রকম বিস্মৃতির আভাস মাত্রে চোখ রাঙিয়ে সচেতন করেছে নিজেকে। সেই নারীবিদ্বেষী বিবরাশ্রয়ীদের শেকল খুলে দিয়েছে। অসহিষ্ণু রোষে মুহূর্তে প্রশ্রয়ের দূতকে ছিন্নভিন্ন করেছে তারা। কিন্তু এই এক মেয়ের কাছে ওরা হার মেনেছে। আলোর ঘায়ে হার মানা কীটের মত অগোচরে আশ্রয় নিয়েছে।…কবে, চিফ ইঞ্জিনিয়ার নিজেও জানে না।

চলতে চলতে একটা বিষয়ান্তর কথা ভাবছিল বাদল গাঙ্গুলি। প্রায় ছেলে-মানুষের মতই ভাবছিল, এই মেয়েটিকে ওর মা দেখলে ভারি খুশি হ'ত।…

অকারণেই এইবার নরেনের কথা মনে হ'ল কেমন। ওর সঙ্গে ওই বাপ-

মেয়ের ঘনিষ্ঠতার কথা। এ সবে কৌতূহল প্রকাশ করে নি কখনো। তবু জানে।···কিন্তু এতদিনেও কোন সম্ভাবনার আভাস পর্যন্ত পেল না কেন? ভুরু কুঁচকে ভাবতে ভাবতে চলল। বোধ হয় সেটা সম্ভব নয়। সামাজিকতার বাধা আছে হয়তো। এমন কিছু অতি আধুনিক মানুষ নন অবনী রায়।

নরেনের কথা মনে হতে খেয়াল হ'ল বিকেলে ওকে আসতে বলেছিল। এতক্ষণে এসে বসে আছে হয়তো। তাড়াতাড়ি পা চালালো।

নরেন অপেক্ষা করছিল ঠিকই। গোটা দুই সিগারেট শেষ করে কানকাঠি নিয়ে পড়েছে। প্রতীক্ষা ভালো লাগছে না খুব। এই সময়ে ঠিক এইখানে বসে থাকার কথা নয় তার।

বাদল গাঙ্গুলি ঘরে ঢুকে বলল, অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি তো?

একটা চেয়ার টেনে বসল সামনে। হাসির আভাস। কানকাঠি কিছুটা দুর্গমে ঠেলে দিয়েছিল নরেন চৌধুরী। সেটা নিরাপদে ফিরিয়ে এনে তাকালো তার দিকে।—এত দেরি যে?

তোমার প্রিয় বান্ধবীর জন্যে। প্রসন্ন হাস্যে জবাব দিল, ভয়ানক রাগ আমার ওপর—তুমি বসে আছ ভুলেই গেছি।

চুপচাপ নরেন যেন কান সুড়সুড়ির আমেজ উপভোগ করে নিল একটু।—রাগ কেন?

আমি একটি অত্যাচারী পাষণ্ড, তাই। লোকের জন্য কোন মায়া-মমতা নেই, কুলি-মজুররা মরে গেলেও কাজ আদায় করে নিই—

নরেন অবাক।—বলল একথা?

প্রায়—। উৎফুল্ল মুখে হেসে উঠল বাদল গাঙ্গুলি। মেয়েটি সত্যি ভালো হে, শেষে রাগ পড়লে লজ্জায় একাকার।

মুখ টিপে হাসছে নরেনও। বাহ্যিক মনোযোগ কানকাঠির দিকেই বেশি।···এরকম নির্মেঘ সজীবতা আগে আর কবে দেখেছে? অনেক দেখেছে। কলকাতার নেশান বিলডার্স লিমিটেড-এ দেখেছে। এর থেকে অনেক বেশি দেখেছে। তবে নেশান বিলডার্স ছেড়ে আসার পর আর দেখে নি। কানকাঠি পকেটে ফেলে সোজা হয়ে বসল।—সান্ত্বনাকে তোমার কমপ্লিমেন্টটা জানিয়ে দেব'খন—আরো খুশি হবে আর আরো লজ্জা পাবে। যাক, এখন এদিকের খবর কি বলো!

বস্তরাজ্যে ফিরে এলো বাদল গাঙ্গুলি। পকেট থেকে চিঠিটা বার করে সামনে রাখল।···দিন পনেরোর মধ্যেই আসছেন মহারথীরা···কে কে আসছে

লেখে নি।

আসবে তো জানা কথাই।

কি করা যায় ভাবছি।

সিমেণ্ট কেস্‌এর ?

হুঁ।

এ ব্যাপারে তাদের মতলবটা কি না জানলে আগের থেকে তুমি ভেবে কি করবে ?

মতলব কিছুটা বোঝা যাচ্ছে।

একটু চুপ করে থেকে নরেন বলল, গেলেও তোমার ভাবনার কিছু দেখিনে। ঘোষ-চাকলাদারের দুর্ভোগ যা হবার যথেষ্ট হয়েছে। মাসের পর মাস লোকসান খেয়েছে, অপদস্থ হয়েছে, ঘুষ দিতে এসে নাজেহাল হয়েছে, তার পর আসল দোষী যে সেও সরে গেছে এখান থেকে—এর পরেও ভাবা যখন স্বভাব তোমার, ভাবো বসে বসে, কি আর করবে।

পরামর্শের জন্য ডেকেছিল, কিন্তু এ রকম নির্বিকার পরামর্শ বাদল গাঙ্গুলি আশা করে নি। তবু হেসেই ফেলল সেও। বলল, তোমার উপদেশ মনে রাখতে চেষ্টা করব।

এক্সপার্ট কমিটি আসার প্রতিলিপি পেয়েছে ঘোষ-চাকলাদার ফার্মের দ্বিজেন চাকলাদারও। কারণ, এই পরিদর্শনের সঙ্গে সিমেণ্ট কেসও জড়িত। খুশি এবং আশান্বিত হবার কথা।

কিন্তু কর্মজীবনে দ্বিজেন চাকলাদার এত অসহায় আর কখনো বোধ করেনি।

তিন মাস হতে চলল পার্টনার নিরুদ্দেশ। রণবীর ঘোষের খবর-বার্তা দ্বিজেন চাকলাদারও যথার্থই জানে না। এই তিন মাসে ক্রমাগত কলকাতা এবং মড়াইয়ে ছোটাছুটি করে কালঘাম ছুটেছে। মড়াইয়ের কাজ শেষ হলে রণবীর ঘোষের সঙ্গেও সম্পর্ক বরাবরকার মতই শেষ করে দেবে, জানা কথাই। অনেক হয়েছে, আর নয়। কিন্তু সদ্য বর্তমানকে সামাল দেবে কি করে ভেবে পাচ্ছে না।

নারী-ঘটিত ব্যাপারে তার দু'দশ দিন ডুব মেরে থাকাটা নতুন নয়। আগেও এরকম করেছে অনেকবার। ওই সর্দারের মেয়েটাকে সরানোর পরেই তো নিখোঁজ হয়েছিল পনের দিন। কিন্তু তিন মাস অভাবনীয়…। বিশেষ করে এই সংকটের সময়। এখান থেকে সে যাবার আগেই হাবভাব

দেখে বুঝেছিল, কিছু একটা মতলব ফাঁদছে। সে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের এই মেয়েটির জন্যে, সঠিক বোঝে নি। এর পর মড়াইয়ে আসা সম্ভব নয় তার পক্ষে ঠিকই। এমন কি কলকাতাতেও কিছু দিন তার গা-ঢাকা দিয়ে থাকারই কথা। কিন্তু তিন মাসের মধ্যে তাকেও একটা খবর পর্যন্ত দেবে না, এমন দায়িত্বজ্ঞানশূন্যতা ভাবা যায় না। ওই মেয়েটাই উল্টে জাদু করল নাকি শেষ পর্যন্ত।

রাগে আর দুশ্চিন্তায় জ্বলছে দ্বিজেন চাকলাদার। মনে মনে বুঝেছে হাতের টাকা নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত রণবীর ঘোষের আর টিকি দেখা যাবে না। চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে ঘুষ দেবার জন্য আনা সেই তিরিশ হাজার টাকা তার হেপাজতেই ছিল। লোকটা অপচয় করত, কিন্তু টাকা-পয়সার গরমিল করত না কখনো। তাই এদিকটা ভাবে নি দ্বিজেন চাকলাদার। মাত্র তিরিশ হাজার নিয়ে সরে আজও পড়বে না। শেষ করে তবে আসবে।

কিন্তু দু'চার দিনের মধ্যেই ছোট মড়াইয়ে আর একটা খবর ছড়ালো।

আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ল দ্বিজেন চাকলাদারের।

খবরটা মহসেমারোহে রাষ্ট্র করলেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের গৃহিণী মিসেস চ্যাটার্জী। ঝরনার মা।

মায়ের ওপর মেয়ের রাগ পড়েছে এতদিনে। চিঠি লিখেছে।

কোথা থেকে ?

—আর বলো কেন কাণ্ড! যেখানে যাচ্ছেন আনন্দে আর গর্বে ডগমগিয়ে উঠছেন মহিলা।—একেবারে সেই বিলেত থেকে—লণ্ডন থেকে! বিয়ে? ও মা, বিয়ে করেই তো গেছে! জামাই মস্ত বিদ্বান,—এখানে অবশ্য চাকরিটা তেমন ভালো করত না, কলেজে প্রোফেসারি করত একটা। কিন্তু অত বিদ্বান ক'দিন আর ছাইচাপা থাকবে? যারা কদর বোঝে, তারাই ডেকে নিয়ে চাকরি দিয়েছে। শুধু তাই! মেয়েটা পর্যন্ত সেখানে কি একটা চাকরিতে লেগে গেছে। তাদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা।

আনন্দে গর্বে মিসেস চ্যাটার্জী হেসে কেঁদে সারা। চেনা মুখ মাত্রেই সবিস্তারে সুখবর জানিয়ে দিলেন। স্বামীর ওপর হুকুমজারী হ'ল, অফিসসুদ্ধ লোক যেন অবিলম্বে জানতে পারে খবরটা। শুধু তাই কেন, বেশ ভালো করে একটা পার্টিও তো দিতে হবে সকলকে!

মনে মনে বিশ্বাস করল না শুধু দুজন। ঝরনার বিলেত যাওয়াটা নয়, প্রোফেসরকে বিয়ে করাটা।

একজন ভুতুবাবু। অন্যজন দ্বিজেন চাকলাদার।

ভুতুবাবু হাসল মনে মনে। আর দ্বিজেন চাকলাদার ব্যবসা-সংশ্লিষ্ট সব কটা ব্যাঙ্কে নোটিশ দিল, একলার দস্তখতে রণবীর ঘোষ আর যেন এক পয়সাও না তুলতে পারে। অথবা, তার নির্দেশ ছাড়া কোথাও যেন তাকে টাকা না পাঠানো হয়। রণবীর ঘোষ শেষ কত টাকা তুলেছে না-তুলেছে, তারও হিসেব চেয়ে পাঠালো সে।··বিলেত যদি গিয়েই থাকে, তিরিশ হাজার টাকা দুজনের পক্ষে বেশি দিন নয় খুব। ক্ষতি যা হয়েছে, হয়েছে—দ্বিজেন চাকলাদার এবারে ভালো হাতে শিক্ষা দেবে তাকে।

মড়াইয়ের আকাশে এমন ঘনঘটা এর আগে আর দেখে নি কেউ। কটা দিনের জন্য মাত্র বর্ষণে ছেদ পড়েছিল একটু। আকাশ আজ যেন এক অদ্ভুত কালোর ষড়যন্ত্রে মেতেছে।

মিসেস চ্যাটার্জী অর্থাৎ ঝরনার মায়ের সঙ্গে আজ আবার দেখা হয়েছিল সান্ত্বনার। ভিন্ন মূর্তি মহিলার। মেদবহুল দেহে অত আনন্দোত্তেজনা যেন ধরে না। ওকে ধরে-বেঁধে ঝাড়া একঘণ্টা মেয়ের সমাচার শুনিয়েছেন। এই মেয়েটার কাছেই নিজের মেয়ের সম্বন্ধে মস্ত দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলেছিলেন একদিন। এটা তারই জের, সান্ত্বনা বোঝে।

আকাশের অবস্থা দেখিয়ে কোন রকমে ছাড়ান পেয়ে এসেছে। শুধু সান্ত্বনা নয়, ঘরমুখী হয়েছে সবাই। অল্প অল্প বাতাস বইছে। গুড়-গুড় মেঘ ডাকছে জলদগম্ভীর। মেঘের কালো সমস্ত দিনের আলো টেনে নিচ্ছে, শুষে নিচ্ছে যেন।

কিন্তু এরই মধ্যে ওই মহিলার কথা ভাবতে ভাবতেই বাড়ির দিকে চলেছে সান্ত্বনা। খবরটা রাষ্ট্র হওয়ার পরে ভুতুবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওর। ভুতু-বাবুর সবজান্তা হাসি ভালো লাগে নি সেদিন। আকারে প্রকারে যা বলেছে তাও না। গলা নিচু করে বলেছে, বিলেত যাওয়া আজকাল আর শক্ত কি মা-লক্ষ্মী—গেলেই হ'ল।—তবে কার সঙ্গে গেছেন সেটাই কথা।···অমনি একবার গিয়েছিলাম ঘোষবাবুর পার্টনার দ্বিজুবাবুর কাছে—ওই দ্বিজেন চাকলাদার মা-লক্ষ্মী। ভদ্রলোক স্নেহ করেন একটু-আধটু···শুনলাম যা, তাতে তো ভুতুর চক্ষুস্থির!

চক্ষুদ্বয় খানিক স্থির করে সেটা দেখাল ভুতুবাবু। পরে খদ্দেরের সাড়া পেয়ে উপসংহার টেনে দিল চট করে।—তা গেছে যখন গেছেই, যার সঙ্গে যাক্ ভালো

থাকলেই ভালো, কি বলেন মা-লক্ষ্মী? আমাদের অতশত খোঁজে কাজ কি—

মহিলার সকল দোষ সকল অপ্রিয় আড়ম্বর মন থেকে মুছে গেছে সান্ত্বনার। আ-হা, যা ভাবছেন মহিলা, তাই যেন সত্যি হয়। ওঁর এত আনন্দ এত আশা আবার যেন ব্যর্থ হয়ে না যায়। ভুতুবাবুর কথা মিথ্যে হোক, মিথ্যে হোক, মিথ্যে হোক।

বাড়ি ফিরতে হাঁপ ফেলে বাঁচলেন অবনীবাবু। বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বকাবকি করলেন একপ্রস্থ—এ ঝড় যদি এসে যেত কি হ'ত! কাকপক্ষী বাইরে নেই, অথচ মেয়ের যদি হুঁশ থাকত একটুও!

কিন্তু ঝড় এলো আরো ঘণ্টাখানেক বাদে। এই এক ঘণ্টা জানালার কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা। দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মেঘের নিচে মেঘ এসে জমছে, তার নিচে আবাব। মাঝে মাঝে শুধু সেই জলদ গুড়-গুড় শব্দ একটা। ভয়াল ভয়ঙ্কর, বিরাটের রুদ্র সুন্দর মহিমা। ওই পাহাড়, ওই মাটি, ওই গাছপালা, ওই বাতাস—সব এক মহারুদ্রের বেদনাতুর প্রতীক্ষায় স্তব্ধ, সমাহিত।

সান্ত্বনাও।

ঝড় এলো। ঝড় নয়, প্রলয়। কল্পান্ত।

জানালা বন্ধ করে ঘরের দরজার একটুখানি খুলে বারান্দার ওদিকের দেয়াল ছাড়িয়ে সেই ক্ষমাহীন লীলার দিকে চেয়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল। ঝড়ের ঝাপ্‌টায় দরজা আঁকড়ে আছে, জলের কণা ছুঁচের মত বিঁধছে মুখে। হুঁশ নেই সান্ত্বনার।

মড়াই বন্ধনের অন্তিম বিদ্রোহ? পাহাড় ভেঙে পড়বে? প্রকৃতি লণ্ড-ভণ্ড করে দেবে তার আপন সৃষ্টি?…প্রাণের পরে আজ যেন তার অন্ধ ঈর্ষা। তবু অপরূপ। সমস্ত আকাশে বুঝি অজস্র সিংহের মাতামাতি হানাহানি। তবু অপরূপ। আলুথালু হতাশ বনস্পতি পড়ছে মুখ থুবড়ে। তবু অপরূপ।

দরজা ধরে ঠক ঠক করে কাঁপছে সান্ত্বনা। ভয়ে নয়, ওই বিরাটের স্পর্শে। ওই অপরূপের স্পর্শে। স্রস্ত বসন, জলকণায় সর্বাঙ্গ ভিজে, খোলা চুল উড়ছে। দুনিয়া ঝলসানো বাজ পড়ল একটা কড়কড় করে। দরজা আঁকড়ে তবু দাঁড়িয়েই আছে তেমনি। নির্বাক, নিষ্পলক, বোবা। কিন্তু ওর ভিতরে বলছে কেউ। বলছে কিছু। আর কাঁপছে থরথর।—থামো, থামো, থামো। আর দেখিও না, আর দেখিও না। আর দেখতে পারিনে। আর সইতে

পারিনে। ওই সর্বগ্রাসী বিরাটের মুখোমুখি আর দাঁড়াতে পারিনে! এবারে শান্ত হও। এবারে প্রসন্ন হও। এবারে সুন্দর হও। শান্তি, শান্তি, শান্তি, শান্তি, শান্তি, শান্তি···দু চোখ বুজে এলো সান্ত্বনার। নিস্পন্দ, বিহ্বল।

—তেরো—

শোকের বাড়ি থেকে শবদেহ অপসারণের পরেও যেমন মৃত্যুর চিহ্ন ছড়িয়ে থাকে, ঝড়ের পরে গোটা মড়াইয়ের সেই অবস্থা। সমস্ত প্রাকৃতিক স্থাবরতার একেবারে গোড়ায় পড়েছে যেন। পাথরে আর গাছপালায় মড়াই ছেয়ে গেছে। রাস্তার অবস্থাও তাই। এতদিনের ওপারের কুলি-বসতির পাকা ব্যবস্থা সত্ত্বেও যে কটা তাঁবু ছিল, মাটি নিয়েছে। তবে লোকক্ষয়ের খবর কিছু কানে আসে নি। সময়ে নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে উঠে থাকবে। সাময়িক অবরোধের ওধারে মড়াইয়ের লাল জলে গৃহস্থের আটচালা ভাসছে অনেকগুলো। আর গাছের ভাঙা ডাল। মড়াইয়ের গৈরিক-যৌবনে যেন কলঙ্ক লেগেছে।

সম্পূর্ণ দিন কেটে গেল রাস্তা পরিষ্কার করে, মড়াইয়ের গহ্বর থেকে পাথর আর গাছপালা সরিয়ে মোটামুটি কাজের ব্যবস্থায় ফিরে আসতে। তার পরের দিন বিধাতা যেন কৃপণ হাতে আলোও পাঠালেন একটু, মিষ্টি রোদ চিকচিকিয়ে উঠল। সকাল থেকে কাজের তাড়া লাগল মড়াইয়ে।

তার পরই অপ্রত্যাশিত আলোড়ন আবার একটা!

দূর থেকে, ওই দূর থেকে খবরটা কানাকানি হয়ে এদিকে পাগল সর্দারের কাছ পর্যন্ত পৌঁছুতে সময় লাগল না খুব। কোদাল শাবল গাঁইতি ফেলে পায়ে পায়ে লোক চলল সেদিকে। ওই দূরে, যেদিকে পাহাড় ঘেঁষে মড়াই বেঁকে গেছে সম্পূর্ণ, যেদিকে আকাশে শকুনি উড়ছে অনেকগুলো, সেদিকে। কৌতূহল, চাপা উত্তেজনা। ক্রমশঃ বাড়তে লাগল সেটা। কাজ শুরু হবার আগেই কাজে ছেদ পড়ল আবার।

আর উত্তেজনায় একেবারে বসে পড়েছে পাগল সর্দার। স্বজাতীয়দের অনেকে দৌড়ে এসেছে ওর কাছে। নিজেদের ভাষায় বলাবলি করেছে কি। তার পর আবার ছুটেছে।

আনন্দে গড়াগড়ি করতে ইচ্ছে যাচ্ছে পাগল সর্দারের। ঠিকমত চেনা যাচ্ছে না বলে খটকা লাগছে ওদের মনে? কিন্তু না দেখেও এতটুকু সংশয় নেই পাগল সর্দারের। সে নিঃসন্দেহে বলে দিতে পারে লোকটা কে। বলে

দিতে পারে ঝড়ে পাথর নড়ে কার বিকৃত শব মড়াইয়ে গড়িয়েছে! শব নয় ঠিক, শব হলে সকলে চিনতে পারত। কঙ্কালে পরিণত হয়েছে প্রায়। কিন্তু পাগল সর্দার ঠিক বুঝেছে। না দেখেও চিনেছে। তোরাও চিনবি। হাতে হীরের আঙটি নেই দুটো? পোশাক-আশাকের চিহ্ন নেই? নীল চশমা? পাহাড়ে উঠে খোঁজ করগে যা, যেখান থেকে গড়িয়েছে ওটা, সেই জায়গাটা খুঁজে বার করগে যা—ঠিক মিলবে কিছু, তোরাও চিনবি ঠিক!

এসব খবর বাতাসে ছড়ায়। কর্মকর্তারাও সবাই গুরুগম্ভীর মুখে চলেছেন সেদিকে। এমন কি দোকান ফেলে আজ ভুতুবাবুও নেমে এসেছে। থেকে থেকে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে ভুতুবাবুর। গোল চোখ স্থির হয়ে আসছে এক একবার। সেই এক সকালে কেন জলে থৈ-থৈ করছিল সমস্ত ঘর এখন আর সেটা বুঝতে না চাইলেও বুঝতে পারছে। যত পারছে ততো গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

পাগল সর্দার দেখছে সকলকে। যারাই যাচ্ছে ওদিকে, চেয়ে চেয়ে দেখছে তাদের।—দেখগে যাও, বেশ ভালো করে দেখে নাওগে যাও। তার কালো মুখে গলগলিয়ে হাসি উপছে উঠছে।

সান্ত্বনাকে দেখে আনন্দে একেবারে যেন অধীর হয়ে উঠল সে।—দিদিয়া! আঁই রে দিদিয়া! উদিন তুকে বলি নাই হোপুন মরদ ছেলে? আখুন দেখে লে রে দিদিয়া, আখুন দেখে লে!

স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলে নি। যেটুকু ছড়িয়েছে আভাসে ইঙ্গিতে। সান্ত্বনার কানে গেছে, কিন্তু মাথায় ঠিকমত ঢোকে নি যেন। এখনো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল সর্দারের মুখের দিকে। কিন্তু আজ এই প্রথম এত হাসি এত আনন্দের মধ্যেও সর্দারের মূর্তিটা কেমন যেন কুৎসিত ঠেকল ওর চোখে।

পারলে ধেই ধেই করে নাচত সর্দার। অনর্গল কত কথা বলল, কত কি বলল ঠিক নেই। সবই হোপুনের প্রশস্তি। ও একটু থামলেই সান্ত্বনা বাড়ি ফিরবে ভাবছিল।

কিন্তু এরই মধ্যে আবার একটা বিশেষ উত্তেজনা দেখা গেল লোকজনের ছুটোছুটি আনাগোনায়।

আবার এক চমকপ্রদ চাঞ্চল্য। আবার এক হাড়-কাঁপানো খবর।

লোকজন পাহাড়ে উঠেছিল মৃতের চিহ্ন খুঁজতে। বেশি খুঁজতে হয় নি। পেয়েছে। সেই সঙ্গে আর একটা ভয়াবহ আবিষ্কারে স্তব্ধ সকলে।

আর একটা কঙ্কাল। এটা সম্পূর্ণই কঙ্কাল।

কিন্তু পুরুষের নয়। নারীর। রূপোর গয়না আটকে আছে কিছু, পাশেও পড়ে আছে দু'চারখানা।

কখন, কেমন করে বাড়ি ফিরেছে সান্ত্বনা খেয়াল নেই। কেমন করেই বা সর্দারকেও নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে এত পথ হেঁটে জানে না। এক সময়ে সর্দারের হাত ধরে টেনেছিল মনে আছে। সর্দার যন্ত্র-চালিতের মত উঠে এসেছিল তাও মনে আছে। তার পর কখন বাড়ি এসেছে হুঁশ নেই।

ভিতরের দাওয়ায় বসে আছে সর্দার। সান্ত্বনা ঘরে। অবনীবাবু ক্রমাগত ঘর-বার করছেন। এ অবস্থায় এ ভাবে দুজনকে রেখে বেরুতেও পারছেন না। মুখে কেউ শোরগোল না করলেও ওই দুটো কঙ্কালের একটিকে মনে মনে সনাক্ত করেছে সবাই। পুরুষকে। কিন্তু দ্বিতীয়টিই সকলের বিভ্রান্তির কারণ। সঠিক বুঝে ওঠে নি কেউ। অবনীবাবুও না। কিন্তু এদের দুজনকে দেখে অনুমান করেছেন। বুঝেছেন।

সান্ত্বনার ইচ্ছে হচ্ছিল দেয়ালে মাথা ঠুকে সচেতন করে নিজেকে। তার যে এখনো অনেক ভেবে দেখার আছে, অনেক কিছু বুঝতে বাকী। রোদ উঠলে যেমন কুয়াশা মিলোয়, তেমনি সোজাসুজি একবার নিজের ভিতরে তাকাতে পারলেই কিছু একটা প্রহেলিকার যেন অবসান ঘটতে পারে। কিন্তু তাকাতেও পারছে না, ভাবতেও পারছে না। একটা বোবা নিষ্ক্রিয়তা একেবারে গ্রাস করেছে ওকে।

…এই জন্যেই আসবে বলেও আর আসেনি চাঁদমণি। সেই রাত্রিতেই হয়তো ধরা পড়েছে। মরণ শানাচ্ছিল যে মানুষটা তার হাতেই ধরা পড়েছে। সে দৃশ্য ভাবতে গিয়ে অব্যক্ত ব্যথায় একলা ঘরে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল সান্ত্বনা। চাঁদমণির সেই পা-ছোঁয়া স্পর্শ সর্বাঙ্গে সিড়সিড়িয়ে উঠল। হয়ত কাঁচপোকার মত টেনে নিয়ে গেছে, বলির পশুর মত…। সান্ত্বনার মনে হ'ল, বুকের হাড়গুলো যেন মটমট করে ভাঙছে কে। ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু যাবে কোথায়? দাওয়ায় পাগল সর্দার। আস্তে আস্তে বসে পড়ল আবার।

…তার পর ফাঁদ পেতেছে হোপুন। সেই প্রলোভনের ফাঁদে রণবীর ঘোষকে আটকেছে। পিচ্ছিল প্রলোভনের ফাঁদ। উপলক্ষ্য সান্ত্বনা। সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে আবার। ওই জন্যেই জিপে সেই লোকটার পাশে দেখা গেছে তাকে। ওই জন্যেই মড়াইয়ে আর সেই গরু-চরা পাহাড়ের নির্জনে হোপুন অমন করে চেয়ে

চেয়ে দেখত ওকে। ওই ফাঁদ দেখেই ভুতুবাবু ওকে সতর্ক করে দিতে এসেছিল। আর পাগল সর্দার ওকে সতর্ক করতে এসেছিল তো হোপুনেরই ইঙ্গিতে।

ভিতরে ভিতরে সব কটা উপলব্ধির তার যেন একসঙ্গে সজাগ করে তুলতে চাইল সান্ত্বনা। ব্যাকুল আকুতি। ওই পাষাণ-মূর্তি লোকটার নির্মম নৃশংসতাই বড়, না আর কিছু বড়?

চমকে উঠল একেবারে। ঘরের চৌকাঠে পাগল সর্দার দাঁড়িয়ে। দৃষ্টি-বিনিময় হতে বলল, আখুন যাই রে দিদিয়া···।

সান্ত্বনা অবাক। যেন দুটো গল্পগুজব করতে এসেছিল, সুখ-দুঃখের কথা কইতে এসেছিল—বেলা পড়ে আসছে দেখে এখন চলল। সান্ত্বনা মাথা নেড়েছিল কি না নিজেই জানে না।

বাইরে এসে মেন কোয়ার্টারস্-এর রাস্তা ধরল পাগল সর্দার। কলের মত এগিয়ে চলল সে। মেন কোয়ার্টারস-এর ভিতর দিয়ে, গেস্ট হাউসের পাশ দিয়ে একেবারে পাহাড়ের ধারে এসে দাঁড়াল। পায়ের নিচে মড়াই। বাঁয়ে শুকনো খটখটে। যেদিকে ড্যাম বাঁধা হচ্ছে। ডাইনে মাটির সেই সাময়িক প্রতিরোধ।

অন্যমনস্কের মত হাঁটতে হাঁটতে ছাড়িয়ে গেল সেটা। আরো বেশ খানিকটা এগিয়ে থামল এক জায়গায়। এখানেও পায়ের নিচে অতলান্ত মড়াই। কিন্তু এখানে মড়াইভরা জল। লাল জল। লাল যৌবন। উচ্ছল, কলকল। একাগ্র মনোযোগে পাহাড়ঘেঁষা ওপারের দিকে দেখতে লাগল পাগল সর্দার।

···কোন্ জায়গাটা হবে? তখন তো মড়াইয়ে জল ছিল না একফোঁটা। আর কত বছরের কত কালের কথা সেটা।

কিন্তু কোন্‌খানটায় হবে?

কোন্‌খানটায় আজও ঘুমিয়ে আছে চাঁদমণির মা ফুলমণি?

এইখানটায়?···নাকি ওইখানটায়?

জলের নিচে ঠাওর করা শক্ত। জলের নিচে পাথর, তার নিচে মাটি, তার নিচে···

মস্ত শিকারী ছিল পাগল সর্দার। এমন শিকারী হয় না নাকি। কিন্তু শিকার করা ছেড়ে দিল কেন? সকলের বিস্ময়।

ছাড়বে না-ই বা কেন? বড় শিকারের পরে ছোট শিকারে হাত ওঠে, না মন ওঠে? শেষ যে শিকার করেছে পাগল সর্দার···বাঘ-ভালুকও তুচ্ছ। তার পর শিকার ছাড়বে না তো কি।

পাহাড়ীরা ছিল ওদের জাতশত্রু। পাহাড়ের ডগায় থাকত। ফাঁক পেলে এসে লুঠতরাজ করে যেত। ওদেরই কাউকে মনে ধরেছিল ফুলমণির। এদেরই কারো সঙ্গে 'ছাড়ই' হয়ে চলে গিয়েছিল। সর্দার তো বনে-জঙ্গলে শিকার নিয়ে থাকত বছরের বেশীর ভাগ সময়। সে শিকার জলো ঠেকল এর পর। শিকারীরা ধৈর্যের পাহাড় নাকি। মিথ্যে নয় বোধ হয়। প্রায় এক বছর ধৈর্য ধরে ছিল পাগল সর্দার, নিবিড় প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হয়ে ছিল। শিকার আসবে জানত। বনের হরিণ ঝোপে-ঝাড়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে কতক্ষণ! তার স্বভাবই তাকে টেনে আনে। ফুলমণিই বা পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়ানো ভুলে থাকবে ক'দিন? তার স্বভাবও তাকে টেনে আনবে।

এনেছিল।

বছরের বড় শিকারের উৎসবে বেরিয়েছিল সাওতালরা। পাঁচ দিনের দেশময় শিকারোৎসব। ছেলে বুড়ো ঝেঁটিয়ে বেরোয় 'ডুবু ডুবু' নাগর পিটিয়ে, 'শরং শরং' বাঁশি ফুঁকে আর 'তুতু তুতু' শাকোয়া বাজিয়ে। কাছে দূরে কে আর না টের পায় ওদের এই শিকার অভিযান। পাঁচ দিন আর কোনো মরদ পুরুষের টিকি দেখা যাবে না দেশে গাঁয়ে।

কিন্তু পাগল সর্দার যায় নি।

সেও বড় শিকারেরই প্রতীক্ষা করছিল।

সূয্যি-ডোবা আবছা আলোয় শিকার সেদিন নিঃশঙ্কে এসে দাঁড়িয়েছিল ওই ছোট খাড়া পাহাড়টার ডগায়।

এত মন দিয়ে আর কখনো তীর ছোড়ে নি বোধ হয় পাগল সর্দার।

বাণবিদ্ধ পাখি যেমন উল্টে-পাল্টে শূন্য থেকে নেমে আসে মাটির দিকে, ওর শিকারও তেমন লপ্‌টে-ঝপ্‌টে নেমে আসছিল নিচের দিকে। সবটা আসে নি, কাছেই একটা পাথরে আটকে গিয়েছিল। ক্ষিপ্রচরণে সর্দার গিয়ে তুলে নিয়েছিল তাকে। শিকার একবার মাত্র চোখ মেলে দেখেছিল তার নির্মম শিকারীকে, তার পর পরম নিশ্চিন্তে চোখ বুজেছিল। অতি যত্নে, অতি সঙ্গোপন বুকে করে শিকার নিয়ে নেমে এসেছিল সর্দার। তার পর···

তার পর, ওই জলের নিচে পাথর, তার নিচে মাটি, আর তার নিচে···

নরেনকে দেখা মাত্র [illegible]না ভিতরের গুমোট অসহিষ্ণুতা কাটিয়ে ওঠার পথ পেল যেন। এক পলক দেখে নিয়ে আল্‌তো প্রশ্ন করল, কবে এলেন?

নরেন অবাক। কবে এলাম কি রকম?

নির্লিপ্ত মুখে সান্ত্বনা আবার তাকালো তার দিকে।—আপনি কি এখানেই ছিলেন নাকি এ ক'দিন?

জবাব না দিয়ে নরেন হাসতে চেষ্টা করল একটু। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আরো অবাক সে। এ ঠিক ঠাট্টাও নয়, অনুযোগও নয়। নিরুত্তাপ অভিমানের ঝাঁজ একটু।

বাদল গাঙ্গুলির বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেই সন্ধ্যায় নরেন এসেছিল। আশা করেছিল চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটা সান্ত্বনা তুলবে। কিন্তু সান্ত্বনা তার ধার দিয়েও যায় নি। পরদিনও না। অথচ গোপুনের দুর্ঘটনার পরের সে থমথমে মুখভাব আর ছিল না। বরং খুশিতে উপচে উঠতে দেখেছিল অনেকবার। বাদল গাঙ্গুলির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বা যোগাযোগের প্রসঙ্গ সান্ত্বনা আগেও সন্তর্পণে পরিহার করেছে। অথচ ভিতরের একটা চাপা আনন্দ চাপতে পারে নি। তাছাড়া আরো অনেক কিছু উপলব্ধির কারণ ঘটেছে অনেকবার।...বিশেষ করে মানির বাড়ি যাওয়ার আগে সেই বিকেলে নরেনের হাল্কা ইঙ্গিতে অপ্রতিভ লালিমায় ধড়মড়িয়ে উঠে ওর রান্নাঘরে পালানো।

এবারেও সান্ত্বনা বলে নি কিছু, বাদল গাঙ্গুলি বলেছে। বলেছে, সান্ত্বনার সে কি রাগ তার ওপর! আর রাগ পড়তে লজ্জায় একাকার নাকি। বাদল গাঙ্গুলির বলার মধ্যেও চিরাচরিত নিস্পৃহতার অভাবটুকু নরেন লক্ষ্য করেছিল বৈকি। মনে হয়েছিল, সেই রাগ আর লজ্জা চিফ ইঞ্জিনিয়ারের মরু-রুক্ষ জীবনে ঠাণ্ডা প্রলেপের কাজ করেছে।

তার পর গত চার-পাঁচদিন আর আসে নি নরেন। ঝড়-জল ছাড়া মড়াইয়ে বিপর্যয়ও কম ঘটে নি কটা দিনের মধ্যে। আজই শুধু জল হয় নি সকাল থেকে। তবু আসবে ভাবে নি। কিন্তু বিকেল হতে পায়ে পায়ে চলে এসেছে কেমন।

আগে হলে এটুকু অভিমানই দখিন বাতাসের স্পর্শ বলে মনে হ'ত। কিন্তু এ প্রশ্রয়ের যাতনা বিষম। এবারে নরেন সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। পাচ্ছে। দাওয়ার ওপর মোড়ায় বসে পড়ে বলল, এ কদিন ঘুমিয়ে কাটালে নাকি, আকাশের অবস্থা দেখো নি?

দু'চার মুহূর্ত অপেক্ষা করে সান্ত্বনা আকাশের অবস্থাটা তার মুখ থেকেই আঁচ করে নিতে চেষ্টা করল যেন। তার পর [illegible] চলে এলো। আধময়লা

শাড়িটা বদলে নিল। আয়নায় মাথা আঁচড়ে নিল একটু।

নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে চায় সান্ত্বনা। নিঃশেষে ছাড়িয়ে যেতে চায়। ওই ঝড়টা যেন ওরই বুকের উপর এক অনড় বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গেল। বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে ওর ভিতরে ভিতরে। ঘটে যাচ্ছে। দুঃসহ লাগে। ও ভুলতে চায় ওই ঝড়ের কথা। চাঁদমণির কথা, হোপুনের কথা, পাগল সর্দারের কথা…। ওই মানুষদের জীবনের ব্যর্থতা ওকে বুঝি গ্রাস করতে আসছে।

নিজেকে ভুলতে চায়। মাসির বাড়ি থেকে ঘুরে আসার পর জীবনে যে নতুন জোয়ার এসেছিল, সেই জোয়ারেই আবার ভাসতে চায় সান্ত্বনা। বেরিয়ে আসতে চায় এই স্তব্ধতার আবরণ ভেঙে। চেষ্টাও করছে। চেষ্টা করছে সহজ হতে সুস্থ হতে।

নরেনের কথা ওর সত্যিই মনে হয়েছে এ ক'দিন। মনে হয়েছে, ওই লোক-টাই পারে এই অসহ্য গুমোট খান্ খান্ করে ভেঙে দিতে। বিকেলে জল-বৃষ্টি সত্ত্বেও প্রতীক্ষা করেছে।

ফিরে এসে বলল, চলুন আর বসতে হবে না, যে বিদঘুটে ছিরি আকাশের. এক্ষুনি হয়তো আবার ঝমঝম শুরু হবে।

একটু দেখে নিয়ে নরেন বলল, বেরোলে পরে যদি শুরু হয়?

হয় হবে, আপনাকে আর সে গবেষণা করতে হবে না, চলুন।

বেরিয়ে সেই পিছন দিকের পাহাড়ী রাস্তা ধরল সান্ত্বনা।

এদিকে কোথায়?

যমের বাড়ি। ফিরে তাকালো।—ভয় করছে?

ওর দিকে চেয়েই নরেনের আজ হঠাৎ কেমন মনে হ'ল, যে অবকাশের প্রতীক্ষা করছিল এতদিন, আজ সেটা আসবে। যে কথাটা বলি বলি করেও বলা হয় নি এতদিন, সেটা আজ বলা হবে। এ সংশয়ের থেকে সে অনেক ভালো। জবাব দিল না, তুমি সঙ্গে থাকলে আর ভয় কি।

ভালো লাগছে সান্ত্বনার। ভালো না লাগিয়ে ছাড়বে না। সেই জোয়ার-জীবনে ফিরে যাবে সঙ্কল্পবদ্ধ। সান্ত্বনা হেসে উঠল। ওই হাসি দিয়ে গোটা পাহাড়ের ওপর থেকে কালো মেঘের ছায়াটা পর্যন্ত দূর করে দেবে যেন। বলল, ভয় না তো কি, এ ক'দিন আসেন নি কেন? কি যাচ্ছেতাই সব ব্যাপার হ'ল, একটার পর একটা, দুটো কথা বলারও লোক পাইনে।

খবর দাও নি কেন? নরেন নিস্পৃহ।

এতদিন কোন্ খবরটা দিতে হয়েছে মশাই আপনাকে ?

জল-বৃষ্টি মাথায় করে আসি বলে তুমিই তো কতদিন কত খোঁচা দিয়েছ।

সান্ত্বনা বলতে যাচ্ছিল, খোঁচা খেয়েও তো আসতেন। বলল না, এবার এই না-আসার হেতুও কেমন করে যেন উপলব্ধি করেছে। সান্ত্বনা আপস করতে চায়। কিন্তু সোজা রাস্তায় নয়। নিজেকে সজাগ করে। বলল, খোঁচা না ছাই, আসলে আপনি আজকাল আমাকে দু চক্ষে দেখতে পারেন না।

নরেনের ভিতরে প্রশ্রয়ের সাড়া জাগছে আবার একটা। সংশয়ের পর্দাটা যেন পাতলা হয়ে আসছে। পাশাপাশি চলার একটা স্পর্শ লাগছে কোথায়। তবু এই সেই প্রতীক্ষিত অবকাশ কি না বুঝে উঠল না। জবাব না দিয়ে হাসতে লাগল সেও।

থাক, আর হাসতে হবে না, যে ভাবে হাঁটছেন এখানেই সন্ধ্যে !

এটা কি হাঁটার মত রাস্তা, ঠোক্কর খেতে খেতে প্রাণ গেল।

সান্ত্বনা হেসে ফেলল, এখনো ঠোক্কর খাওয়া অভ্যেস হয় নি ? কিন্তু জবাব শোনার আগে চট করে সামলে নিল।—সত্যি যা হয়েছে রাস্তাঘাটের অবস্থা, এক ঝড়ে সব কাত।

পাথরের ওপর পা ফেলে ফেলে নরেন চলেছে। মন বলছে, সময় আসে নি, আসবে। অবকাশ আসে নি, আসবে। আজই আসবে। ধমনীতে একটা উষ্ণ স্রোত বইছে ওর। জোর করেই চেষ্টা করল সহজ হতে। বলল, শুধু ঝড় কেন, এই বৃষ্টিটাও কম ভয়ের নাকি ! কোথায় কোথায় বন্যা হয়েছে খবর এসেছে—এ রকম হলে তো হয়েছে আর কি। আপিসে সারাক্ষণ এই কথা আর এই ভাবনা।

সান্ত্বনা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ভুরু কুঁচকে তাকালো। এতক্ষণের চেষ্টায় মড়াইয়ের উপর থেকে যে অবাঞ্ছিত ছায়াটা সরিয়ে রেখেছিল সেটা যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল আবার। আর সেই পাষাণ-ভারও। বলে উঠল, চিফ ইঞ্জিনিয়ার-এর মুখোমুখি বসে গালে হাত দিয়ে তাই ভাবুন গে, আমার সঙ্গে আসতে হবে না, যান্।

হন্ হন্ করে দু'চার পা এগিয়ে গেল সে। নরেন প্রথমে অবাক, পরে খুশি। কাছে এসে বলল, তোমার সঙ্গে এলে কি আলোচনা করতে হবে শুনি ?

কোন আলোচনা নয়। শুধু বড় বড় পা ফেলতে হবে আর হাসতে হবে। হাসার নমুনা ওর মুখেই ঝরল প্রথম।

নরেনের আপত্তি নেই। চলার গতি বাড়ল। দিনের আলো ঘন কালো

হয়ে আসছে আরো। কোন্ দিকে বা কোন্ পথে চলেছে কারোই হুঁশ নেই। কথা অনর্গল সান্ত্বনাই বলছে। আবোল-তাবোল কথা। হাসছেও খুব। নরেনেরও হাসার ভূমিকা। কিন্তু কেমন যেন লাগছে। ওকে দেখে আজ হঠাৎ ঝরনার কথা মনে পড়েছে। কোথায় যেন মিল। থেকে থেকে অন্তর্দ্বন্দ্ব একটা। ওই নারীচাপল্য আর প্রশ্রয় ঠিক তার উদ্দেশ্যে নয়, সে উপলক্ষ মাত্র। ঝরনাও বাইরে থেকে কতজনকে অমন প্রশ্রয় দিয়েছিল। হাসার ভূমিকা নরেনের, কিন্তু হাসি তেমন আসছে না।

সান্ত্বনা থমকে দাঁড়াল এক জায়গায়। সামনেই বাঁকের মুখে সেই বিশাল পাথরের আড়াল। তার ওপাশে বড় গাছ ভেঙে পড়ে আছে একটা। একান্ত নির্জনে এই আড়ালের ওধারে একদিন দেখেছিল দুজনকে। চাঁদমণি আর হোপুনকে। সর্বাঙ্গ সির-সির করে উঠল কেমন।··অমোঘ আকর্ষণ একটা।

আড়াল পেরিয়ে সেই ঢালু পাথর। যেখানে ওরা বসেছিল। বসে আর ছিল কোথায়! চাঁদমণি শুয়েই ছিল প্রায়। আর ওর মুখের ওপর, বুকের ওপর ঝুঁকেছিল হোপুন। অনেক দিনের একটা বিস্মৃতিবিলগ্ন অস্বস্তি ভিতর থেকে যেন নড়েচড়ে উঠছে আবার। যেমন উঠেছিল এখানে চাঁদমণি আর হোপুনকে দেখে। যেমন উঠেছিল প্রথম সন্ধ্যায় বাদনা উৎসব থেকে ফেরার পর রাতের বিনিদ্র শয্যায়। পাথরটা যেন ইশারায় ডাকছে ওকে। নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে না পারার যাতনা বুঝি ওখানে গিয়ে বসলে কমবে একটু। অজ্ঞাত অনড় বোঝাটা হালকা হবে।

পাশের লোকটা যে নির্নিমেষে লক্ষ্য করছে তাকে—সে খেয়ালও ছিল না বোধ হয়। লজ্জা পেল, হেসেও উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে থমকেও গেল একটু। চাঁদমণির উচ্ছল হাসির মত লাগল যেন নিজের হাসিটা। লাগুক, ও আর পরোয়া করে না। বলল, দেখছেন কি, আর হাঁটে না, চলুন ওই পাথরটায় গিয়ে বসি একটু।

চপল পায়ে গিয়ে পাথরটার উপর বসে পড়ল ধুপ করে। চুপচাপ নারী-বর্ণচ্ছটা দেখছিল নরেন। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সেও। প্রায় মোহগ্রস্তের মত বসল পাশে।

চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে সান্ত্বনা তাকালো একবার। এত কাছে ঘেঁষে বসার মত ছোট নয় পাথরটা। বসেছে তো বসেছে, সান্ত্বনা বেপরোয়া। বলল, কি হ'ল, এমন চুপচাপ যে? জায়গাটা বেশ—না?

উৎফুল্ল মুখে চারদিকে তাকিয়ে জায়গাটা বেশ তাই যেন উপলব্ধি করতে

লাগল সে। কিন্তু মনে পড়ছে অন্য কথা। প্রথম সন্ধ্যায় সাঁওতালদের বাদনা উৎসব থেকে ফেরার পথে এর থেকে আরো বড় পাথরে বসেও সেটা বড় মনে হয় নি খুব। আর ওকে নীরব দেখে এই ভদ্রলোকই সেদিন বলেছিলেন, অমন চুপচাপ কেন?

অস্বস্তি আজও। কিন্তু সেদিনের মত অত ভীরু অস্বস্তি নয়। নেশার মত। ভদ্রলোক চেয়ে আছে নিষ্পলক, উপলব্ধি করেই সান্ত্বনা অন্য দিকে ঘাড় ফেরালো আরো। পড়ো গাছটার দিকে চেয়ে অস্ফুট কণ্ঠে হেসে উঠল, বেচারী গাছটার অবস্থা দেখুন একবার।

তার পর সর্বাঙ্গে শিহরণ একটা।

এক হাত ওর পিঠে, অন্য হাত দিয়ে তার মুখখানি সম্পূর্ণ নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিল নরেন।

চোখে চোখে, চোখের তারায় তারায় বিনিময়।

বিদ্যুৎস্পর্শের মত।

নিমেষে নেশার ঘোর কেটে গেল যেন সান্ত্বনার। চপলতার চিহ্ন মুছে যেতে লাগল। শুকনো খরখরে লাগছে জিবের ডগা, ঠোঁট। সামলে নিয়ে জোর করে হাসতে চেষ্টা করল একটু। নড়েচড়ে সরে বসতে গেল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা সবল আকর্ষণে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার বুকের ওপর। মুহূর্তের অবকাশ পেল না। দুই ঠোঁট বিদীর্ণ হতে লাগল থেকে থেকে —ঘন, উষ্ণ, নির্মম। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল অধরের বাধা। দাঁতে লাগছে, জিবে লাগছে।

বাধা দেবে ভাবছে। প্রাণপণ চেষ্টা করতে চাইছে বাধা দিতে। কিন্তু সর্বাঙ্গ অবশ। ওর হাড়গোড় সুদ্ধ মটমট করে ভাঙবে নাকি মানুষটা! নিবিড় যাতনা জানুতে, কটিদেশে, স্তনভারে। দেহ-দেহলীতে ভাঙনের তাণ্ডব। আর পারছে না সান্ত্বনা। বাধা দিতে পারছে না। স্পর্শ-বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে, ঘুমের মত লাগছে। শিথিল হয়ে আসছে সব কিছু। সান্ত্বনা হাল ছেড়ে দিল। এলিয়ে পড়ল। সেই যাতনার মধ্যেও কতকালের, কত যুগের একটা জমাট-বাঁধা শীতল অবরোধ বুঝি বাষ্প হয়ে নিঃশেষে মিলিয়ে যাচ্ছে।

অন্তিম বিস্মৃতির মুহূর্তে আবার এক ঝাঁকুনি খেয়ে সচেতন হ'ল যেন। পাথর-চ্যুত হয়ে নরেন মাটিতে বসে পড়ল। সান্ত্বনা উঠে বসল। দাঁড়াল। পা কাঁপছে থরথর। বুকের ভিতরে যেন হাতুড়ি পিটছে ঠক ঠক করে। বাতাস নেই। বিস্রস্ত বেশবাস ঠিক করে নিল। বিস্ফারিত দুই চোখ নরেনের মুখের

ওপর। লজ্জা নয়, ভয় নয়, ঘৃণা নয়। রাজ্যের বিস্ময় আর বিভ্রম।

চকিতে ঘুরে দাঁড়াল। ফিরে চলল। পিছন ফিরে তাকালো না একবারও। তবু উপলব্ধি করল মানুষটা আসছে পিছনে পিছনে। পাঁচ সাত মিনিটের পথ আর। কিন্তু আর ফুরোয় না যেন।

শোনো—

পা থেমে গেল। থামতে চায় নি তবু। নরেন কাছে এসে দাঁড়াল। ধীর স্থির। বলল, তোমার বাবার সঙ্গে আমি দুই এক দিনের মধ্যেই দেখা করব।

দুই চোখে এক ঝলক আগুন ছড়িয়ে হন হন করে এগিয়ে চলল সান্ত্বনা।

নরেন দাঁড়িয়ে রইল।

সোজা নিজের ঘরে এসে একেবারে শয্যা নিল সান্ত্বনা। বাবা বাড়ি নেই। কিন্তু আসবে তো। কি করে মুখ দেখাবে সান্ত্বনা। সামনে গিয়ে দাঁড়াবে কেমন করে। রাগে আগুন হয়ে উঠতে চাইছে মানুষটার ওপর। পারছে না বলেই রাগ বাড়ছে, যাতনা বাড়ছে। উঠে মুখে হাতে জল দিতে গিয়ে একেবারে স্নান করে এলো। কিন্তু গা জুড়োয় না তবু। সেই স্পর্শ-বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারে না।

বাবা ফিরেছে টের পেল এক সময়। কিন্তু তিনি খেয়াল করলেন না কিছু। যতটা সম্ভব আড়ালে আড়ালে কাটিয়ে রাতের মত নিশ্চিন্ত হ'ল সান্ত্বনা। আজ আর চোখে পাতায় এক করতে পারবে না জানা কথাই। না পারুক। অনেক বিচার-বিশ্লেষণ বাকী। মানুষটার অমন দুঃসাহসের দরুন নিজেকে উত্তেজিত করে তোলাই বাকী। কিন্তু একা ঘরে ঠোঁটের জ্বলুনি উপলব্ধি করছে আবার। বিস্মৃতির সেই নির্মম স্পর্শগুলো গ্রাস করতে আসছে আবার। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। হঠাৎ কান খাড়া করে নিজের বুকের স্পন্দন শুনতে লাগল যেন সান্ত্বনা। কিছু একটা পরিবর্তন উপলব্ধি করতে লাগল। দেহের অন্তস্তলে সেই ভাঙনের সমারোহ মনে পড়তে লাগল। যত ভাঙছিল তত যেন ভরেও উঠছিল।

বাবার ডাক শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সান্ত্বনা। দু চোখ রগড়ে নিয়ে দেখল, দিব্বি বেলা। সান্ত্বনা অবাক। কখন ঘুমোলো। এমন বিচ্ছিরি ঘুম, শীগগির ঘুমিয়েছে বলেও মনে পড়ে না।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে-ফিরে সেই এক কথাই ভাবছে। বিগত দিনের কথা। ওই একটা দিনের সঙ্গে সঙ্গে ওর জীবনের একটা অধ্যায় যেন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু খারাপ লাগছে না, বরং হালকা লাগছে অনেক।

বিস্মৃতির মুহূর্তে ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিল। না উঠলে…?

অস্ফুট শব্দ নির্গত হ'ল একটা মুখ দিয়ে। উজন থেকে ভোলের কড়া

নামিয়ে ফেলল তাড়াতাড়ি। ফুটন্ত তেলের ছিটেয় হাতের কব্জিতে ফোস্কা পড়ে গেছে। দেখল। বিদ্বেষের জ্বলন্ত ছিটায় অমনি করে দাহ করতে চাইল একজনকে। ভাবতে চেষ্টা করল, ওর অন্তস্তলের এক সংগোপন আশা দস্যুর মত উপড়ে ফেলতে চেয়েছে লোকটা। ওর জীবনে আর এক বাঞ্ছিতজনের পদসঞ্চার নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছে। আর একজনের প্রাপ্য ভাণ্ডারের দিকে হাত বাড়িয়েছে নির্লজ্জের মত।

কিন্তু তবু চোখের সামনে চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে বড় করে তোলার চেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে থেকে থেকে। সেই নির্লজ্জ মানুষটাই তাকে নিষ্প্রভ করে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে বার বার। আর সান্ত্বনা রাগ করতে পারছে না বলেই অবাক হচ্ছে। ভালো লাগছে বলেই জ্বলে উঠতে চাইছে। নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছে না বলেই অস্বস্তি। নিজের অন্তস্তলে দৃষ্ট চালাল সন্তর্পণে।

ওর প্রশ্রয়ে আমন্ত্রণ ছিল? আহ্বান ছিল? সরোষে বলে উঠতে চাইল, না, কক্ষনো না।

কিন্তু সমর্থন আসছে না। উল্টে যেন ব্যঙ্গ করছে কেউ নাকি! এতকালের যে জমাটবাঁধা অবরোধ হাওয়া হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে এখনো, সে তবে কি? আর সেটার প্রতি মোহ আছে কোনো? মায়া আছে কিছু?

এত বড় বিপর্যয়ের উপলক্ষ যে মানুষ, জীবনে আর তাকে মুখও দেখাবে না বোধ হয়। কিন্তু বাবার কাছে আসবে বলেছিল লোকটা। তিন চার দিন কেটে গেল। আসে নি। সান্ত্বনার জ্বলন্ত চোখে সেদিন এ প্রস্তাবের জবাব লেখা ছিল বলেই আসে নি বোধ হয়। ঠিক আশাও করছে না। আসুক না-আসুক বয়ে গেল। কিন্তু তবু ভিতরে ভিতরে কি একটা অসহিষ্ণুতা যেন। উষ্ণতা বাড়ছে। রাগতে পারছিল না, কিন্তু এখন কারণে অকারণে মেজাজ চড়ছে।

ওর এ ক'দিনের হাবভাব অবনীবাবুর লক্ষ্য করার কথা। কিন্তু সম্প্রতি চাকরির ব্যস্ততায় বিড়ম্বিত তিনি। তিনি কেন, সকলেই। এক্সপার্ট কমিটি এসে গেল বলে। এদিকে আকাশ আর বৃষ্টির যা অবস্থা, বাইরের তত্ত্বাবধান ছেড়ে কমিটির পরিদর্শনপর্ব অফিসের ফাইলপত্র ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যেই শেষ হবে বোধ হয়। অতএব হিসেব-নিকেষ জল্পনা-কল্পনার নথিপত্র সব রেডি রাখো, গোছগাছ করো, অফিস সাজাও। এ ছাড়াও ওপরঅলাদের হাবভাব চালচলনে এই কমিটিকে কেন্দ্র করে কেমন একটা শঙ্কার ছায়া নেমেছে। কমিটি এলে প্রতিকূল কিছু ঘটতে পারে যেন। কি, সে আভাস স্পষ্ট নয় কারো কাছে।

অবনীবাবু এই নিয়েই ব্যস্ত ক'টা দিন। সান্ত্বনার সঙ্গে যত কথা হয়েছে, তার বেশির ভাগই এই কথা। সান্ত্বনা শুনেছে কি শোনে নি, তাও খেয়াল করেন নি। তবু সেদিন কি মনে হ'ল তাঁর। বললেন, নরেন আসে নি এর মধ্যে? অফিসেও দেখিনে বড় একটা···

জবাবে যথাসম্ভব নিস্পৃহ মুখে সান্ত্বনা ঠোঁট ওল্টালো শুধু। অর্থাৎ কে জানে, খবর রাখিনে।

একটু খটকা লাগল বোধ হয়। অবনীবাবু খেয়াল করে মেয়ের দিকে তাকালেন এবার। হেসেই বললেন, কি রে, আবার ঝগড়াঝাঁটি করেছিস বুঝি?

ভ্রূভঙ্গি করে হাসতে হ'ল সান্ত্বনাকেও। দিব্বি পাবে এসব এখন। পাল্টা অনুযোগে আসল জবাব এড়িয়ে গেল। বলল, তুমি তো দিন-রাত কচি মেয়ের মত ঝগড়া করতেই দেখো আমাকে।

সেদিনই নিজের উদ্যোগে নরেনের সঙ্গে দেখা করলেন অবনীবাবু। ভড়কে গিয়েছিলেন প্রথম। এমন ধীর শান্ত ওকে আর দেখেন নি কখনো। কিন্তু দুই এক কথার পরেই শুনলেন যা, তাতে পারিবারিক প্রসঙ্গ বিস্মৃত হলেন। ভাবলেন, ওর মুখের এই অবস্থা যখন, রীতিমত দুশ্চিন্তার কারণ যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। নরেন চৌধুরী এক্সপার্ট কমিটির প্রসঙ্গ তুলে নিজেকে আড়াল করল।

বাড়ি ফিরেই অবনীবাবু মেয়েকে বললেন সব। বললেন, এক্সপার্ট কমিটি যে আসছে তার চেয়ারম্যান হলেন বিপুল বাড়রী নামে এক ভদ্রলোক। মস্ত ইঞ্জিনিয়ার, মস্ত এক ফার্মএর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। বাদল গাঙ্গুলি সেখানেই চাকরি করত আগে, এঁর সঙ্গেই একটা ভয়ানক গোলযোগের ফলে চাকরি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল তাকে।

এত না বললেও চলত, শুধু নাম শুনলেই চিনত সান্ত্বনা। বুঝতও। এ ক'দিন বাবার দুশ্চিন্তা দেখেও দেখে নি, বা তার কোনো কথা শুনেও শোনে নি। কিন্তু আজকের খবরটা শোনা মাত্র নড়েচড়ে সজাগ হয়ে উঠল। নিজের ভাবনাচিন্তা তলিয়ে গেল সব। আরো কিছু শোনার আশায় জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে রইল শুধু।

অবনীবাবু বলে গেলেন, এই জন্যেই ক'দিন ধরে এরকম অবস্থা দেখছি অফিসের। নরেন বলল, এতটুকু নড়চড় হলে এখান থেকেও সোজা চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বসতে পারে বাদল গাঙ্গুলি। এমন অদ্ভুত কথা তো আমি শুনি নি কখনো।

এতটা বরদাস্ত হ'ল না সান্ত্বনার। ঝাঁজিয়ে উঠল প্রায়, নরেনবাবুর সবেতেই বাড়াবাড়ি, আমি বলে রাখছি কিচ্ছু হবে না—এত সহজে যদি সব

ভেস্তে যেত, দুনিয়ায় তাহলে আর বড় কাজ কিছু হ'ত না।

উত্তেজনায় নিজের ঘরে চলে এলো। কিন্তু উতলা সেও কম হয় নি। যা বলে এলো বাবাকে, সেটা তার মনের কথা, আশার কথা। কিন্তু শুধু এরই ওপর ভরসা করে সত্যি নিশ্চিন্ত থাকা সহজ নয়। নরেনবাবু যা বলেছে, বাবা সেটাকে অদ্ভুত ভেবে অবাক হতে পারেন, কিন্তু সে রকম কিছু ঘটা যে অসম্ভব নয়, সে শুধু সান্ত্বনাই জানে। যে নাম শুনল, তাঁর সঙ্গে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কণামাত্র আপসেরও কোন সম্ভাবনা নেই। ছটফটানি বেড়েই চলল। ইচ্ছে হ'ল, এক্ষুনি নরেনবাবুকে ডেকে পাঠায় একবার। কিন্তু সেও কোনদিন সম্ভব নয় আর।

আর কোনদিকে মন দেবার মত মনের অবস্থা থাকলে নরেনের পরিবর্তন চোখে পড়ত বাদল গাঙ্গুলির। হেড অফিস থেকে এক্সপার্ট কমিটির নামগুলো আসার পর কথাবার্তা দু'চারটে শুধু তার সঙ্গেই বলেছে, একটু আধটু পরামর্শও করেছে। কিন্তু মুখের দিকে ভালো করে তাকায় নি বোধ হয়।

বাদল গাঙ্গুলির ভিতরে ভিতরে বিষম এক মর্যাদার লড়াই চলেছে সারাক্ষণ।...এরকম হতে পারে একবারও ভাবে নি। কিন্তু ভাবে নি কেন সেটাই আশ্চর্য। বেসরকারী বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিশিষ্ট কমিটিতে বিপুল বাড়রীর আমন্ত্রণ নতুন কিছু নয়। নেশান বিল্ডার্স এ থাকতে এরকম অনেক কমিটিতে তাকে যোগ দিতে দেখেছে।

ভিতরে যাই হোক, বাইরে শান্ত মুখেই প্রতীক্ষা করতে লাগল সে। অভ্যর্থনার ভার পড়ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের ওপর। গেস্ট হাউসে থাকবেন তাঁরা। মিটিংয়ের ব্যবস্থাও সেখানকার বড় লন-এ হতে পারে। যেমন ইচ্ছে তাঁদের।

যথা দিনে তাঁরা এলেন। বিকেলে নিজের কোয়ার্টারস-এ বসেই বাদল গাঙ্গুলি খবর পেল। অঝোরে জল পড়ছে তখন। সেই প্রথম বোধ করি জলের ওপর খুশি হল সে। নরেনকে আগেই বলে রেখেছে, ড্যাম পরিদর্শন করানোর ভার তার। একটা গাড়িও মজুত আছে তাঁদের জন্য। কিন্তু আজ আর কেউ বাইরে বেরুবেন না বোধ হয়।

বসে আছে চুপচাপ। ভিতরে শুকিয়ে-আসা ক্ষতের মুখে নতুন জ্বালা একটা। ঘোষ-চাকলাদার ফার্মের ওপর আর রাগ নেই একটুও। যথেষ্ট শিক্ষা দিয়েছে। তা ছাড়া অপকর্মের আসল নায়ক যে তার পরিণতি তো

স্বচক্ষে দেখেছে। মৃত্যুর ওপরে অভিযোগ বড় থাকে না কারো। তারও নেই। যদিও রণবীর ঘোষের মৃত্যু বিধিবদ্ধ সমর্থন পায় নি এখনো। অনেকটাই চাপাচাপির মধ্যে আছে, তা বলে মড়াইয়ে জানতে বাকি নেই কারো। কিন্তু বোঝাপড়া এখন আর ঘোষ-চাকলাদার ফার্মের সঙ্গে নয়। বোঝাপড়া এক্সপার্ট কমিটির সঙ্গে···বিপুল বাড়রীর সঙ্গে। একবার তার বিচার করেছিলেন ভদ্রলোক। আবারও তাই করতে এসেছেন বোধ হয়। কমিটির আর পাঁচ-জনও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সায় দেবেন। কিন্তু এবারে আর সে বিচারের কোন আভাসও বরদাস্ত করবে না।

পরদিন সকাল থেকেই মাঝে মাঝে জল হচ্ছে, মাঝে মাঝে থামছে। এরই মধ্যে সদলে ড্যাম পরিদর্শনে বেরুলেন কমিটি। দেখার আনন্দেই তাঁরা দেখলেন সব কিছু। কখনো সকৌতুকে জানতে চাইলেন এটা সেটা, কখনো বা সপ্রশংস উচ্ছ্বাস জ্ঞাপন করলেন। নরেনের সঙ্গে বার কতক দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে বিপুল বাড়রীর। সপ্রতিভ বিনয়ে নরেন ড্যাম সংক্রান্ত আলোচনাও করেছে একটু আধটু। কিন্তু পূব পরিচয়ের আভাসও ব্যক্ত হয় নি।

বিকেলের দিকে যথানির্দিষ্ট মিটিং বসল গেস্ট হাউসে।

বাদল গাঙ্গুলি এলো।

নরেন চৌধুরী, এমন কি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারও—এই যেন যথার্থ ইঞ্জিনিয়ারের মূর্তিতে দেখলে তাকে। সচেতন। মৃদুগম্ভীর।···প্রায় দাম্ভিক।

বিপুল বাড়রী বাদে বাকি সকলেই সকলরবে আপ্যায়ন করলেন। নরেন পর্যন্ত আশা করেছিল, অনুপস্থিতির দরুন সৌজন্যসূচক কিছু একটা বলবে। কিন্তু চিফ ইঞ্জিনিয়ার তার ধার দিয়েও গেল না। হেসে পাল্টা অভিবাদন জ্ঞাপন করলে সকলের উদ্দেশে। তার পর তাকালো চেয়ারম্যান বিপুল বাড়রীর দিকে।

এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন বিপুল বাড়রী। কন্‌গ্র্যাচুলেশান্‌স্!

দুই এক মুহূর্তের দৃষ্টি বিনিময়। হাত মিলাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার।—থ্যাঙ্ক ইউ।

চেয়ার টেনে বসল তারপর। সদস্যদের কোনরকম অসুবিধে হচ্ছে কি না খোঁজ নিল। অতি-বর্ষার প্রসঙ্গ তুলল। ড্যাম কনস্ট্রাকশন সম্বন্ধে তাঁদের মতামত জিজ্ঞাসা করল।

সকলেই প্রশংসা করল আর একদফা। বিপুল বাড়রী চুপচাপ পাইপ টানতে লাগলেন। বিশেষ ফাইলপত্র সব হাতের কাছে এনে রাখা হয়েছিল। কিন্তু সে

সবের ধার দিয়েও গেলেন না কেউ। মুখে মুখে আলোচনা চলল, কি হচ্ছে, কি হবে, আরো কি হতে পারে।

সবশেষে ঘোষ-চাকলাদারদের সিমেন্ট-প্রসঙ্গ। মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিল বাদল গাঙ্গুলি। সংক্ষেপে ঘটনা ব্যক্ত করে জানালো, ওই ফার্মকে ডিসমিস করতে হবে।

কথা উঠল এই নিয়ে। কিন্তু যেরকম ভেবেছিল সেরকম নয়। ঘরোয়া আলোচনার মত। সদস্যদের কেউ কেউ বললেন, এতবড় কাজে এই সামান্য ব্যাপাব নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করে লাভ কি? এতদিনে এই ফার্মের ক্ষতি যথেষ্ট হয়েছে। এতবড় ফার্ম, এর আগে আর যখন কোনো অভিযোগ নেই, একেবারে বরখাস্ত না করে এবাবেব মত ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে, এতে কর্মকর্তাদেরও কিছুটা গলদ আছে যখন। কত মালের সঙ্গে কতটা সিমেন্ট মেশানো হচ্ছে—স্টাফের সেটা সব সময় দেখে নেওয়ার কথা।

কথাগুলো কতটা নীতিগত এবং কতয়া স্বার্থগত বুঝে উঠল না বাদল গাঙ্গুলি। হাসিমুখেই পাল্টা জবাব দিল, স্টাফ কাজই করছে, কাউকে অবিশ্বাস করে নি এটাই তাদের গলদ। কিন্তু তা বলে অবিশ্বাসের কাজ যিনি করেছেন তাঁকে বরদাস্ত করবেন কি করে?

প্রতিবাদ কেউ করলেন না। কিন্তু মীমাংসাও এখানেই শেষ হ'ল না। যাঁরা এসেছেন, কেউ তাঁদের মধ্যে ওই ফার্মের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়, গলাজলে দাঁড়িয়ে বললেও বাদল গাঙ্গুলি সেটা বিশ্বাস করে না। নরেনের ধারণা তদারকে এসে সব কথায় একেবারে মুখ বুজে সায় দিয়ে চলে যাওয়া রীতি নয় বলেই কমিটি এই প্রসঙ্গ নিয়ে পড়েছে। তা ছাড়া মুখে যত সৌজন্য প্রকাশই করুক, চিফ ইঞ্জিনিয়ারের নিস্পৃহ আপ্যায়নে মনে মনে সকলের পক্ষে তুষ্ট না হওয়াই স্বাভাবিক। অনেকটা যেন নিজেদের মধ্যেই আলোচনা চলতে লাগল। একজন বললেন, ফার্মের আসল কর্মকর্তা যিনি, তিনি নাকি বহুদিন ধরে নিখোঁজ, দুর্ঘটনায় তাঁর জীবনান্ত ঘটেছে বলেও শোনা যাচ্ছে। অতএব এর পরে আর টানা-হেঁচড়া করে লাভ কি। তাছাড়া হয়তো বা কর্মচারীরাই করেছে এই কাণ্ড, ভদ্রলোকরা হয়তো কিছুই জানেন না।

অনেকেই অনুমোদন করলেন। একেবারে জীবিকায় হাত না দিয়ে কড়া ওয়ার্নিং-এ ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলাই সাব্যস্ত করলেন তাঁরা।

চিফ ইঞ্জিনিয়ারের মুখভাব বদলাতে লাগল। নরেন চৌধুরী এবং অ্যাড-

মিনিস্ট্রেটিভ অফিসার দুজনেরই বেশ অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। বিপুল বাড়রীর দিকে তাকালো বাদল গাঙ্গুলি। সেই থেকে পাইপ টানছেন আর নির্বাক শ্রোতার মত শুনছেন। তাঁর চোখে-মুখে চাপা হাসির আভাস দেখল যেন বাদল গাঙ্গুলি। শান্ত মুখে সব কজন সদস্যকেই দেখল একবার। পরে স্পষ্ট করে বলল, কিন্তু আমি তাতে রাজী নই।

হালকা আলোচনায় অস্বস্তিকর ছেদ পড়ল একটা। কিন্তু এসেছেন যাঁরা, পদমর্যাদায় সচেতন তাঁরাও কম নন। হেসেই একজন বললেন, এই সামান্য ব্যাপারটা আপনি এত সিরিয়াসলি নিচ্ছেন কেন মিঃ গাঙ্গুলি, একটু আধটু ভুল-ত্রুটি তো লোকে ক্ষমাও করে।

প্রায় টিপ্পনীর মত শোনালো। বাদল গাঙ্গুলি জবাব দিল, ব্যাপার সামান্য হলে আমি এত সিরিয়াসলি নিতাম না, আশা করি কমিটি সে আস্থা আমার ওপর রাখবেন। ভুল-ত্রুটি আর চুরি দুটো এক জিনিস নয়। কিন্তু আমার অভিযোগ ওইটুকু চুরির বিরুদ্ধেও নয়। আমার অভিযোগ, যে মনোবৃত্তি আপনাদের ওই ড্যামের চল্লিশ ফুট চওড়া দেয়ালকে স্বচ্ছন্দে ঝাঁঝরা করে দিতে পারে তার বিরুদ্ধে। আমার মতে ঘোষ-চাকলাদার ফার্মকে ডিসমিস করতে হবে।

সকলেই চুপচাপ। বস্তুত সরকারী আমন্ত্রণে গতানুগতিক পর্যবেক্ষণে আসা, তিক্ততা সৃষ্টি করতে কেউ চান না। কিন্তু বিতর্ক উঠলে বা প্রতিকূলতার আভাস পেলে এ রীতি সব সময় খাটে না। নিজেদের অস্তিত্ব তখন একটু আধটু জাহির করেই থাকেন তাঁরা। সেই রকমই করলেন একজন। হালকা হেসেই বললেন, ধরুন, আমাদের মতামত যদি অন্যরকম হয়?

তা হলে আমি ধরে নেব, আপনারা আর কারো ডিসমিস্যাল অ্যাপ্রুভ করে যাচ্ছেন।

এরকম একটা জবাব প্রত্যাশা করেন নি কেউ। নরেন ঘেমে উঠতে লাগল। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার কোনো অছিলায় সরে পড়া যায় কি না ভাবতে লাগলেন। গুরুগম্ভীর পরিস্থিতি। তিলের থেকে তাল হ'ল যেন। একজন প্রবীণ সদস্য বলেই ফেললেন, দিস্ ইজ ট্যু মাচ!

ঠুক ঠুক শব্দ হ'ল। টেবিলে আস্তে আস্তে পাইপ ঠুকছেন চেয়ারম্যান বিপুল বাড়রী। [illegible]কটা আপন মনেই যেন। কিন্তু মুখ দেখলে মনে হয়, কোথায় যেন [illegible] আমেজ লেগেছে। ধীরেসুস্থে বললেন, ওয়েল্ জেন্টলমেন, আমার মনে হয় এই ব্যাপারে এবার আমার কিছু বলা উচিত।

থামলেন আবার। সকলেরই চোখ গেল তাঁর দিকে। বাদল গাঙ্গুলি অন্যদিকে ঘাড় ফেরাল।

—ব্যাপারটা হয়তো বা কিছুই নয়, আবার হয়তো বা অনেক কিছুই। কিন্তু আসল কথা, এই ড্যামের সমস্ত দায়িত্ব যাঁর ওপর তিনি এই ফার্মকে বিশ্বাস করেন না, আব সেই অনাস্থা নিয়ে কাজও করতে চান না।...চান না যখন, তখনই আমরাই বা বাইরে থেকে এসে এ নিয়ে জোর-জুলুম কবি কেন? উই হ্যাভ সো মেনি গুড কন্ট্রাক্টর্স্—সো মেনি ইনডিড! কাজেই আমার মতে কাজ যিনি করেছেন তাঁর ওপরেই এই ফয়সালার ভার ছেড়ে দিয়ে আমরা এ আলোচনা থেকে বিব্রত হই—আফটার অল, হোয়েন দি চিফ ইঞ্জিনিয়ার ইজ ডুইং সাচ এ ম্যাগনিফিসেন্ট জব!

পকেট থেকে শলাই বার করে নিবিষ্ট চিত্তে আবার পাইপ ধরাতে লাগলেন তিনি। কেউ আর প্রতিবাদ করলেন না কিছু। বাদল গাঙ্গুলি চেয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে।

খবরটা শোনা মাত্র খুশিতে একবারে উছলে উঠল সান্ত্বনা। ওরই এক মস্ত দুর্ভাবনার অবসান যেন। বড় সমস্যা এলে ছোট অনেক সমস্যা যেমন তলিয়ে যায়, এ কদিন তেমনি নিজের কোন কথা ভাবার অবকাশ পায় নি। কেবল মনে হয়েছে, কি হবে, কি জানি হবে। ড্যাম পরিদর্শনে যাঁরা আসছেন তাঁদের মধ্যে একটা নাম অষ্টপ্রহর উতলা করছে তাকে। তাই প্রথম খবরটা শুনেই আনন্দে আটখানা। বলে উঠল, আমি বলি নি বাবা, এত সহজে গোলমাল কিছু হলেই হ'ল! তোমরা তো ভেবে সারা!

অবনীবাবু যেমন যেমন শুনে এসেছেন বলতে লাগলেন। অর্থাৎ, কি হ'ল না হ'ল। সান্ত্বনা উত্তেজিত রোমাঞ্চিত। বাবা আবার বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারও মনে হ'ল, ঘরে বসে থাকার কোনো অর্থ হয় না। দুদিন আগেও ভেবেছে বাইরে বেরুনো এ জীবনের মতই ঘুচে গেল। কিন্তু এখন আর সেরকম মনে হ'ল না একবারও। স-প্রগল্ভ বিস্মৃতির আনন্দে উন্মুখ হয়ে উঠতে লাগল বার বার।...সরাসরি বাড়ি গিয়ে হানা দিলে কেমন হয়? অবাক হবে, আকাশ থেকে পড়বে। কিন্তু খুশি হবে। পুরুষমানুষকে আর চিনতে বড় বাকি নেই সান্ত্বনার। এক ভাত টিপলে হাঁড়ির ভাত চেনা যায়। পুরুষ-সন্নিধান-জনিত সঙ্কোচ ভয় ওর গেছে।

তবু যাবে কি যাবে না ঠিক করতেই কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেল। টিপ টিপ জল পড়ছে আবার। ক্রুদ্ধ নেত্রে সান্ত্বনা আকাশ দেখতে লাগল বার বার। আর ভিতরে ভিতরে অধীর হয়ে উঠতে লাগল। শেষে জল একটু ধরতেই দরজায় শেকল তুলে দিয়ে সোজা সামনের দিকে পা বাড়ালো।

...ডর ভয় সঙ্কোচ গেছে, তবু একজনের সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায় পথে, বিড়ম্বনার একশেষ হবে।...নরেনবাবু। পা থেমে এলো সান্ত্বনার। হয় হবে। অসহিষ্ণু চরণে অস্বস্তি মুছে ফেলে এগিয়ে চলল আবার। দেখা হলে নিজেই মুখ তুলে তাকাতে পারবে না, ওর কি!

অন্যমনস্কের মত নিজের কোয়ার্টারের দিকে চলেছে বাদল গাঙ্গুলি। আর চিন্তা নেই, উত্তেজনা নেই। তবু ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত। কিছুই ভাবছে না, ভাবতে চাইছে না। কিন্তু অন্তস্তলে কলকোলাহল চলছে একটা। নিঃসঙ্গ অবকাশে সেটা আরো মুখর হয়ে উঠবে।...এর থেকে বিপুল বাড়রী ওর বিরুদ্ধাচরণ করলে খুশি হ'ত বোধ হয়। ভদ্রলোক হার মেনে ওর উদ্যমের শিখা অনেকটা নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন।

ঘরের ভিতরটা আবছা অন্ধকার। আলনায় কোটটা ফেলে সুইচ টিপতেই বিস্ময়ে স্তব্ধ একেবারে। আরাম কেদারায় সমস্ত নারীদেহ ঢেলে দিয়ে নিঃশঙ্ক কৌতুকে চেয়ে আছে ওরই দিকে। আর হাসছে মৃদু মৃদু...।

নীলা।

একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সচেতন হ'ল বাদল গাঙ্গুলি। সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত অবসাদ কেটে গেল। সহজ হ'ল। এই মুহূর্তে অন্তত নির্মম ভাবে সহজ হতে হবে, চকিতে উপলব্ধি করে নিল সেটুকু।

নীলা বলল, বিষম অবাক হয়ে গেলে যে?

টাইটা খুলে বাদল গাঙ্গুলি সামনে এসে দাঁড়াল। জবাব দিল না। চোখে চোখ রাখল। তার চোখেও হাসির আভাস এখন।

নীলা হেসে জিজ্ঞাসা করল, চিনতে পারছো তো?

বিছানায় একধারে বসল। নিধুকে হাঁক দিয়ে বলল, চা কর্। পরে তাকালো তার দিকে। বলল, কই আর পারলাম। তারপর, তুমি কি মনে করে?

যেন দেখা-সাক্ষাৎ হয় প্রায়ই। মনে কোন দাগ নেই, ছাপও নেই।

অন্তত আগ্রহ নেই কিছু। নীলা জবাব দিল, এলাম বাবার সঙ্গে। টেবিলের ওপর নিজের ফোটোর দিকে চেয়ে তেমনি হাসতে লাগল অল্প অল্প।—কেমন আছ ?

নীলা এসেছে জানলে ফোটোটা ওখানে থাকত না নিশ্চয়ই। বাদল গাঙ্গুলির ইচ্ছে হচ্ছিল, ওর সামনেই ওই ফোটো আছড়ে ভাঙে, বলে, এই পরিণতির অপেক্ষাতেই এটা ছিল এখানে। ক্ষুদ্র জবাব দিল, ভালো।

এখানে এসে কি সব গোলাযাগের কথা শুনছিলাম, মিটে গেছে ?

হ্যাঁ, তোমার বাবা দয়া করে মিটিয়ে দিলেন।

তরল কণ্ঠে হেসে উঠল আবার নীলা। যে রকম হাসত। হেসে যেমন করে সমস্ত পরিবেশ নিজের দখলে নিয়ে আসত। সকৌতুকে চেয়ে চেয়ে দেখল আবার একটু। বলল, অর্থাৎ, তবু তোমার রাগ কোনদিন পড়বে না, এই তো ?

তোমাদের ওপর আমার কোন রাগ নেই তো।

নীলা হাসল না এবার, আবার একটু চেয়ে দেখল শুধু। পরে বলল, না থাকারই কথা, আজ যে এভাবে এসেছি সেটাই মস্ত গর্ব আমার···তবে বাবা খুব অনুতপ্ত।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে উষ্ণ হয়ে উঠছে বাদল গাঙ্গুলি। সেটা প্রকাশ হয়ে গেলেই পরাজয়। ঠাণ্ডা জবাব দিল, মরা মানুষ অনুতাপ শোনে না।

থমকে গিয়েও আবার হেসে উঠল নীলা। বলল, এত বড় একটা জ্যান্ত জিনিস গড়ে তুলছ, মরা মানুষ কি !

চিফ ইঞ্জিনিয়ার গড়ে তুলছে।

নিধু চা দিয়ে গেল। কিন্তু দিয়ে আর যাবে কোথায় ? আগেও দরজার আড়ালেই ছিল, আবারো সেখানে এসে দাঁড়াবে বলেই তাড়াতাড়ি রান্নাঘর বন্ধ করতে গেল। ওর মুখের দিকে কেউ তাকালে স্পষ্ট দেখত, এই মেয়েটার আগমন সে একটুও পছন্দ করে নি। ফিরে আসতে গিয়েই দু'পা যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেল নিধুর। বাইরে আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে একজন···।

দিদিমণি !

সহসা একটা ঘা খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে সান্ত্বনা। বাইরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ঘরে আরাম কেদারায় অর্ধশয়ান হাস্যমুখী নারী মূর্তিটি দেখেছে।

দেখে চিনছে। নিস্পন্দ কাঠ হয়ে অন্ধকার দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেছে তারপর।

ঘরের মধ্যে নীলা হাসছে তখন। বলছে, আমি কবে যাব না-যাব সে খোঁজে তোমার দরকার কি, আমি যদি আর না-ই যাই, তাহলে ?

জবাব শুনল, তাহলে আমার কাজের কিছুটা ক্ষতি হতে পারে এই পর্যন্ত।

তরল হাসি।—তা হলেই বা, তোমার থেকে তোমার কাজটাকে কবে আর বড় করে দেখেছি আমি।

অদূরে নিধুর উপর চোখ পড়ল সান্ত্বনার। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল, জীবনে এত বড দৈন্য আর আসে নি কখনো। যেমন এসেছিল, চকিতে আবার প্রস্থান করল তেমনি।

দ্রুত, আত্মবিস্মৃত···।

মেন কোয়ার্টারস ছাড়িয়ে এসে থামল। একটা পাথরের উপর বসল। বসে রইল নিশ্চল মূর্তির মত। অনেকদিন বাদে নরেনবাবুর সেই কথাগুলো যেন কানে বাজতে লাগল আবার।—ওর জীবন থেকে নীলা সরে গেছে ভালই হয়েছে···ওই মেয়ে আজও পারে ওর জীবনের সব কিছু ওলটপালট করে দিতে, এই কাজ এই নিষ্ঠা সব কিছু তছনছ করে ফেলতে।

কঠোর গাম্ভীর্যে থমথম করতে লাগল সান্ত্বনার সমস্ত মুখ।

কতক্ষণ বসেছিল ঠিক নেই। চমকে উঠল একেবারে। নিধু সামনে দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি কৈফিয়ৎ দিল, নীলা দিদিমণিকে গোস্টো হাউস-এ পৌঁছে দিয়ে ভাবলাম এদিক দিয়ে একটু ঘুরে যাই···তুমি অন্ধকারে একলাটি বসে কেন দিদিমণি ?

সান্ত্বনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে। তার পর উঠে দাঁড়াল। এমনি বসেছিলাম—এগিয়ে দেবে চলো। দু'চার পা গিয়েই শান্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল, আমি গিয়েছিলাম বাবুকে বলেছ নাকি ?

নিধু অম্লানবদনে ঘাড় নাড়ল, বলে নি।

কিন্তু বলেছে। পৌঁছে দেবার জন্য নীলা দিদিমণির সঙ্গে কোয়ার্টারসএর বাইরে এসেই চট্ করে আবার ফিরে গিয়ে বাবুকে জানিয়ে এসেছে, ওভারসিয়ার দিদিমণি এসেছিল, এসেই চলে গেছে। বাবুর মুখভাব অবলোকন করার অবকাশ অবশ্য পায় নি। তক্ষুনি চলে আসতে হয়েছে। কিন্তু আর একজনের সম্বন্ধে বাবুকে সচেতন করার কর্তব্য কিছুটা যেন না করে পারে নি নিধুরাম। নীলা দিদিমণিকে পৌঁছে দিয়ে তার পর জেনারেল কোয়ার্টারসএর দিকেই দ্রুত

পা চালিয়েছিল সে। এখানে এখন দেখা হয়ে যাবে ভাবে নি।

গড় গড় করে বাবুর গুণকীর্তন করতে লাগল নিধু। সারাক্ষণ নীলা দিদিমণির সঙ্গে একটু ভালো 'ব্যাভার' করে নি তার বাবু। সব কথায় কড়া কড়া জবাব দিয়েছে। কাল সকালে ড্যাম দেখাতে হবে বলে বলেছিল নীলা দিদিমণি, কিন্তু বাবু 'পষ্ট' জবাব দিয়েছে, তাঁর সময় নেই, অন্য লোক সঙ্গে দেবে দেখাবার জন্য। নীলা দিদিমণি বলেছে, ক'দিন ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসতে। বাবু বলেছে সময় নেই। নীলা দিদিমণি তর্ক করতে ছাড়ে নি, বলেছে সরকারী কাজ কারো জন্য আটকে থাকে না। ওব বাবু সে কথার জবাব পর্যন্ত দেয় নি, ইত্যাদি।—

কিন্তু এত বলার পরেও মুখের দিকে চেয়ে নিধুর মনে হ'ল, সুপারিশ ঠিক জায়গামত পৌঁছল না। যতই বলুক, নিধুর ভিতরেও নাড়াচাড়া পড়েছে একটা। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে এবার আস্তে আস্তে নিজের দুশ্চিন্তা প্রায় স্বীকারই করল যেন, বাবু তার যত কড়া 'ব্যাভারই' করুক, দিনকতক এরকম দেখা-সাক্ষাৎ হলে আবার সব ভুলে যাবে, বড় সেয়ানা মেয়ে এই নীলা দিদিমণি।

ঘাড় ফিরিয়ে এবার তার দিকে তাকালো সান্ত্বনা। এতক্ষণ শুনছিল চুপচাপ। সন্তর্পণে আগ্রহে শুনছিল। কিন্তু শোনার কিছু নেই আর। তাছাড়া এর পরে চুপ করে থাকাও বিসদৃশ। প্রায় রুক্ষকণ্ঠেই বলে উঠল, কি বকছ বকর বকর করে, আর আসতে হবে না, এবারে বাড়ি যাও।

নিধু দাঁড়িয়ে পড়ল।

সান্ত্বনা এগিয়ে চলল হন হন করে।

মস্ত এক দুর্ভাবনা নিয়ে বসে আছেন অবনীবাবু। কোথায় কোথায় বন্যা হচ্ছে, কোন্ কোন্ জায়গা ভেসে গেল, কোথায় কি রকম ক্ষতি হয়েছে, একটু আগে সেই বৃত্তান্ত শুনে এসেছেন। এই বন্যার ভাবগতিক ভাল নয় মোটেই, মেয়ের কাছে এই দুর্ভাবনার ফিরিস্তি দিতে লাগলেন তিনি।

কোন উদ্বেগ প্রকাশ করল না সান্ত্বনা বা একটি কথাও বলল না। মুখের দিকে চুপচাপ চেয়ে রইল।

এক বর্ণও কানে ঢোকে নি তার।

রাত্রি। ঘরের আলো নিভানো। জানালার গরাদ ধরে মূর্তির মত সান্ত্বনা

দাঁড়িয়ে। বাইরে অন্ধকার। আকাশে তারা নেই একটাও। দূরের এক কোণে অন্ধকার ফুঁড়ে বিদ্যুৎ চিকচিকিয়ে উঠছে এক-একবার।

ইচ্ছে করেই নিজের মধ্যে তলিয়ে গেছে সান্ত্বনা। যে স্মৃতি সভয়ে পরিহার করেছে বরাবর, নিজেকে দগ্ধ করে তাই নিঙড়ে নিয়ে আসছে চোখের সামনে।

—ওর মায়ের সেই স্মৃতি।

…শেষের দিকে পুরোপুরি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল মায়ের। মাটির আগুন অষ্টপ্রহর ধিকি ধিকি বুকে জ্বলত। বোবা ব্যথায় সান্ত্বনা সেই ঝলসানো মূর্তি চেয়ে চেয়ে দেখেছে। মা নয়, একখানা জ্বলন্ত কঙ্কাল। কাছে যেতে ভয় হ'ত, ছুঁতে ভয় হ'ত। শেষে বুকফাটা তৃষ্ণায়ও এক ফোঁটা জল দিতে পারে নি মুখে। মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে, বলেছে, জল তুই কোথা পেলি ?

…জল নেই কোথাও, জল পেলি কোথায় তুই ?

…জল নেই, জল নেই, ও জ্বলন্ত আগুন !

—গলানো আগুন ঢালতে এসেছিস তুই আমার মুখে, অ্যাঁ ? দূর হ' ! দূর হ' আমার সুমুখ থেকে ! দূর হ' !

—সেই তৃষ্ণার্ত স্মৃতির ওপর শান্তির সমাধি উঠছিল।—মায়াবিনী এসেছে তারা নিবিষ্টতায় ভাঙন ধরাতে।

দিগন্তে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ ঝলসে উঠছে।

—চৌদ্দ—

পরদিন সকাল।

দিনটাই যেন ভয়ে ভয়ে মুষড়ে আছে কেমন। নিস্তেজ মেঘাচ্ছন্ন। অবিরাম বর্ষণের ফলে মড়াইয়ে একটা বিষণ্ণ ছায়া পড়েই আছে। নিরানন্দ, নিরুৎসাহ দিনের গতি।

যেখান দিয়ে সচরাচর মড়াইয়ে নামে সকলে, সে জায়গাটা ছাড়িয়ে খানিকটা তফাতে গিয়ে একেবারে ধার ঘেঁষে বসল সান্ত্বনা। প্রতীক্ষা করছিল, বাবা বেরুতে সেও বেরিয়ে পড়েছে। মড়াইয়ে প্রলয়ঙ্কর ঝড় হয়ে গেছে একটা। ওর জীবনেও তেমনি ঝড় এসেছে বা আসছে। মুখে সেই স্তব্ধতার আভাস।

থেকে থেকে দু-চোখ মড়াইয়ের ওপর ঘুরে আসছে এক চক্কর করে। সন্ধানী দৃষ্টিতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে পাহাড়ী রাস্তায় লোকজনের আনাগোনা।

কাছাকাছি এসে যারা ওই উৎরাই ধরে নিচে নেমে যাচ্ছে, তাদের। নিধু বলেছিল সকালে সেই মেয়ে আসবে ড্যাম দেখতে। নরেনবাবুর মতে, চিফ ইঞ্জিনিয়ারের এই কাজ এই নিষ্ঠা সব কিছু আজও তছনছ করে ফেলতে পারে যে সে-ই মেয়ে…। আসবে কি না কে জানে। এলেই বা কি করবে ও?

জানে না। তবু এসেছে।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ সচকিত হয়ে ফিরে তাকালো। পায়ে পায়ে এই পথেই আসছে সেই ঝকঝকে মেয়ে।…একটাই পথ। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। খুঁজছে কাউকে বোঝা যায়।

সান্ত্বনার চোখে পলক পড়ে না। দুই চোখে তাকে টেনে নিয়ে আসতে চায় কাছে।

গত সন্ধ্যায় নিধুর শেষের কথা ক'টা ঠাস ঠাস করে কানে বেজে উঠল। বলেছিল, বাবু যত কড়া ব্যবহারই করুক, এরকম দেখা-সাক্ষাৎ হলেই আবার সব ভুলে যাবে…বড় সেয়ানা মেয়ে নীলা দিদিমণি…।

নীলাও দেখেছে ওকে। নিস্পৃহ দেখা। মুহূর্তে সান্ত্বনার সকল গাম্ভীর্য তলিয়ে গেল কোথায়। হাত তুলে ইশারায় ডাকল। কাছাকাছি হতে হেসে বলল, আপনি যাঁকে খুঁজছেন তিনি ও-ও-ই নিচে।

আঙুল দিয়ে দূরে মড়াইয়ের গহ্বরের একটা দিক দেখিয়ে দিল।

অবাক বিস্ময়ে নীলা চেয়ে রইল তার দিকে। আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ, ওই দিক দিয়ে নিচে নেমে যান, এখান থেকে নামতে গেলে পা হড়কে নিচে যখন পৌঁছুবেন, আর দেখতে হবে না।

আরো একটু কাছে এগিয়ে এলো নীলা। দেখল ভালো করে। এরকম যোগাযোগের জন্য প্রস্তুত ছিল না। হাসতে চেষ্টা করল একটু। আপনি আমাকে চেনেন?

খুব। ভগীরথবাবুর টেবিলে আপনাকে দেখেছি।

ভগীরথবাবুর টেবিলে! বিস্ময় ঝরল নীলার কণ্ঠে।

কলহাস্যে ভেঙে পড়ল সান্ত্বনা। নিজের কাণ্ডকারখানায় নিজেই অবাক। দম নিয়ে জবাব দিল, দেশে জল পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন ওই যে ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি—তাঁর টেবিলে।

নীলা বুঝল। কিন্তু বিস্ময় কমল না একটুও। বরং বাড়ল। নিজের অগোচরে আবারও দেখল খানিক।—তুমি, মানে আপনি কে?

সেই হাসি।—আমি? আমি সান্ত্বনা।

সান্ত্বনা কে ?

যাচ্ছেন তো ভগীরথবাবুর কাছে, তাঁর কাছেই জেনে নেবেন সান্ত্বনা কে !

যত বিস্ময় ততো কৌতূহল। হাসতে চেষ্টা করল নীলাও।—আপনার মুখেই শুনি না সান্ত্বনা কে ?

হাল্‌কা কৌতুকে তার চোখে চোখ রাখল সান্ত্বনা। খেলনাপাতি গোছের কিছু দেখছে যেন। পরে ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, নীলা সবলের সয় না, কিন্তু সেই না-সওয়ার দুঃখও পুরুষমানুষের সহজে যেতে চায় না ! তখন সান্ত্বনার দরকার···আমি সেই সান্ত্বনা। চিনলেন ?

হাসতে হাসতে অন্য দিকে ঘাড় ফেরালো। লাল হয়ে উঠছে, সেটা গোপন করার জন্যেই।

সমস্ত মুখ আরক্ত নীলার। দেখছে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, আমাকে তুমি কতটুকু চেনো ?

বড় করে সান্ত্বনা একটা নিঃশ্বাস ফেলল প্রথম। পরে মুখের দিকে চেয়ে নিস্পৃহ জবাব দিল, যতটুকু উনি আপনাকে চেনেন।

উনি কে ?

আপনাদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। একটু থেমে তাকেও সান্ত্বনা দিতে চাইল যেন, বলল, উনি যেমনই চিনুন, আমার কিন্তু কোনো রাগ নেই আপনার ওপর। বরং রোজ আপনাকে একবার করে মনে করি। আপনার কাছে ভদ্রলোক অমন ঘা খেয়েছিলেন বলেই আজ এমন একটা কাজে মন ঢেলে দিতে পেরেছেন।

ক্রোধে অপমানে ভিন্ন মূর্তি নীলার। সবই জানে মেয়েটা। পায়ের নিচে মাটি দুলছে। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আবারও খুঁটিয়ে দেখল তাকে। স-শ্লেষে বলল, আর সেই সঙ্গে সান্ত্বনাও পেয়েছেন ?

সোচ্ছ্বাসে মাথা নেড়ে সায় দিল সান্ত্বনা।

যাবার জন্য পা বাড়াল নীলা। থামল আবার। চাপা ঝাঁজে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় পাওয়া যাবে তাঁকে বললে ?

আঙুল দিয়ে সান্ত্বনা মড়াইয়ের গহ্বরই দেখিয়ে দিল আবার। পরে আল্‌তো প্রশ্ন করল, কিন্তু আজ আবার কেনই বা যাচ্ছেন তাঁর কাছে ?

'আজ' কথাটার ওপর জোর পড়তে ব্যঙ্গের মত শোনালো। নীলা দাঁড়িয়েই রইল।

সান্ত্বনা ধীরেসুস্থে বলল, কাল রাতেও গিয়েছিলেন শুনলাম কিনা···তা

কাল বোধ হয় সব বলা হয় নি আপনার। হেসে উঠল।—কিন্তু যেরকম রেগে আছেন দিনেদুপুরে লোকজনের মধ্যে ওটা কি একটা কথা বলার মত জায়গা ?

অব্যক্ত রোষে নীলা বিবর্ণ। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, তোমার সাহস তো কম নয়!

কি বলছে বা বলেছে, কি করছে বা কি করেছে হুঁশ নেই সান্ত্বনার। কিন্তু এটুকু খেয়াল আছে, যে নাটকে হাত দিয়েছে তার শেষটুকু এখনো বাকী। সহাস্যে জবাব দিল, দেশে-গাঁয়ে জলে-জঙ্গলে মানুষ কিনা···ওটুকুই আছে। ঘুরে বসল, তাকালো সোজাসুজি, হাসি মিলিয়ে গেল। বেশ স্পষ্ট মোলায়েম করে বলল, ওঁর কাছ থেকে একটা জিনিস আপনি চেয়ে নেবেন। ওঁর টেবিলে আপনার যে ফোটোখানা আছে সেইটে। ওটা আমি সরাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু উনি সরাতে দেন নি।···পাছে আপনাকে তিনি ভুলে যান, পাছে অমন একটা অবিশ্বাসের ব্যাপার মন থেকে মুছে যায়। নিজে মেয়ে বলেই চোখের সামনে অন্য কোনো মেয়েকে এভাবে ছোট করাটা মাঝে মাঝে অসহ্য লাগে··· লজ্জাও করে।

হয়েছে। শেষটুকু শেষ হয়েছে এবারে। পায়ে পায়ে পাথুরে রাস্তাটাকে ঘা দিতে দিতে সবেগে চলে যাচ্ছে নীলা। যতক্ষণ দেখা যায় তাকে, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল সান্ত্বনা। উত্তেজনা কমে আসছে। সচেতন অবসাদে ভরে উঠেছে। স্থির কঠিন, পাথর-মূর্তি।

অফিস-কোয়ার্টার থেকে গাড়ি ট্রাক নিয়ে গেস্ট হাউসে উঠে যাবে নীলা। কিন্তু অফিস-প্রাঙ্গণে অপ্রত্যাশিত দেখা একজনের সঙ্গে। নরেন চৌধুরী। নীলা দাঁড়িয়ে গেল।

ওকে দেখে নরেনই এগিয়ে এলো। হাত তুলে নমস্কার জানালো।

নিজেকে সংযত করে প্রতি-নমস্কার করল নীলা। একে দেখে মনে মনে অবাক হয়েছে, কিন্তু প্রকাশ পেল না। বলল, আপনিও তাহলে এখানেই কাজ করছেন ?

হ্যাঁ, এখানেই পড়ে আছি। আপনি ভালো আছেন ?

খুব। সহজ হতে চেষ্টা করছে নীলা।

ড্যাম দেখলেন ?

দেখলাম। নীলা লক্ষ করছে ওকে। কলকাতায় বাদল গাঙ্গুলি মাঝে ছিল বলেই যেটুকু আলাপ এর সঙ্গে। তবু মানুষটার ধরণ-ধারণ ভালই জানে। দেখা হলে অল্পস্বল্প রসিকতা হ'ত। এখনো প্রায় তেমনি করেই নীলা জিজ্ঞাসা করে বসল, আপনার বন্ধু না হয় এখানে এসে সান্ত্বনা পেয়েছেন,

আপনি পড়ে আছেন কোন্ আশায় ?

নিজের অজ্ঞাতে কত বড় ধাক্কা দিয়েছে নীলা জানল না। জানলে খুশি হ'ত। বিমূঢ় নেত্রে নরেন চেয়ে রইল তার দিকে।

দেখছেন কী ?

না, কিছু না। চকিতে সামলে নিতে চেষ্টা করল নরেন। কিন্তু খুব সহজ হ'ল না সেটুকু। ওর কথাগুলো ঝিম ঝিম করছে মাথার মধ্যে। বলল, আর একটু খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করুন, এ মাথায় হেঁয়ালি ঢোকে না জানেন তো…।

নীলা চুপচাপ দেখল দু'চার মুহূর্ত। খোলাখুলিই জিজ্ঞাসা করল তার পর, সান্ত্বনাকে চেনেন আপনি ?

খুব। ··আপনি চিনলেন কি করে ?

সে নিজেই চেনালে। অনেক কথা বলল আর অনেক কিছু বুঝিয়ে দিল। নীলা থামল আবার, তাকালো সোজাসুজি। মেয়েটা যা বলল সব সত্যি ?

তার বক্তব্য স্পষ্ট। জানতে যা চায় সে-ও স্পষ্ট। তবু দুর্বোধ্য লাগছে নরেন চৌধুরীর কাছে। অনেক কথা কি বলল সান্ত্বনা, অনেক কিছু কি বুঝিয়ে দিল! ··বন্ধু সান্ত্বনা পেয়েছে, তাই ? শান্ত মুখেই জবাব দিল, কি বলল মেয়েটা আর কি বোঝালো না জানলে বলি কি করে ?

নীলার সহিষ্ণুতা গেছে। উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, না বললে বোঝেন না অমন সাদা মাথাও আপনার নয়, দয়া করে জবাবটা দিন।

তবু জবাব দিতে সময় লাগল নরেন চৌধুরীর। বন্ধু সান্ত্বনা পেয়েছে কি না সেই জবাব…। অভ্যস্ত কৌতুকের আবরণ টেনে আনতে চেষ্টা করল মুখে। হাসতে চেষ্টা করল।

প্রচ্ছন্ন ঝাঁজে নীলা আবার জিজ্ঞাসা করল, সত্যি সব ?

এবারে জবাব দিল। বলল, কিছু যদি বলে থাকে সেটা সত্যি, মিছে বলাটা তার স্বভাব নয়।

দৃষ্টি বিনিময়। কয়েক মুহূর্ত।

ধন্যবাদ। দয়া করে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিন, ওপরে যাব।

অলস পায়ে ফিরে চলল নরেন। একজনকে ডেকে ট্রাক আনতে নির্দেশ দিল।

পাহাড়ী চড়াইয়ের কাছাকাছি আসার অনেক আগেই পা থেমে গেছে সান্ত্বনার। দাঁড়িয়ে দেখছে নিস্পন্দের মতো। ট্রাক এলো। অফিস-কোয়ার্টার পেরিয়ে, ভুতুবাবুর দোকান ছাড়িয়ে নীলা এসে উঠল ট্রাকে। ট্রাক চলে গেল। অফিস-কোয়ার্টারের আঙিনায় মূর্তির মত দাঁড়িয়ে নরেন চৌধুরী।

ট্রাক চলে যেতে ঘুরে দাঁড়াল মানুষটা।...সান্ত্বনাকে দেখল বোধ হয়। চুপচাপ দাঁড়িয়েই রইল।

এ পথটা পেরিয়ে সান্ত্বনা যাবে কি করে ওপরে, ভেবে পাচ্ছে না। কিছুই ভাবতে পারছে না। কি করছে তাও না, কি করবে তাও না। দাঁড়িয়ে থাকা আরো বিসদৃশ। এগোতে লাগল।

সামনে ভুতুবাবুর দোকান। ভুতুবাবু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। ওকে দেখছে। বিগলিত বদনে হাসছে, যেমন হাসে। মাথা গোঁজ করে এগিয়ে আসছে সান্ত্বনা।

গতি শিথিল হ'ল আরো।

চকিতে এক পলক দেখে নিল। দু-পা অগ্রসর হয়ে একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল নরেন চৌধুরী। দু চোখ সোজাসুজি ওর দিকে। সান্ত্বনার মনে হ'ল হাসছে একটু একটু। সেদিনের সেই নির্মম স্পর্শ এত দূর থেকেও যেন ছেঁকে ধরছে ওকে।

রাস্তার এক পাশ ধরে মাথা নিচু করে চলতে লাগল সান্ত্বনা। মুখ তুলে আর তাকাল না একবারও। ভুতুবাবুর প্রত্যাশিত মুখের দিকেও না। মনে মনে একটা জ্বালা অনুভব করতে চেষ্টা করল সান্ত্বনা। সেই পুরুষ-স্পর্শ নিপীড়নের জ্বালা।

কিন্তু তাও পারছে না। সর্বাঙ্গ অবসাদে ভরা। পা আর চলে না। এত পথ পেরিয়ে বাড়ি যাবে কেমন করে!

"—নীলা হারিয়ে সান্ত্বনা পেয়েছ। তোমার সান্ত্বনা আর নরেনবাবুর মুখেই শুনলাম সব। খুশির কথা। ফোটোখানা নিয়ে গেলাম। কি জন্যে সযত্নে ওটা চোখের সামনে রেখেছিলে তাও শুনেছি। তুমি বড়। কিন্তু বড়র কি এমন ব্যঙ্গ সাজে? আর বোধ হয় দেখা হবে না। চলি, নীলা।"

অফিস-ফেরত এখনো জামা-কাপড় বদলানো হয় নি বাদল গাঙ্গুলির। ডেক্‌চেয়ারে বসে আছে সেই থেকে। মাঝে মাঝে পড়ছে চিঠিটা। কতবার পড়ল ঠিক নেই।

বেলা তিনটে নাগাদ অফিসে বসেই খবর পেয়েছে এক্সপার্ট কমিটি চলে

গেলেন। নীলা এবং তার বাবাও। বাদল গাঙ্গুলি মস্ত এক দুঃসংবাদ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল তখন। উজানে বন্যা হয়ে গেছে যে চার-পাঁচটা পাহাড়ী নদীতে, তার সর্বনাশা গতি মড়াইয়ের দিকে। চারদিক থেকে সতর্ক-বাণী আসছে। এরই মধ্যে নীলার এমন অপ্রত্যাশিত বিদায়ের সংবাদ। সমস্ত দিন আর অন্য কোনো চিন্তা-ভাবনায় মন বসল না। হার স্বীকার করে শ্রদ্ধার ডালি নিয়ে এলে শত্রুর উপরে রাগ থাকে না। নীলার সঙ্গে বা তার বাবার সঙ্গে কাল বাইরের আচরণ যেমনই হোক, নিরিবিলি অবকাশে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল। ভবিতব্যের চাকা যেমন করে ঘুরলে বা যতটা ঘুরলে অন্তস্তলের সেই নিবিড় জ্বালা জুড়োতে পারে, ততটাই ঘুরেছে। সকালেই একবার দেখা হবে নীলার সঙ্গে, এবকম একটা সঙ্গোপন আশা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল মনে। বিকেলে কোয়ার্টারএ আসবে এ একরকম ধরেই নিয়েছিল। শুধু নীলা নয়, নেশান বিলডার্স-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বিপুল বাড়রীও আসবেন নিঃসংশয় ছিল।

কাজে মন দিতে চেষ্টা করেছিল বাদল গাঙ্গুলি। সময় নষ্ট করার সময় নেই। কিন্তু খবরটা যেন কাঁটার মত বিঁধতে থাকল খচ-খচ করে। সন্ধ্যের আগে কোয়ার্টারে ফিরে ঘরে ঢুকতেই প্রথম চোখ গেল টেবিলের ওপর। নীলার ফোটো নেই, শূন্য ফ্রেমটা আছে। আর ওই চিঠি।

বিমূঢ় বিস্ময় কাটতে নিধুর তলব পড়ল। নিধু জানালো, নীলা দিদিমণি এসেছিলেন, ফোটো নিয়ে গেছেন আর ওই চিঠি লিখে রেখে গেছেন।

গম্ভীর মুখেই সংক্ষিপ্ত বারতা জ্ঞাপন করল নিধু। কিন্তু বাবুর মুখের দিকে চেয়ে ভয়ে ভিতরটা গুরগুর করছে। আধঘণ্টার চেষ্টায় বানান করে পড়ে চিঠির মর্ম মোটামুটি সেও উদ্ধার করে রেখেছে বৈকি। পাছে সেটা ধরা পড়ে, পাছে ওর খুশিভাব মনিবের চোখে পড়ে সেই জন্য সতর্ক, গম্ভীর। কিন্তু এখন সমুখ থেকে সরতে পারলে বাঁচে। ঝকঝকে ফোটো-ফ্রেমটা এবারে একদিন ওর ঘরে ওর টেবিলে গিয়ে উঠতে পারে, সামনে দাঁড়িয়ে সেই গোপন প্রত্যাশাও সম্প্রতি মুছে গেছে নিধুর মন থেকে।

বাদল গাঙ্গুলি চুপচাপ বসে। গত রাত্রিতে নীলা যখন এসেছিল তখন সান্ত্বনাও এসেছিল। চিঠি পড়ার সঙ্গে সেটা মনে হয়েছে। তারপর সেই মেয়ে দেখা করেছে নীলার সঙ্গে। দেখা করে এমন কিছু বলেছে যার অর্থ চিঠিতে অস্পষ্ট নয় একটুও। শুধু সে বলে নি, নরেন চৌধুরীও বলেছে কিছু। এমন কিছু যা নীলা বিশ্বাস করেছে। বিশ্বাস করে ওর সঙ্গে একবার দেখা

না করেই চলে গেছে।

অসহিষ্ণু উত্তেজনায় আর বসে থাকা গেল না। ঘরময় পায়চারি করল বার কতক। থম থম করছে সমস্ত মুখ। বাদল গাঙ্গুলি নয়, চিফ ইঞ্জিনিয়ার সজাগ হয়ে উঠেছে আবার।

নিধুর ডাক পড়ল আবারও। নরেনবাবুকে এখনি খবর দেবার নির্দেশ শুনে নিধু করুণ নেত্রে বাইরের দিকে তাকালো একবার। বাইরে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে তখন, পরোক্ষে সেদিকেই মনিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করল নিধু।

চেষ্টা করে ধমক খেল একটা। অগত্যা হুকুম তামিল করতে চলল। আর মনে মনে ঠিক করল, বেরুতেই হবে যখন, নরেনবাবুকে খবর দিয়ে ওভার-সিয়ার দিদিমণির কাছেও ঘুরে আসবে একেবার। নিধুর নিজস্ব বিচার-বুদ্ধিতে নীলা দিদিমণির চলে যাওয়ার খবরটা সেখানেও জানানো দরকার বলে মনে হ'ল।

সকালের ধাক্কাটা নরেন চৌধুরী সামলে উঠতে পারে নি বটে, কিন্তু তার সহিষ্ণুতা অন্যরকম। ভিতরে যাই হোক, বাইরে প্রকাশ কম। নিরাসক্ত মনোযোগে কাজে ডুবে থাকতে চেষ্টা করেছে। মাঝে মাঝে শিস দিয়েছে, কানকাঠি বার করেছে পকেট থেকে। যত বেলা বেড়েছে, সিগারেট পুড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। কামাই নেই বললেই হয়।

নীলার চলে যাওয়ার সংবাদ সেও জানে। সকলেই জানে। খবর দিয়ে নিধু চলে যাবার পরেও সে চুপচাপ বসে রইল অনেকক্ষণ। সৃষ্টির কাজে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ-সম্ভাবনা রীতিমত সঙ্কটের কারণ এখন। মাটির সাময়িক অবরোধে-প্রাচীরের ওধারে জল অনেকটাই ফুলে উঠেছে, ফেঁপে উঠেছে, প্রতিদিন বাড়ছে। এ নিয়ে ভাবনা-চিন্তার কারণ যথেষ্ট আছে, আলাপ-আলোচনার দরকার আছে। কিন্তু তবু নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করছে নরেন চৌধুরী, এই মুহূর্তের এই ডেকে পাঠানোটা কর্ম-সংশ্লিষ্ট নয়। ডাক পড়েছে ব্যক্তিগত কারণে…।

হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল নরেন চৌধুরী। একটু বাদে অন্য-মনস্কের মত আবার একটা সিগারেট ধরালো। দু'চার টান দিয়ে সেটাও ফেলে উঠে দাঁড়াল। বন্ধু ডেকেছে। কোনদিন উপেক্ষা করে নি নরেন চৌধুরী। আজও যেতে হবে। শুনতে হবে কি বলে। পরামর্শ দিতে হবে। কিন্তু আজকের এই ডাক কাটা ঘায়ে কাঁটার মত বিঁধছে।

বাইরের ঘরেই বসেছিল বাদল গাঙ্গুলি। প্রতীক্ষা করছিল। শান্ত, গম্ভীর। ভেজা রেন্‌-কোট গা থেকে খুলতে খুলতে সহজ হাল্‌কা কণ্ঠে নরেন

বলল, কি ব্যাপার! অসময়ে ওপরঅলার জরুরী তলব একেবারে?

জবাব পেল না। রেন্-কোট একটা কাঠের চেয়ারের কাঁধে ফেলে ওয়াটারপ্রুফ টুপী খুলে তার ওপর রাখল নরেন চৌধুরী। পরে মুখোমুখি বসে পকেট থেকে রুমাল বার করে জলের ছাট মুছতে মুছতে তাকালো তার দিকে।

বাদল গাঙ্গুলি স্থির চেয়ে আছে। এবারে কথা বলল। সংযত নিরুত্তাপ। —অসময়ে ওপরঅলা তলব পাঠাতে পারে সেটা বোধ হয় একেবারে ভুলে গেছ, না?

নরেন চৌধুরী হতভম্ব। এতকালের হৃদ্যতার মধ্যে এমন উক্তি আর শোনে নি কখনো। সেই মুহূর্তে বুঝে নিল, ওকে ডেকে পাঠানো হয়েছে ওরই সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হবে বলে।

আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, মনে রাখতে বলছ?

বলতে বাধ্য হচ্ছি।

বেশ মনে থাকবে। হেতুটা জানতে পারি?

জবাব না দিয়ে নীলার চিঠিখানা তার দিকে বাড়িয়ে দিল বাদল গাঙ্গুলি। চিঠি নিল। পড়ল। একবার···দুবার। চিঠি রাখল টেবিলের ওপর। তাকালো। বাদল গাঙ্গুলির দু চোখ তার মুখের ওপর সংবদ্ধ। রূঢ়, কঠিন প্রতীক্ষা। বলল, এবারে ওপরঅলা কিছু জবাব চাইতে পারে বোধ হয়?

নিজের অজ্ঞাতে পকেটে হাত ঢোকালো নরেন চৌধুরী। কানকাঠি···। না, কানকাঠি চায় না। সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই। সিগারেট ঠোঁটে ঝোলালো। অগ্নি-সংযোগ করল। একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর হাল্কা জবাব দিল, কাল সকালে অফিস থেকে নোট পাঠিও, জবাব দেব।

নরেন! ধৈর্যচ্যুতি ঘটল এবারে।—সব কিছুরই একটা মাত্রা থাকা দরকার।

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আবারও তেমনি নিস্পৃহ মুখে নরেন বলল, হ্যাঁ, সামান্য একটা চিঠি পেয়ে মাত্রা ছাড়িয়েই যাচ্ছ। কিন্তু কি জন্যে ডেকেছ আমাকে? কি জানতে চাও?

নীলাকে তুমি কি বলেছ?

এমন কিছু বলি নি যার জন্য তুমি আমায় এভাবে ডেকে এনে এত কথা বলতে পারো!

ক্রোধে, অবিশ্বাসে রুক্ষতর হয়ে উঠল বাদল গাঙ্গুলির মুখ।—বলো নি?

না। একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত শব্দ নরেন যেন ঠাস করে ছুঁড়ে দিল তার মুখের ওপর।

বাদল গাঙ্গুলি থমকে গেল একটু। কিন্তু দুই-এক মুহূর্ত মাত্র। চেয়ে আছে। দেখছে।—নীলা হারিয়ে আমি সান্ত্বনা পেয়েছি, কেমন ?

সিগারেট ফেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নরেন চৌধুরী। রেন্-কোট হাতের ভাঁজে ফেলে টুপী তুলে নিল। পরে পাল্টা নিরীক্ষণ করল তাকে ক্ষণকাল। জবাব দিল, ভেবেছিলাম পেয়েছ। কিন্তু এখন দেখছি, আমারই মত ঘোলাটে বরাত তোমারও।

নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল ঘর থেকে।

বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি তেমনি। হনহনিয়ে চলেছে নরেন চৌধুরী। সর্বাঙ্গ ভিজে জবজবে। হাতে রেন্-কোট আর টুপী।

প্রথম বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিল মাটির সাময়িক অবরোধ-প্রাচীর নিয়ে।

এর স্ফীতি বা প্রতিরোধ-ক্ষমতা কম নয়। বন্যার বা বর্ষার প্রচণ্ড নিম্ন-মুখী গতি এইখানে এসে থেমেছে। শেকলে বাঁধা কয়েদীর মত দু'চারটে কৃত্রিম পরিখার পথে এই জলস্রোত মুক্তির আস্বাদন পায় একটু-আধটু। নয়ত এখানে এসে গুমরে গুমরে ফুলে ওঠে।

এই সাময়িক অবরোধ নিয়ে মাথা ঘামায় নি কেউ কোনদিন। এত বড় সৃষ্টি-সমারোহের মধ্যে ওটার ভূমিকা ছিল উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত। ওর বাইরে জল বাড়ছে দিনে দিনে। বাড়বে সকলেই জানে।

সাতমহলা বাড়ির পাশে আগাছার মত তিলে তিলে বেড়ে ওঠা পথের ছেলেটা ডাকাত হয়ে যখন ওই সাতমহলা বাড়ির দিকেই দৃষ্টিপাত করে প্রথম, বিভ্রান্ত বিমূঢ় বিস্ময়ে তখন তাকে চেয়ে দেখে মহলবাসীরা। এ-ও তাই যেন। সাময়িক অবরোধের ওধারে দিনে দিনে জল ফেঁপে উঠছে, ফুলে উঠছে—সকলেই দেখছে। কিন্তু তেমন করে লক্ষ্য করে নি কেউ। একটানা দুর্যোগে ড্যামের কথা নিয়েই মাথা ঘামিয়েছে সবাই। কিন্তু বন্যার অঘটনে সকলের সব চোখ আর সচকিত মনোযোগ এসে পড়ল এই দিকে।

এই বিশাল মাটির অবরোধ এমনিতে টলবে না একটুও। কিন্তু জল যেভাবে ফেঁপে উঠছে, যদি ওটা ছাড়িয়ে উঠতে পারে, ভাঙন অবধারিত। সেই সম্ভাবনা এখন। জল এখন আর ওটার কাঁধ থেকে নিচে নয় খুব।

কি করবে? কৃত্রিম পরিখাগুলো খুলে দেবে? যতক্ষণ সম্ভব তাই করা হয়েছে। আর সেটা সম্ভব নয়। গ্রামকে গ্রাম ভেসে যাবে তাহলে। এমনিতেও যেতে পারে, কিন্তু শ্বাস যতক্ষণ, আশা ততক্ষণ। আর বন্যার তোড় তেমন বাড়লে ওই করেই বা কি হবে। দুদিকের পাহাড়ে বাধা পেয়ে অবরুদ্ধ জল ফেঁপে উঠবেই ওপরের দিকে।

একটি মাত্র পথ আছে। একটি মাত্র চেষ্টা করা যেতে পারে। মাটির ওই বিশাল অবরোধ উঁচু করো আরো। পাথর ঢালো, বালির বস্তা ফেলো, মাটি ঢালো। যেখানে ভাঙনের সম্ভাবনা সেখানেই ঢালো মাটি, ঢালো পাথর, ফেলো বালির বস্তা। রাতারাতি উঁচু করো অবরোধ-প্রাচীর। কোনো দিক দিয়ে আসতে দিও না ওই অবরুদ্ধ জল।

ক্ষিপ্ত উত্তেজনায় বাদল গাঙ্গুলি ড্যামের সমস্ত জনশক্তি নিয়োগ করলে এদিকে। আরো আগেই করা উচিত ছিল। আরো আগেই করত। আকাশ বাতাসের বিরুদ্ধাচরণ শুরু হয়েছে আজ নয়, অনেক—অনেকদিন ধরে। এরকম প্রবল বন্যা-সঙ্কট অভাবনীয়। কিন্তু এমন দীর্ঘকালের দুর্যোগে তাও ভাবা উচিত ছিল। বিশেষ করে পাহাড়-ঘেরা অঞ্চলের প্রাকৃতিক বিঘ্ন যেখানে এরকম। প্রথম যখন বন্যার খবর আসে তখন থেকে এদিকে প্রস্তুত হলেও কটা দিন হাতে পেত। হয় নি, কারণ, এক্সপার্ট কমিটির আসন্ন সফর চিফ ইঞ্জিনিয়ারের অন্তর্দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাদের আসার দিনকতক আগে থেকেই অবিরাম একটা কল্পিত বিরোধের সঙ্গে যুঝতে হয়েছে তাকে।

…আর তার পরেও দুটো দিন কেটেছে এক মর্মচ্ছেদী বিভ্রান্তির মধ্যে, আত্মবিস্মিত বিহ্বলতার মধ্যে। এই সঙ্কটে দুটো দিনের কর্মশৈথিল্যও কম কথা নয়। প্রতিটি দিন, প্রতিটি ঘণ্টা দুর্মূল্য এ সময়ে।

ঢালো মাটি! ঢালো পাথর! ফেলো বালির বস্তা! উঁচু করো—যত পারো উঁচু করো ওই অবরোধ! যত লোক আছে আনো এদিকে! পরিবহন যন্ত্রগুলো সব লাগাও এ কাজে!

ক্ষিপ্ত কাজের তাগিদে গোটা মড়াইসুদ্ধ লোক সচকিত হয়ে উঠল আবার। কাজ চলল সমস্ত দিন, সমস্ত রাত। বৃষ্টির মধ্যে, দুর্যোগের মধ্যে। ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটতে লাগল আবার একটা দুটো করে। কিন্তু তা নিয়ে শোক করার সময় নেই কারো। শোক পরে হবে। কে গেল কে থাকল তার হিসেবনিকেশ পরে হবে। ঢালো পাথর। ফেলো বালির বস্তা। ঢালো মাটি।

কিন্তু এর মধ্যেও ক্রোধে এবং দুর্বার আক্রোশে মাঝে মাঝে স্তব্ধ হয়ে

পড়ছে বাদল গাঙ্গুলি।···এই সব কিছুর জন্যেই যেন দায়ী ওই মেয়ে ··ওই ওভারসিয়ারের নগণ্য এক মেয়ে। যে ওকে বিভ্রান্ত করেছে, বিহ্বল করেছে। চক্রান্ত করে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে নীলার সঙ্গে। এতকালের বন্ধুত্বের অবসান ঘটিয়েছে নরেন চৌধুরীর সঙ্গে।

নীলা এসেছিল নত হয়ে, এসেছিল চীফ ইঞ্জিনিয়ারের জয়ের আর গৌরবের স্বীকৃতি নিয়ে। এত দিন শুধু এরই প্রতীক্ষায় ছিল বাদল গাঙ্গুলি। এই জয়ের আর এই গৌরবের। এই সমর্পণের। শুধু এরই জন্য যা কিছু, সব কিছু। বাদল গাঙ্গুলির মনে হ'ল, অপরিসীম স্পর্ধায় তার এত দিনের সব সাধনাই যেন নিষ্ফল করে দিয়েছে তারই অধীনস্থ সামান্য এক কর্মচারীর মেয়ে।

অধীনস্থ সামান্য কর্মচারীর এই মেয়েটিই দিনে দিনে অসামান্য হয়ে উঠেছিল তার চোখে, এই ক্ষোভের মুহূর্তে সেই দুর্বলতা বিস্মৃত হয়েছে সম্পূর্ণ। তার মরুব্যর্থ যান্ত্রিক জীবনে সবুজের রোমাঞ্চ নিয়ে আসছিল এই সামান্য মেয়েই, সে-ও আর মনে নেই। ড্যামের প্রতি এই সামান্য মেয়ের তন্ময় আকর্ষণ আর তার সহজ উচ্ছল প্রাণ-প্রাচুর্য কত দিন আনমনা করেছে তাকে, আজকের নির্মম রোষে সেই স্মৃতি তলিয়ে গেছে। মাসির বাড়িতে অই সামান্য মেয়েটি দু মাস গিয়েছিল যখন, কাজের নিবিষ্টতার মধ্যেও মড়াই তখন নীরস লাগত মাঝে মাঝে, আজ সে সত্য স্মরণাতীত। আর, নিরিবিলি অবকাশে এই সামান্য মেয়েকে ঘিরেই একদিন যে এক অবান্তর কথা মনে জেগেছিল—ভারি খুশি হ'ত তার মা এই মেয়েটিকে দেখলে—সেই অনুভূতিও এখন নিশ্চিহ্ন।

এত বড় প্রাকৃতিক অঘটন সম্ভাবনার প্রতিরোধ-ব্যস্ততা এবং দুশ্চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে এখন শুধু একটি মাত্র কঠিন প্রতীক্ষার স্তব্ধতা।

···নির্মম এক বোঝা-পড়ার প্রতীক্ষা।

দিন-দুই একরকম আচ্ছন্নের মত কেটে গেল সান্ত্বনার। কিছুই ভাবল না, কিছুই ভাবতে পারল না। সারাক্ষণ একটু ঘুম-ঘুম ভাব। অথচ ঘুম যে আসে খুব তাও না। ভাবনা-চিন্তা সব বাতিল করে দিয়েছে। পরে ভাববে, পরে চিন্তা করবে। আজ নয়, আর একদিন। অন্য একদিন। অন্য কোন দিন।

কিন্তু দু'দিন বাদেই এ ভাব কেটে গেল। গা ঝাড়া দিয়েই নড়েচড়ে সজাগ হ'ল। নিজের মধ্যে আবারও যেন সেই দুর্গম রহস্যের সন্ধান পেল। অন্তস্তলের সেই বিচিত্র-রূপিণীকে সামনাসামনি দেখল যেন। মড়াইয়ে আসার পর দিনে

দিনে, বহু পরিস্থিতিতে, বহু অনুকূল-প্রতিকূলতার মধ্যে, বহুজনের দৃষ্টিপথে যার চেতনার উন্মেষ। এতদিন শুধু আভাস পেয়েছে, উপলব্ধি করেছে আর রোমাঞ্চিত হয়েছে। সাহস করে একেবারে উদ্‌ঘাটন করে দেখে নি নিজেকে, অনাবৃত করে দেখে নি। এবারে দেখল। আর উপলব্ধির জোয়ার উপচে উঠতে লাগল।

কি আবার ভাববে? কি চিন্তা করবে?

যা করেছে ও-ই করেছে, ও-ই শুধু করতে পারে।

দেশবিদেশের খবর রাখে না সান্ত্বনা। ইতিহাসের নজির জানে না। বিপুল নারী-মহিমা কত ইতিহাসে গড়েছে আর কত ইতিহাস ভেঙেছে তার জানা নেই। কোথায় কত দেশের কত মানচিত্র বদলে দিয়েছে জানা নেই। কিন্তু ওর সমস্ত সত্তার সেই শাশ্বত গরবিণীকেই যেন অনুভব করছে থেকে থেকে। আনন্দে, আত্মপ্রাচুর্যে ভরে ভরে উঠেছে।

ভাবনার আবার কি আছে? চিন্তারই বা আছে কি? সব ভাবনা-চিন্তার অবসান তো করেই ফেলেছে!

ও-ই করেছে, ও-ই পেরেছে।

প্রাকৃতিক অঘটন সম্ভাবনার খবর কানে আসছে। সকলের ভাবনা চিন্তা আর উত্তেজনার আভাস পাচ্ছে। কিন্তু এ আর তেমন বড় করে দেখছে না সান্ত্বনা! ওর অন্তরের অনুভূতির সবল জোয়ারের বেগ ওই বন্যার থেকে কম নয়। প্রকৃতির মধ্যে বাস করছি, তার অঘটন ঠেকাব কি করে? সে আসবেই। আবার বাঁচার তাগিদে মানুষই তাকে প্রতিরোধ করবে। যেমন করে পারে ঠেকাবে তাকে। ঠেকাবেই। নইলে আজ ড্যাম হ'ত এখানে? হ'ত?

সান্ত্বনার গর্ব আর ধারণা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের থেকেও অনেক, অনেক বড় বিপর্যয়ের সম্ভাবনা প্রতিরোধ করেছে ও নিজে। একা। সৃষ্টি-কাজের নিষ্ঠায় ফাটল ধরতে দেয় নি। একদিনের জন্যও যজ্ঞনাশ হতে দেয় নি।

থেকে থেকে উসখুস করতে লাগল কেমন। একবার গেলে কেমন হয়?

গেলে কেমন হয় কি! যাবেই তো। এটুকু বাকী বলেই এরকম লাগছে··· কি না জানি করছে মানুষটা। কি জানি ভাবছে।

হাসি পেয়ে গেল সান্ত্বনার। বেচারী···।

কিন্তু সত্যি দুঃখ হ'ল না তা বলে। ভিতরে ভিতরে সেই সবল নিশ্চিন্ততা বোধ···শেষ পর্যন্ত মানুষটার লোকসান হবে না এক কণাও। সব লোকসান পুষিয়ে দেবে ও।

এবারে হেসেই ফেলল সান্ত্বনা। নিজের উদ্দেশেই ভ্রূকুটি করে উঠল একটু।

যাবার কথা মনে হতেই চনমন করে উঠল। এতটুকু সঙ্কোচ নেই আর। পুরুষ-সন্নিধানজনিত সব সঙ্কোচ আর ভয় ঘুচিয়ে দিয়েছে আর একজন। নরেন চৌধুরী। মনে হতেই বিমনা হয়ে পড়ল একটু। অনুকম্পার ছায়া নামল মুখে।

…বেচারী।

সদ্য-জেগে-ওঠা এই আত্মপ্রাচুর্যে ওর কাছে নরেন চৌধুরীও বেচারী পর্যায়ে গিয়ে পড়ল আজ। কিন্তু তার জন্য ভারী নিঃশ্বাস পড়ল একটা। আর তার ওপর কোন অভিযোগ নেই সান্ত্বনার, কোন বিদ্বেষ না।

…তার লোকসান থেকেই গেল।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আকাশে সেই একটা দুর্যোগ। ক্ষণেক থামছে, ক্ষণেক ঝরছে।…মরুক গে, ও বেরুবেই আজ। জলের ভয় আবার কবে করেছে। চারটে দিন কেটে গেল কোথা দিয়ে। কাপড় জামা বদলে নেবার জন্য ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে দাওয়া ছেড়ে ঘরে ঢুকল। বাবার বকুনির ভয় নেই আপাতত। বন্যা-সঙ্কটের চাপে পড়ে কখন কত রাতে বাড়ি ফেরেন ঠিক নেই।

ঘরে এসে দু'চার মুহূর্ত ভাবল কি। আটপৌরে বেশবাসেই বেরোয় সর্বদা। বছরান্তে মাসির দেওয়া ভালো শাড়িগুলোতে মড়াইয়ের আলো বাতাস লাগে নি। কিন্তু জলেকাদায় নষ্ট হতে পারে। হোক গে। আলমারি খুলে পোশাকী শাড়িগুলো থেকে মোটামুটি সাধারণ গোছের একটা টেনে বার করল। তবু লজ্জা-লজ্জা করছে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত প্রসাধন সেরে নিতে লাগল। দুই ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস। চোখ দুটো চকচক করছে নিজের দিকে চেয়ে।

কিন্তু চকিতে কি মনে হতে স্তব্ধ অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিক। মনে হ'ল আয়নায় ওর ওই চোখের মধ্যে যেন চাঁদমণির সেই আগের দিনের হাসি ফুটে উঠেছে, আর ঠোঁটের ফাঁকে চাঁদমণির লাস্য!…আর একদিনও চাঁদমণির কণ্ঠস্বর শুনেছিল নিজের কণ্ঠে। পাহাড়ের সেই সর্বনাশা নিরিবিলিতে যেদিন নরেনকে ডেকেছিল ওর পাশে পাথরে এসে বসতে।

তাড়াতাড়ি আয়নার কাছ থেকে সরে গেল সান্ত্বনা।

অন্ধকার নির্জন পথ ধরে যেন কোয়ার্টারস-এর দিকে চলেছে। চাপা হাসি-টুকু চাপতে পারছে না এখনো। নরেনের একদিনের টিপ্পনী মনে পড়ে। যেদিন এই মড়াইয়ের পাহাড়ে সবই সম্ভব বলে ঠাট্টা করেছিল। কিন্তু না, ওই লোকটির কথা এখন অন্তত একবারও ভাবতে চায় না। চলার গতি বাড়িয়ে

দিলে সান্ত্বনা। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। মেঘ ডাকছে গুড় গুড় করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। রাস্তায় যদি ভিজে নেয়ে ওঠে, তাহলে আর যাবে না ভিজতে ভিজতে সটান বাড়ি ফিরবে আবার। মিটি-মিটি হাসছে সান্ত্বনা চাঁদমণি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে আবার। আগের দিনের চাঁদমণি। মেয়েটা যেন সেই থেকে মন্ত্র জপছে কানে। যৌবনের মন্ত্র। মনকে শাসন করতে গিয়ে হার মেনে হাল ছাড়ল সান্ত্বনা।

বাংলো অন্ধকার। কারো সাড়াশব্দ নেই। বাইরের ঢাকা বারান্দায় উঠে মৃদু গলায় ডাকল, নিধু।

সাড়াশব্দ নেই ক্ষণকাল।

সান্ত্বনা চমকে উঠল। অন্ধকার সইয়ে চোখ টান করে দেখল, কোণের ইজি-চেয়ারে শুয়ে আছে ভদ্রলোক। শুয়ে ঠিক নেই, ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে তাকে।

সাক্ষাৎকারটা এরকম হবে বলে প্রস্তুত ছিল না সান্ত্বনা। কিন্তু যে মেজাজে এসেছে সামলে নিতে সময় লাগল না। অস্ফুট স্বরে হেসে উঠল।—ওমা, আপনি! এই অন্ধকারে ভূতের মত বসে যে? মন খারাপ বুঝি?

মনে মনে এই মেয়ের সঙ্গেই যে চরম সাক্ষাতের প্রতীক্ষা করছিল বাদল গাঙ্গুলি, সেটা আজই হবে ভাবে নি। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার রাতের কাজ পর্যবেক্ষণে বেরুবার কথা। তেমনি ঘাড় ফিরিয়ে অন্ধকার ঠেলে চেয়ে রইলো। তার পর মৃদুগম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল, তুমিই বা এ সময়ে এখানে কেন?

সহজ তরল গলায় সান্ত্বনা বলল, নরেনবাবু হলে বলতেন, পেত্নীর মত এখানে কেন?

কয়েক মুহূর্ত।—তোমার নরেনবাবুর সঙ্গে আমার কিছু তফাৎ আছে সেটা বুঝতে তোমার এখনো বাকী আছে!

আগে এর সামনে চেষ্টা করে তবে সহজ হয়েছে সান্ত্বনা। কিন্তু এখন চেষ্টার কোনো বালাই নেই। অন্ধকারে মুখ ভালো দেখতে পাচ্ছে না। তেমনি হাল্কা জবাব দিল, নেই বলেই তো ভাবনা।

এক ঝলক বিদ্যুৎ যেন গোটা বাংলোটাকে ঝলসে দিয়ে গেল একবার। কড়কড় শব্দে মেঘ ডেকে উঠল। সান্ত্বনার উৎফুল্ল উদ্বেগ কানে এলো।—বাবা রে বাবা, কি ঘটা! গোটা আকাশটাকেই ভাঙবে যেন!

ইজিচেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল বাদল গাঙ্গুলি। বেশ কাছে এসে দেখল ওকে। পরদা ঠেলে ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল। সান্ত্বনাও পায়ে পায়ে ঘরে এসে দাঁড়াল। চাপা হাসিতে জ্বল জ্বল করছে সমস্ত মুখ।

ধীর গম্ভীর মুখে বাদল গাঙ্গুলি বেশ করে নিরীক্ষণ করে দেখল। আজকের এই অল্প সাজটুকুও চোখ এড়াল না। হঠাৎ যেন সে এক হিংস্র আকর্ষণ অনুভব করতে লাগল ভিতরে ভিতরে।

নিধুঁর খোঁজে এসেছিলে?

আলোয় এসে এবং মানুষটার মুখের দিকে চেয়ে সান্ত্বনা থমকে গেল একটু। অন্তর-চেতনার গরিমা সত্ত্বেও কেমন মনে হ'ল, নিধু বাড়ি নেই কিন্তু থাকলেই ভালো হ'ত। তবু জবাবে উদ্বেগ প্রকাশ পেল না একটুও। বলল, নাঃ, এসেছিলাম নিধুর মনিবের খোঁজেই—

কেন? কঠিন দৃষ্টিতে বাদল গাঙ্গুলি দেখছে চেয়ে চেয়ে।

একটু এগিয়ে খাটের বাজু ধরে বসে পড়ল সান্ত্বনা। বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল একটা। বসতে তো বলবেন না, তবু বসি।...এসেছিলাম দেখতে, এই মন-টন খারাপ কি না আপনার, যে দুর্যোগ চারিদিকে! হেসে উঠল, কিন্তু এসে ভালো করি নি দেখছি, আপনার ভাবগতিক সুবিধের লাগছে না।

নিঃসন্দেহে বুঝে নিয়েছে ও, নীলার চলে যাওয়ার হেতু যে করেই হোক জেনেছে মানুষটা। নইলে এরকম ব্যবহার করত না। আর জেনেছে বলেই সঙ্কোচের আগল আরো ভেঙে গেছে সান্ত্বনার।

ওর দিকে চেয়ে চেয়ে সেই হিংস্র আকর্ষণটা বাড়ছে বাদল গাঙ্গুলির। উদগ্র হয়ে উঠছে। কিন্তু বিস্মিতও হচ্ছে কম নয়। এই মেয়েকেই মড়াইয়ে দেখে এসেছে এতদিন। ওই চোখ ওই মুখ ওই হাসি ওই কথায় সরোষে যে পশু জাগছে ভিতরে ভিতরে, তাকে দমন করে কাছে এসে দাঁড়াল।

নীলার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?

সেই হাসি আর সেই সচেতন কৌতুক-মাধুর্য সান্ত্বনার চোখে-মুখে। এ ছাড়া অন্য পথও নেই। জবাব দিল, শুধু দেখা! দেখা হয়েছে, আলাপ হয়েছে, কত কথাও হয়েছে—আপনি তো আর আলাপ করিয়ে দেন নি!

কি বলেছ তাকে?

কত কি বলেছি। কেমন করে ড্যাম তৈরি হচ্ছে, কোথা দিয়ে কি ভাবে কত দেশে জল যাবে, কত জায়গার দৈন্য ঘুচবে ঘুচবে-

সান্ত্বনা!

হুকুম করুন।

তোমার বাবার কাছে আর তোমার নরেনবাবুর কাছে আগে বেশ ভালো করে জেনে নিও, আমি তোমার ঠাট্টার পাত্র নই।

মড়াই ড্যামের ওভারসিয়ারের মেয়ে আসে নি চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে। আজ ও চেনেও না সেই মেয়েকে। আজকের সান্ত্বনা স্ব-মহিমায় বিভ্রান্ত নিজেই। ঈষৎ শ্লেষে জবাব দিল তৎক্ষণাৎ, জানি—তাঁরা আপনার কাছে চাকরি করেন সেই জ্ঞান আপনার খুব টনটনে। উঠে দাঁড়াতে গেল।

হ্যাঁ, খুব। একেবারে কাছে ঝুঁকে এলো বাদল গাঙ্গুলি। দুই হাতে তার কাঁধ ধরে বসিয়ে দিল আবার। তার পরেও হাত সবালো না কাঁধ থেকে।

—নীলাকে কি বলেছ?

এই রূঢ় সান্নিধ্যেও সহসা বিচলিত হ'ল না সান্ত্বনা। রয়ে-সয়ে জবাব দিল, বলেছি নীলা সকলের সয় না।

কিন্তু মানুষটার চোখের সঙ্গে ওর দুই চোখ ভালো করে সংবদ্ধ হতেই এক ফুঁয়ে নিভে গেল যেন।

…এই চোখ, এই হিংস্র পিচ্ছিল চকচকে দুই চোখ ও কোথায় দেখেছে এর আগে! কোথায়? কোথায়?

ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল সমস্ত মুখ। মড়াইয়ে রণবীর ঘোষের নাকের ডগা থেকে নীল চশমা সরে যেতে ওই চোখ দেখেছিল, এই দৃষ্টি দেখেছিল আর ওই অজগর-লেহন দেখেছিল। আচমকা একটা ঘা খেয়ে সহসা কঠিন বাস্তবে ফিরে এলো ওভারসিয়ারের মেয়ে। নারী-মহিমার এত গর্ব বিলীন হয়ে গেল।

উঠতে গেল আবারও, হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, ছাড়ুন—

ছাড়াতে পারল না। দুই হাতের দশটা নির্দয় আঙুল ক্রমশ ওর কাঁধে বসে যাচ্ছে।

সংযমের বাঁধভাঙা স্পর্শ-সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে বাদল গাঙ্গুলি দেখছে ওকে। দেখছে না, গ্রাস করছে। বিস্মৃতি, বিস্মৃতি, বিস্মৃতি। বিস্মৃতির তিমির পিপাসা-হিংস্র পিপাসা। বন্য-কবলিত মড়াই ড্যামের সংকট ভোলার বিস্মৃতি, জীবনের সকল ব্যর্থ প্রতীক্ষা অবসানের বিস্মৃতি, সব নিষ্ফলতা উজাড় করে দেবার বিস্মৃতি।

আর, এই চিত্তবিভ্রমের পথে…এই বিফল পরিণামের পথে ঠেলে দিয়েছে যে, তার নিজেকে নিঃশেষ করে দেওয়ার নির্দয় বিস্মৃতি। ক্রূর বিনিময়ের বিস্মৃতি।

বলল, কেন? নীলা সয় না, যাকে সয় সে-ই তো এসেছে এই রাতে এই জলে এই দুর্যোগে?

এই রাতে এই জলে এই দুর্যোগেই এসেছিল বটে। আর, এভাবে ফিরে যাবার জন্যেও আসেনি। এসেছিল সগর্বে নিজেকে প্রকাশ করতে, প্রতিষ্ঠিত

করতে। এসেছিল আকর্ষণ করতেও। কিছু দিতে আর কিছু নিতে। কিন্তু এ কি দেখছে সান্ত্বনা! কাকে দেখছে! কাঁধের ওপর দু'হাতের চাপ বাড়ছে। সর্বাঙ্গ কাঠ।

…এর থেকে অনেক, অনেক কঠিন স্পর্শ সহ্য করেছিল আর একদিন আর এক পুরুষের। হাড়-পাঁজর-সুদ্ধ টনটনিয়ে উঠেছিল তার নির্মম নিষ্পেষণে। কিন্তু সেই বেদনার মধ্যেও মুক্তির স্বাদ ছিল কিছু, যাতনার মধ্যেও ছিল এক মুক্তির শিহরণ।

কিন্তু এই দুই চোখে শুধু অপমান লেখা।

শুধু ক্রূর অভিলাষ।

এই স্পষ্ট যাতনায় শুধু বিষক্রিয়া।

জোর করে দুই চোখ তুলে সান্ত্বনা একটা লোলুপ আক্রমণ যেন প্রতিরোধ করে রাখল খানিকক্ষণ। পরে আস্তে আস্তে বলল, আমার ভুল হয়েছে, ছাড়ুন। আপনাকে ধরে রাখার জন্য আমাকে দরকার ছিল না, যে কেউ পারত…।

শুধু তাই নয়। এই প্রথম বোধ করি মনে হ'ল, এই ড্যামের জন্যও একে ধরে রাখার দরকার ছিল না। যে কেউ পারত, যে কেউ পারে।

উগ্র উত্তেজনার মুখেও থমকে গেল বাদল গাঙ্গুলি।

ঠাণ্ডা নিষ্প্রাণ কথা ক'টা কানে যেতে আবার একটা ধাক্কা খেয়ে সচেতন হ'ল। নিজের বাসনার বীভৎসতাই দেখতে পেল যেন। চোখের দৃষ্টি বদলাতে লাগল। হাতের চাপ শিথিল হতে লাগল।

কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিল। মন্থর পায়ে একটা চেয়ার টেনে বসল।

দু'চার মুহূর্তের নিঃসীম স্তব্ধতা। নিজের অজ্ঞাতে সান্ত্বনা উঠে দাঁড়াল। যাবে।

বোসো।

প্রায় আদেশের মত শোনাল।

সান্ত্বনা বসল যন্ত্রচালিতের মত।

খানিক নীরব থেকে আবার সেই একই প্রশ্ন করল বাদল গাঙ্গুলি, নীলাকে কি বলেছ?

দু চোখ মেলে তাকালো সান্ত্বনা। ধীর, শান্ত। মৃদু স্পষ্ট জবাব দিল, কি বলেছি সে তো আপনি ভালই বুঝেছেন!…তাকে আমি বলি নি কিছু, তাকে আমি তাড়িয়েছি এখান থেকে।

কেন ?

তেমনি নিষ্পলক চেয়ে আছে সান্ত্বনা, খেয়াল নেই। আচ্ছন্ন, নিরাসক্ত, ভাবলেশহীন।—কারণ, আপনার কাজের থেকেও নীলা আপনাকেই বড় করে দেখে তাই। কারণ, নীলা আবারও পারে আপনার চোখ ধাঁধিয়ে দিতে তাই। কারণ, আপনার পুরুষকারের ওপর আমার বিশ্বাস নেই তাই। কারণ, আপনার ওই শোক-মোহ ভেঙে গেলে এই কাজের মোহও ভেঙে যেতে পারে তাই।

বাদল গাঙ্গুলি নির্বাক খানিকক্ষণ। অনুত্তেজিত কথাগুলো ঠাণ্ডা স্পর্শ হয়ে কানে বাজতে লাগল। কিন্তু একটু বাদে উষ্ণও হয়ে উঠল আবার। গম্ভীর শ্লেষে বলে উঠল, কাজের মোহ আমার!

নয় তো কি ? আপনি এত বড় একটা কাজ নিয়ে মেতে উঠেছেন লোকের দুঃখ আর দুর্দশা দেখে ?

জবাব পেল না। প্রত্যাশাও করল না। তেমনি আত্মবিস্মৃত শান্ত কণ্ঠে একটানা বলে গেল, অনেক আশা ছিল আপনার, সে আশা মেটে নি। বড়লোকের দরজায় ঘা খেয়ে, আপনি এখানে এত বড় একটা জিনিস গড়ে তুলতে চেয়েছেন শুধু তারই জবাব দিতে। এত বড় ড্যামের কণায় কণায় শুধু তারই জবাব লিখে রাখতে চেয়েছেন। মোহ নয় তো কি! মানুষের দুঃখকষ্টের কতটুকু দেখেছেন আপনি···কতটুকু জেনেছেন···

বাইরে বৃষ্টি চেপে এসেছে আবার। মেঘ ডাকছে ঘন ঘন। সান্ত্বনা মূর্তির মত বসে। কথাগুলো যেন ও বলে নি, আপনি নিঃসৃত হচ্ছে।

দু চোখ আবারও থরথরে হয়ে উঠল বাদল গাঙ্গুলির।—আমার এই কাজের মোহ যাতে না ভাঙে, শুধু সেই জন্যেই নীলাকে তুমি মিছে কথা বলে এখান থেকে তাড়িয়েছ তাহলে ?

নিরুত্তর। অতি কষ্টে বড় একটা ধাক্কা সামলে নিচ্ছে বোঝা গেল। বাদল গাঙ্গুলি অপেক্ষা করছে। দেখছে চেয়ে চেয়ে। মানুষের দুঃখকষ্টের চিন্তায় দিনরাত তোমার ঘুম নেই, কেমন ?

কিন্তু এই রুক্ষতা এবারে আর স্পর্শ করল না, আস্তে আস্তে আবারও যেন সেই সমাহিত ব্যবধানে চলে গেল সান্ত্বনা। রূঢ়তা সত্ত্বেও বিস্ময়ের শেষ নেই বাদল গাঙ্গুলির। এই মেয়েকে আর দেখে নি কখনো। কেউ দেখে নি।

কিছুক্ষণ। অনেকক্ষণ। অস্ফুট কণ্ঠে জবাব দিল সান্ত্বনা, দিনরাত ঘুম নেই।···জলের অভাবে একটা দেশকে-দেশ কি করে শ্মশান হয়ে যায় সে

আপনি ভাবতেও পারবেন না। যুগ যুগ ধরে ওই মাটির নিচের আগুন বুকে টেনে তিলে তিলে যারা শেষ হয়ে গেছে তাদের সে মূর্তি আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

সেই স্মৃতির অব্যক্ত বেদনায় আরো নিষ্প্রাণ, আরো মৃদু শোনাচ্ছে। যন্ত্রের মধ্য দিয়ে আসছে যেন কথাগুলো।—সময়ে একটুখানি জলের জন্য ভগবানের পায়ে মাথা খুঁড়েছে তারা, আর্তনাদ করে গলা দিয়ে রক্ত তুলেছে, শাস্ত্র মেনে সংস্কার মেনে রক্ত-জল-করা শেষ পুঁজি ওই মাটিতে ঢেলেছে মাটির আগুন ঠাণ্ডা করতে।···আমি দেখছি···আমি যে তাই দেখেছি চেয়ে চেয়ে···

অস্ফুট কান্নায় শোনা যায় কি যায় না। দুই চোখ জলে ভরে উঠেছে। থামল একটু। ঝাপসা দৃষ্টি প্রসারিত করে তাকালো সামনের মানুষটার দিকে। বলল, আরো দেখেছি।···আমার ঠাকুমার আর আমার মায়ের জীবন্ত প্রেতমূর্তি দেখেছি। ওই মাটির আগুনে অষ্টপ্রহর ধিকি ধিকি জ্বলে তাদের পাগল হতে দেখেছি। কারো ওপর তাদের এতটুকু নালিশ ছিল না কোনদিন। কিন্তু আমার ছিল। তাই যেদিন আপনারা জল নিয়ে আসছেন শুনলাম, সেই দিন থেকেই ঘুম নেই আমার। আমি শুধু ভাবতাম, বাঁচার তাগিদে মানুষ আর ভগবানের পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবে না···মানুষের বুক আর দাউ দাউ করে জ্বলবে না কোনদিন।

বাইরে বৃষ্টি, ঝঞ্ঝা। কিন্তু ঘরে যেন বাতাস বইছে না। চিত্রার্পিতের মত বসে আছে বাদল গাঙ্গুলি। চেয়ে আছে বিমূঢ় নেত্রে। কাকে দেখছে, কার কথা শুনছে হুঁশ নেই।

একটু থেমে সান্ত্বনা একটা উদ্‌গত অনুভূতি সামলে নিল যেন। বলল, সে দিন এলে দলে দলে লোক আসবে সেই জল দেখতে। তারা জয়-জয়কার করবে আপনাদের। আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, সেদিন আমি আর এখানে বসে থাকব না।···সেদিন নীলা আসুক আপনার কাছে, আমি আসব না। এখান দিয়ে শুধু জল যাক, সান্ত্বনা মুছে যাক।

···কিছুক্ষণ।

উঠল। আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাইরে জল, ঝড়ো বাতাস। বাদল গাঙ্গুলি মোহাচ্ছন্নের মত বসে। বাক্‌শক্তি রহিত। একবার ডেকে থামাতে পারল না ওকে।

বন্যা বন্যা বন্যা।

সর্বগ্রাসী, সৃষ্টিধ্বংসী।

দুই পাহাড়ে বাধা পেয়ে পিছনের দিক ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ বন্যার চরম লক্ষ্য ওই সাময়িক অবরোধ। ওই অবরোধ উপচে উঠবে অমোঘ সঙ্কল্প।

পিছনের দিকে যতদূর চোখ যায় থৈ থৈ জল। গাছপালা ভেসে আসছে, ভেসে আসছে গৃহস্থের গৃহপালিত জীব—গোরু ভেড়া ছাগল কুকুর—আটচালা হাঁড়িকুঁড়ি। মানুষের মৃতদেহ একটা দুটো।

গোটা মড়াই প্লাবনে ভাসছে। মড়াইয়ের জীবনযাত্রা বিকল।

কিন্তু সংগ্রামী মানুষের নাড়িতে নাড়িতে জেগে উঠেছে সৃষ্টি বাঁচানোর অটুট সঙ্কল্প। ছোট বড়, উঁচু নীচু, নারী পুরুষ সকলের। আর তাদের তাগিদ দিতে হয় না, তাড়া দিতে হয় না।

ঢালো মাটি! ঢালো পাথর! ফেলো বালির বস্তা!

যেখানে বিপদের সম্ভাবনা সেখানেই ছুটে যাও, ঝাঁপিয়ে পড়ো। কারো আদেশ নির্দেশের অপেক্ষা রেখো না। ঢালো মাটি, ঢালো পাথর···

সকলের সকল চেষ্টা সংহত এই সাময়িক অবরোধ কেন্দ্র করে। যার ওধারে সর্বগ্রাসী তরল মৃত্যু। পদমর্যাদার ব্যবধান ঘুচে গেছে। কে কর্মচারী, কে বা নয়, সে প্রশ্ন ঘুচে গেছে। সমস্ত মড়াই একটা মিলিত ইচ্ছার বেগে। একটি মাত্র প্রতিরোধ-মন্ত্রে আবর্তিত।

ঢালো মাটি! ঢালো পাথর! ফেলো বালির বস্তা!

এই এক অবরোধের কোথাও ভাঙন আটকাতে না পারলে সে ভাঙনের তাণ্ডব আর ঠেকানো যাবে না, সবাই বুঝেছে। বুঝে মরণ-যোঝা যুঝছে। দিবারাত্র অষ্টপ্রহর।

যুঝতে হচ্ছে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে। অঘটন হাঁ করে আছে পায়ে পায়ে। প্রতিটি পা দেখে ফেলো। পায়ের নিচে পাথর না পিছলে যায়, মাটি না সরে। কিন্তু দেখার সময় নেই। জলে কাদায় পিচ্ছিল নরক হয়ে আছে সব।

মাটি সরে, পাথর নড়ে, অঘটন ঘটে।

এবারে আর একটা দুটো করে নয়, অন্ত বড় গেস্ট হাউস হাসপাতাল হয়ে উঠেছে। ঘরে জায়গা নেই, বারান্দাও ভরে উঠল। কিন্তু কে কার শুশ্রূষা করে! শক্তি যার আছে সেই গেছে ভাঙন আটকাতে। আহত হলে তবে এখানে আসবে। কেউ নিয়ে আসবে, রাখবে, আবার ছুটবে।—ঢালো মাটি,

ঢালো পাথর, ফেলো বালির বস্তা।

দিনান্তে বড় জোর একবার বাড়ি আসেন অবনীবাবু। সান্ত্বনা আর জিজ্ঞাসা করে না কিছু। তীক্ষ্ণচোখে তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে দিনের সমাচার আঁচ করে নেয়। পিতামহের ক্ষোভের স্তব্ধতা দেখে বাবার চোখে-মুখে। মুখ-হাত ধোবার জল এনে দেয়, খাবার আনে সামনে, বাতাস করে বসে। কিন্তু মুখভাব ওর ক্রমেই কঠিন হতে থাকে। সজ্ঞানে ওর মায়ের অসহিষ্ণুতা যেন সংক্রামিত হতে থাকে ওর শিরায় শিরায়।

ড্যাম হবে না?

ওর জীবনের সকল সম্বল এই এক জায়গায় গচ্ছিত এখন।

সেই ড্যাম হবে না?

মড়াই নদীর ড্যাম হবে না?

জল জল করে হাহাকার করেছিল বলে এই জল এখন সব খাবে? সব বিনাশ করবে?

তা হবে না। হতে পারে না। সারাক্ষণ এই একটিমাত্র অসহিষ্ণু প্রতিবাদমন্ত্র জপছে নিজের অজ্ঞাতে। জপছে স্তব্ধ আত্মিক রোষে। তা হবে না, হতে পারে না!...

সমস্ত দিনে সেদিন আর বাড়ি ফিরলেন না অবনীবাবু। লোক এসে খবর দিয়ে গেল, কখন ফিরবেন তারও ঠিক নেই। কিন্তু খবর সেটা নয়। খবর যা, সান্ত্বনা আঁচ করেছে। দিনের শুরুতে অশুভ দুর্যোগের ছায়া দেখেছে। অনেকবার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকবার এ খবরের আভাস পেয়েছে। এবারে সঠিক জেনে নিল।

...কিন্তু তা হবে না। হতে পারে না।

বড় রকমের ধস নেমেছে একটা। বিনাশের স্পষ্ট সূচনা। প্রায় অমোঘ। সমস্ত শক্তি এক করেও ঠেকানো যাচ্ছে না। ঠেকানো সহজ নয়।

...কিন্তু তা হবে না। হতে পারে না।

বেলা গড়ালো। সন্ধ্যা পেরুলো। রাত হ'ল। বাইরে বাতাসের একটানা সাঁ সাঁ শব্দ। টিপটিপ বৃষ্টি। ক্রমাগত ছটফট করছে সান্ত্বনা, ঘর বার করছে। এক একটা মুহূর্ত যেন এক একটা যুগ। কি করছে তার বাবা? কি করছে চিফ ইঞ্জিনিয়ার? কি করছে নরেনবাবু? কি করছে পাগল সর্দার? কি করছে মড়াইয়ের সব লোকেরা? আটকাতে পেরেছে? ঠেকাতে পেরেছে?

রাত যাচ্ছে আর অব্যক্ত যাতনায় ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে।

রাত বাড়ছে আর ঘরে টেকা অসম্ভব হয়ে উঠছে।

ঘর ছেড়ে সান্ত্বনা বাইরে এসে দাঁড়াল আবার।

দুর্যোগ-ঠাসা অন্ধকার। টিপ টিপ বৃষ্টি। মেঘের গুড় গুড় ডাক। প্লাবনের চাপা কলতান। বাতাসের সোঁ সোঁ শাসানি। শিউরে উঠল। বাতাস নয়। মায়ের সেই হিস-হিস আর্ত বিক্ষোভ। দূর হ'! দূর হ'! দূর হ'! দূর হ'!

দরজায় শিকল তুলে দিল।

দ্রুত চলল। যেখানে মড়াইসুদ্ধ সকলে আছে।

যেখানে কেউ বসে নেই।

মড়াই নদীর ড্যাম হয়েছে।

সমারোহ তার ঘোষণা ছড়িয়েছে কাছে, দূরে।

সরকারী নিয়মে তার উদ্‌ঘাটন উৎসব সম্পন্ন হয়েছে ঘটা করে।

দলে দলে লোক এসেছে তাই দেখতে। আসছে এখনও। বিজ্ঞানের সফল কারিগরী দেখতে আসছে। যুগ যুগ ধরে মাটির কণায় যেখানে আগুন ঠিকরতো, সে পথে জল যাবে কেমন করে তাই দেখতে আসছে। যে পথে মরু-নীরস শুকনো উপোস বেঁধেছিল শাশ্বত কালের বাসা, কেমন করে সৃষ্টির ধারা বইবে সেখান দিয়ে তাই দেখতে আসছে।

অলক্ষ্মীর নিশ্চিত নির্বাসন দেখতে আসছে।

ভুতুবাবুর হোটেল জমজমাট।

মাঝপাহাড়ে উঠে তবে তো এপার-ওপার দুই পাহাড়ের কাঁধজোড়া ড্যাম। তার অনেক আগে ভুতুবাবুর দোকান। তাই সকাল-সন্ধ্যা আর ফুরসত নেই ভুতুবাবুর। ছেলেমেয়েদের জন্য পরদা ঘাটিয়ে একটা ঘরকে দু ভাগ করে চলে না আর। সম্প্রতি দুটো ঘরই তাদের জন্য ভাগ করে দিয়েছে। ভাগ করলেও পরদার বালাই রাখে নি আর। কিন্তু এত ব্যস্ততার মধ্যেও প্রাচুর্য-ভরা এক একটা মেয়েকে দেখে সচকিত হয়ে ওঠে ভুতুবাবু। ইচ্ছে করে মা-লক্ষ্মী বলে ডাকতে। কিন্তু ডাক বেরোয় না মুখ দিয়ে।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে ভুতুবাবু।

চড়াই ধরে ওঠা। অনেকটা উঠতে হবে। তার পর ড্যাম। ড্যামের ওপর দিয়ে মড়াই পারাপার করতে পারো হেসে খেলে দৌড়ে। একশ' ফুট উঁচুতে কনক্রিটের নিটোল অবরোধ প্রাচীর। কালজয়ের স্পর্ধা রাখে। তারও